বাংলা
ভাষার
শিক্ষাপদ্ধতি

BANGLA BHASHAR SHIKSHA PADDHATI
by Kalyani Karlekar

বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকর, এম্-এ, বি-টি

পঞ্চম সংস্করণ

মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

পঞ্চম সংস্করণ—মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশিকা শ্রীমতী মায়া মিত্র
মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড
৫ শংকর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ
বোধি প্রেস। ৫ শংকর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

দাদামশাই ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "সন্দেশ"-এর ভাণ্ডার থেকে রসসঞ্চয় করে' বাংলা ভাষার উপর কিঞ্চিৎ অধিকার ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মেছিল; তাঁর 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'মহাভারতের' নানা কাহিনী পড়ে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়গুলি প্রথম চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। শিশুকালের সেই অপরিশোধনীয় স্নেহঋণের স্মরণে এই সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি উৎসর্গীকৃত হ'ল।

নিবেদন

কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষণ-শিক্ষাবিভাগে বাংলার শিক্ষণ-পদ্ধতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে এক্ষেত্রে প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং গবেষণা ও ব্যবহারের ভিত্তির অভাব আমাকে পীড়িত করেছিল। তখন তৎকালপ্রচলিত বিলিতি বইয়ের আদর্শের ওপর ছাত্রজীবনের স্মৃতি এবং অধ্যাপনা ও পরীক্ষকতার অভিজ্ঞতা আর কিছু স্বাধীনচিন্তার স্পর্ধা মিশিয়ে 'বাংলাভাষার শিক্ষাপদ্ধতি' রচিত হয়।

বাংলাভাষাশিক্ষার প্রসারকল্পে অক্লান্তকর্মা স্বর্গীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময়ে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে থেকে এর প্রকাশের ব্যবস্থা করে' অখ্যাতনাম্নী গ্রন্থকর্ত্রীকে উপকৃত করেছিলেন।

বাংলার শিক্ষণ-পদ্ধতির আলোচনায় অন্যতম পথিকৃৎ স্বর্গীয় অনাথ-নাথ বসু অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও বইখানির প্রথম পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত সংশোধিত করে' দিয়ে আমাকে বাধিত করেছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রিয়রঞ্জন সেনমহাশয় এ-কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তাঁর 'বাংলা পড়ানো' বইখানা থেকে বহু সাহায্য পেয়েছিলাম।

এ-ছাড়া এই গ্রন্থের সংস্করণ থেকে সংস্করণান্তরে বহু ছাত্র-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে জড়িত হয়ে এসেছে। এই ছাত্রধারার অনেক অবদানই অনামা হয়ে আছে।

প্রথম প্রকাশের সময় থেকে প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে' এসেছি। আজ তার অধিকাংশ সরকারি শিক্ষাদর্শের অংগীভূত, কিন্তু চতুর্থ সংস্করণের পর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা বহুলভাবে

পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াতে পঞ্চম সংস্করণে অনেক নূতন আলোচনার প্রয়োজন হ'ল। তাছাড়া, এই কালের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভ্রমণ করে' শিক্ষিকাদের প্রয়োগ, পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা প্রত্যক্ষ করার সুযোগে এই সংস্করণের আলোচনায় তার ফলশ্রুতিব কিয়দংশ নিবদ্ধ হ'ল।

এই সংস্করণেব বিশেষ নূতনত্ব এই যে শিক্ষক ও শিক্ষণশিক্ষার ছাত্র ও পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণির বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের বিস্তারিত আদর্শ পাঠটীকা এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ইতি।

নেতাজী জন্মদিবস
৯ই মাঘ, ১৩৭৬
কলিকাতা

গ্রন্থকর্ত্রী

সূচী

মাতৃভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে বিকশিত করা,—তার শরীরমনের সমস্ত ক্ষমতাকে উদ্ঘাটিত, উদ্বর্তিত ও মার্জিত করে' ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উপযোগী জ্ঞান, বোধ ও নৈপুণ্যসমূহের অধিকারী করে' দেওয়া। মানসিক প্রক্রিয়া ও প্রকাশের একমাত্র বাহনরূপে ভাষা শিক্ষার সমস্ত অংগের সংগে ওত-প্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র ভাষা, মানুষের মনুষ্যত্বগঠনের ভিত্তি ভাষা, তাই একদিকে যেমন ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য অত্যন্ত ব্যাপক, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষাই আংশিক-ভাবে ভাষার শিক্ষা।

যে-কোনো ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হোকনা কেন, তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সেই ভাষাটি ব্যবহার করার ক্ষমতালাভ। বাঙালি যখন ইংরেজি বা হিন্দীভাষা শেখে তখন তার এই প্রয়োজনের দিকটা মুখ্য হয়। আনুষংগিক রাষ্ট্রভাষারূপে এবং ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদির জন্য ইংরেজির জ্ঞান এখনও আমাদের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ভাষারূপে এর একটা স্থায়ী মূল্যও আছে। হিন্দীভাষা নানা কারণে বহুদিন হ'তে ভারতের অনেক স্থলে ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমানে রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় বাধ্য হয়ে সকলে শিখছেন।

ভাষাশিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাহিত্যরসের উপভোগ। মানুষ অন্তরে অন্তরে শিল্পী, সে যে-কোনো একটা ভাষা শিখে সেটাকে ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয় না, সাহিত্যপাঠের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। ভারতবাসী ইংরেজি শেখে প্রয়োজনের তাগিদে, কিন্তু ভাষার ব্যবহার

আয়ত্ত করবার পর কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির পাঠ, আলোচনা করে' ও নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়ে' পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে। হিন্দীভাষার সাহিত্যসমৃদ্ধি এখনও অপরিণত বলে' তার সম্বন্ধে এই সত্য সহজে উদ্ঘাটিত হয়না বটে, তবু বলা যায় যে যে-কোনো ভাষারই এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যাতে তার রস তার কাজের ব্যাপারটিকে ছাপিয়ে ওঠে।

ভাষাশিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের ওপরে মাতৃভাষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই ভাষা কেবল কাজ করে না, শুধু আনন্দ দেয়না, মানুষের জীবনকে গড়ে' তোলে আর ঘিরে রাখে। মাতৃভাষার সাহায্যে মানব-সত্তার প্রথম বিকাশ হয়। শিশুর প্রথম কলধ্বনি, তার প্রথম "মা" ডাক তার কাজের কথা নয়, তার চেতনার উদ্বোধন, তার প্রথম আত্মবোধ। মানুষের প্রথম আত্মপ্রকাশের বিরাট গৌরব এই 'মা' ডাকে মাকে অবলম্বন করে' জেগে ওঠে। এই আত্মপ্রকাশ অন্নবস্ত্রের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

আত্মপ্রকাশ ও ভাবের আদানপ্রদানের ওপর মানুষের চেতনা প্রতিষ্ঠিত। মানুষ অতিরিক্ত একা থাকলে তার মানসিক বিকৃতি জন্মানো সম্ভব এবং যে পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা তার পক্ষে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশলাভ কঠিন। মাতৃভাষা এই আত্মিক বিকাশের বাহন।

শিশুর সমস্ত সত্তা, আশা, আকাংক্ষা ও স্বপ্ন মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে' রূপ নেয়; এই বিরাট মহীরুহের অংকুরকে যদি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা না যায় তবে মানুষেরই বিকৃতি ঘটে। যে বাঙালি নিজের ভাষায় ভালো করে' আত্মপ্রকাশ করতে শেখেনা, সে শুধু বাঙালী নয়, পুরো মানুষই হতে পারেনা।

এদেশে মাতৃভাষাশিক্ষার অবহেলা ঐতিহাসিক। সংস্কৃত ও আরবী-

ফার্সীর আওতা থেকে মুক্তিলাভ করে' স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ইংরেজিভাষা রাষ্ট্র ও শিক্ষাক্ষেত্রে একে কোণঠাসা করে' দিয়েছিল। ভবিষ্যতে হিন্দীর একাধিপত্য স্থাপনে এর আর কোনো দুরবস্থা হবে কিনা তা এখনও অনুমানসাপেক্ষ।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংগে প্রথম সংস্পর্শের সময়ে বাঙালী য়ুরোপের বহির্বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে' পৃথিবীর অগ্রগামী জাতিসমূহের সমান হবার আশায় ইংরেজি শিক্ষাকে সাগ্রহে বরণ করে' নিয়েছিল। এই প্রচেষ্টা যে আংশিক সাফল্যলাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই, ভারতের ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দির নবজাগরণ এবং তার সাহিত্য-সমূহের অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল এই নবপরিচয়ের ফলে। ইংরেজি শিক্ষায় দেশের লাভই হয়েছিল, কিন্তু ভুল হয়েছিল তাকে মাতৃভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করায়। বিশল্যকরণীর সংগে গন্ধমাদনের মতো পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সংগে তার বাহনটিকেও আত্মসাৎ করার চেষ্টা অসার্থক হ'তে বাধ্য ছিল।

শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহার না হওয়ার ফলে মাতৃভাষার চর্চা অংগহীন হয়েছে এবং জাতীয় চরিত্র পূর্ণতালাভ করেনি। একদিকে মাতৃভাষায় সাহিত্যালোচনা হয়েছে, রসোপলব্ধি হয়েছে কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক আলোচনা হয়নি, চরিত্রগঠনোপযোগী মালমসলার চয়ন হয়নি। অন্যদিকে বাঙালি ভালো চাকুরে হয়েছে, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার হয়েছে, বৈজ্ঞানিক হয়েছে, আন্দোলন করেছে, আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু কঠিন গঠনকাজের লোক হ'তে পারেনি। জাতীয় সাহিত্য যে জাতিগঠনে কতটা কার্যকর বাঙালির ইতিহাসে নিষেধমুখে তার প্রমাণ হয়েছে।

মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার দ্বিতীয় বিপদ বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে ঘটেছিল, পরের ভাষায় অর্জিত জ্ঞান আত্মনীন হয়ে ওঠেনি।

শিক্ষায় ওই পরিপাকের অভাবের প্রতি লক্ষ্য করে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে বলেছেন—"আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল আমাদের কেরানিগিরি অথবা অন্য কোনো একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনা ব্যবহার নাই ইহা বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর গুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।···অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালীর সংসারযাত্রায় দুইই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।"—শিক্ষাব্যবস্থার এই ভুল একদিকে অবজ্ঞাত বাবুশ্রেণির ও অপরদিকে পরগাছা ইংগবংগসমাজের পরিপোষক।

পরভাষায় শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় বিপদ এই যে তাতে দেশের জনসাধারণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। যেমন একটি মানুষের মধ্যে দু'টি মানুষ, তেমনি একটি জাতির ভেতর দু'টি জাতি যেন পরস্পরের সংগে সংগ্রাম করতে চায়। আমাদের দেশে শিক্ষার "চুঁইয়ে নামা" অসম্ভব হয়েছে, অশিক্ষিতের যে বিরাট ব্যবধান রচিত হয়েছে এমন পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে নেই। শিক্ষিত বাঙালি বিশ্ববাসীর সংগে দৃষ্টি মেলাতে উন্মুখ, কিন্তু অশিক্ষিত বাঙালির সংগে তার যোগ নেই।

উনবিংশ শতাব্দিতে বংকিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, যে কথা বাঙলায় কথিত না হবে, সে কথা আপামর সাধারণের অনধিগম্য থেকে যাবে ; তাই তিনি "বংগদর্শনকে" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সামঞ্জস্যসাধনের দূতরূপে বাংলার প্রতিঘরে পাঠাবার ব্রত নিয়েছিলেন।

বাঙালি মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা করেনি বলে' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে শুধু গল্প ও কবিতাগুচ্ছে পূর্ণাংগ জাতীয় সাহিত্য হয় না।

প্রথমে "বাংলার বাঘ" আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ধাপ অবধি প্রবর্তিত করিয়েছিলেন, তারপর তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদের উদ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাভাষার স্থান স্বীকৃত হয়। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি ছাড়া সমস্ত বিষয় লিখবার অধিকার পেল। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতালাভের পর থেকে বাংলা পশ্চিমবংগের রাজ্যভাষারূপে গৃহীত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এখন জীবন ও রাষ্ট্রের বহু ক্ষেত্রে এর প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের দ্বারা মাতৃভাষাশিক্ষার মান ও উপযোগিতার উন্নয়নের চেষ্টা হয়েছে।

শিক্ষা ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে মাতৃভাষার এই স্বীকৃতি আনন্দজনক হ'লেও এখনও এ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি। কেবল ইংরেজি-সংস্কৃত-হিন্দী-বাংলার টানাটানিতে নয়, শ্রদ্ধার অভাবে এবং ভ্রান্ত-শিক্ষা ও পরীক্ষাপদ্ধতির প্রমাদে ছাত্রছাত্রীরা সর্বথা বিপর্যস্ত হচ্ছে। পরীক্ষা-পত্র-পরীক্ষণের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন যে ইংরেজি-জ্ঞানের মানের অবনতির সংগে বাংলাজ্ঞানের মানোন্নয়ন তো হয়ইনি, বরং সাধারণ একটি ভাষাগত দুর্বলতা ও প্রকাশের অক্ষমতা ছাত্র-সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন তারা বিদেশিভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষায় রচিত "নোট" বইয়ের গন্ধমাদন বহন করছে, কর্ম ও প্রয়োগের বিচিত্র ক্ষেত্রে ভাষাকে সফল করতে না পেরে পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ পাতার কীট হয়ে রয়েছে। এই অবস্থার সংশোধনের ভার ঘরে মাতাপিতার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকর্তা থেকে আরম্ভ করে' শিক্ষক পর্যন্ত প্রত্যেকের ওপর ন্যস্ত।

মানুষ তৈরি করার এই গুরুভার প্রধানভাবে মাতৃভাষার শিক্ষকের

হ'লেও বাংলাভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হ'বার পর থেকে অন্য সমস্ত বিষয়ের শিক্ষকরাও ভাষার দ্বারা জাতির মনোগঠনের কাজের অংশীদার হয়ে পড়েছেন। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাকালের বিচিত্র বিষয়ের অধ্যয়ন ও আলোচনায় এবং কর্মজীবনের বিভিন্ন প্রয়োগের উপযোগী ব্যবহারক্ষমতা ও শব্দসম্পদ দান করবেন সবাই মিলে। শিশুর অংকুরকে এঁরা বিরাট মহীরুহে প্ররিণত করবেন। মাতৃভাষার বাহনে শিক্ষা সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠবে, ভাষার ব্যাবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের কর্মজীবনের কঠিন মেরুদণ্ড গঠিত হবে, সাহিত্যা-লোচনা ও রসানুভূতির দ্বারা ব্যক্তিত্ববিকাশ ঘটবে।

সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু তাকে সফল করে' তুলতে হ'লে চাই সুশিক্ষকপ্রযুক্ত সুপদ্ধতি। কেবল ইংরেজিভাষার স্থানে মাতৃভাষাকে স্থাপিত করলে মন্ত্রের সাধন হবেনা—সমগ্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই।

শিক্ষাকালের স্তরবিভাগ

বয়স ও পরিণতির ক্রমানুসারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনটি ধাপ মোটামুটি এই তিনটি স্তরের অনুসারী। এই তিন স্তরের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালিত হ'লে শিক্ষা সফল হয়, নতুবা শিক্ষা ও শিক্ষার্থী সমান্তরালে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। এই অবস্থাই দেশের শিক্ষাসংকটের মধ্যে আজ আত্মপ্রকাশ করেছে।

এক

শিক্ষাকালের প্রথম স্তরে প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শ্রেণি-গুলিকে ধরা যায়, অর্থাৎ শিশুশ্রেণি থেকে আরম্ভ করে' চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত।

শিশুশ্রেণি শিক্ষার প্রাক্-প্রাথমিক স্তর, কিঞ্চিদূর্ধ্ব দুই বৎসর (২ +) বয়সের শিশু এর নিম্নতম ধাপে উপস্থিত হ'তে পারে, এবং পাঁচছয়-বৎসর বয়স পর্যন্ত এই স্তরে থাকে। তারপর সে প্রাথমিক স্তরে উত্তীর্ণ-হয়। এই সময়টিকে শৈশব থেকে বাল্যে অতিক্রমণের কাল বলে' ধরা যায়। এটা তার লেখাপড়ার কাল নয়, প্রস্তুতির পর্যায়, আত্ম-প্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশ, সামাজিকতা, লেখাপড়া, সবেরই ভিত্তি এই সময়ে স্থাপিত হয়। মায়ের আঁচল থেকে সদ্য ছিন্ন হয়ে শিশু যখন আসে, মনোবিজ্ঞানীরা বলেন "মাতৃগর্ভের ছায়া" তখনও তাকে ঘিরে রাখে। শিক্ষক তাকে বিদ্যালয়ের সরকারি হাওয়ায় উত্তীর্ণ করবেন, তার ভয় ভাঙাবেন, খোলস ছাড়াবেন, বিদ্যালয়ে তার যে দ্বিতীয় ঘর আছে, সেই

ঘরে স্থাপিত করবেন, রূপরসগন্ধ বর্ণে, চিত্রে, বস্তুতে, তার ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তিকে পর্যাপ্তরূপে পরিব্যাপ্ত করে' পরিণতির পথে অগ্রসর করবেন।

গল্পগুজব, কথাবার্তা ও খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার কাজ হবে। যে-টুকু পড়াশুনোর ভিত্তি এই স্তরে স্থাপিত হবে তা হ'বে নানা আনন্দজনক অভিজ্ঞতার পটে। তার স্বভাবের প্রবল চিত্রধর্মের সাহায্যে সে ছবি আঁকার মতোই স্বাভাবিকভাবে লিখতে শিখবে। পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে লিপির প্রতীকদ্যোতকতার ভাব শিশুর কাছে বিমূর্ত সত্তারূপে প্রকাশিত না হয়ে সরল সত্যরূপে প্রতিভাত হবে।

এই সময়ে শিশুর খেলাই কাজ আর কাজই খেলা। জীবনের দৈনন্দিন কাজের অনুকরণে রান্নাবান্না, অসুখবিসুখ, সেবাশুশ্রূষা, পুলিশপিওন প্রভৃতি নানা প্রকারের খেলা হবে, সাহিত্যের কথাকাহিনীর অনুসরণে যুদ্ধবিগ্রহ, অভিযান প্রভৃতির অভিনয় হবে, আবার কোনো কাজ করতে দিলে উৎসাহের সংগে খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে সে তা করবে। এই পরিণতির ক্রমে সে শৈশব থেকে বাল্যে পদার্পণ করবে, —প্রাক্-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক শ্রেণিতে পৌঁছবে।

প্রাথমিক স্তরে পাঁচ-ছয় থেকে নয়-দশ বা দশ-এগারো বৎসর বয়সে ছাত্ররা প্রথম থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকে। এই সময়ে তারা শৈশব থেকে বাল্যে উত্তীর্ণ হয়। শৈশবসুলভ চাঞ্চল্যের ধারা বেয়ে প্রাক্-বয়ঃসন্ধি স্থৈর্য তাদের শক্তি দান করে। পূর্বস্তরে খেলার মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে তা ভাষার দৃঢ় ব্যবহারে ও সানন্দ সাহিত্যসাধনায় উত্তীর্ণ হবে।

সাহিত্যরসের উপলব্ধি অল্পবয়সেই সম্ভব। শিশুর সাহিত্যবোধ তার আদিম জীবনসম্ভোগের আনন্দজাত, তারই ওপর পূর্ণমানবতার ভিত্তি। এই বয়সের সজীবতা ও সরসতার ধারাকে সময়মতো পুষ্ট

করে' তুলতে হবে। শৈশবের জৈবিক চাঞ্চল্য বাল্যের কর্মনিষ্ঠার ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। বালকের এখনকার পরিণতি যথেষ্ট না-হলে বয়ঃসন্ধির পূর্ণতাকে ধারণ করার মতো পাত্রতা জন্মাবে না। সাহিত্যরসবোধের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য যে খেলা, গান, ছবি ও ছড়ার মধ্য দিয়ে শৈশবের সৌন্দর্য ও আনন্দের স্পৃহার চরিতার্থতা সাধিত করে' বাল্যের বুদ্ধি, জিজ্ঞাসা ও সাধনার উদ্বোধন করতে হবে।

দুই

পঞ্চম-ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যস্তর। এই স্তরের ছাত্রদের বয়সের গড় নয়-দশ থেকে বারো-তেরো বৎসর পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সময় বাল্য থেকে কৈশোরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর শেষাংশ প্রাক্‌বয়ঃসন্ধি স্থৈর্যে কৈশোরের জোয়ারের টান ধরে। এদের শিক্ষকতার কাজ কঠিন। শিক্ষার ভিত্তিরূপে এই বয়স জীবনের এক মূল্যবান্ সময় এবং এরই সঠিক পরিচালনার ওপর ছাত্রের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করে। এই সময়ে তার মনের যে মোড় দেওয়া যায় তদনুযায়ী তার মনুষ্যত্ব অবয়ব নেয়। আবার এই স্তরের শেষের দিকে বয়ঃসন্ধির পূর্বাভাসজনিত চাঞ্চল্যে অবস্থাসংকটের সৃষ্টি হ'তে পারে বলে এখনকার শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশী।

এই সংকট এড়ানো কঠিন নয়। পরিণতিশীল শরীরমনের পরিবর্তনের ক্রমানুসারে বালকবালিকার দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত হ'তে থাকে বলে' নিজের এবং পরিপ্রেক্ষিতের সংগে নূতন করে' বোঝাপড়ার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য এই সময়ে তাদের যত বিশ্বাস ও দায়িত্বের অংশ দেওয়া হয়, জ্ঞান ও কর্মময় পরিস্থিতিতে যত পরিবৃত করে' রাখা যায়, তাদের চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা তত কম হয়।

শারীরিক ও মানসিক পরিণতির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগের অভা. সংকটের কারণস্বরূপ। ক্ষেত্রবিশেষে এই বয়সে যে-সব অস্বাভাবিক বালকবালিকা (problem children) দেখা যায় তাদের অনেকেরই ব্যতিরেক এই অসামঞ্জস্যজাত। দেহমন যখন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তখন তাদের খোরাক প্রচুর হওয়া চাই। যে-সকল প্রবৃত্তির উদ্গতি ভিন্ন মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া দুষ্কর "অলস মস্তিষ্কে" সেগুলি বর্ধিত হবার সুযোগ পায়, অতিসচেতন মন কু-অভ্যাসের বশবর্তী হয়, তাই এই বয়সের ছাত্রদের নানাদিকে, নানাকাজে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট রাখতে হবে।

এই সময়কার সাহিত্যশিক্ষা ভাষার ব্যবহারশিক্ষার ওপরকার স্তরের. সচেতনভাবে সৌন্দর্যানুভূতি ও সৃষ্টির সাধনা ও জাতির সাহিত্যপ্রচেষ্টার পরিচয়লাভ। এই স্তরের বালক বহির্জগতের সংগে অনেকাংশে পরিচিত হয়েছে, এখন বিমূর্তভাবজগতের সংগে পরিচয় সুরু হবে, অনুভবের মধ্যে বিশ্লেষণ উঁকি মারবে, পাঠ্যাপাঠের সংগে সাহিত্যচর্চা মিলে যাবে।

এর আগের শিক্ষা খেলার থেকে কাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এখনকার শিক্ষা কর্মের ভিত্তি থেকে প্রবুদ্ধ সাহিত্যানুরাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। খেলার প্রয়োজন এখন শেষ হয়নি, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর মনে এতটা সাহিত্যানুরাগ উদ্রিক্ত হয়ে গিয়ে থাকা উচিত যাতে তারা সাহিত্যসাধনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। এখন তাদের সূক্ষ্মানুভূতির দৃঢ়সূত্রে লেখাপড়ার বাঁধনে বাঁধতে হবে।

সাহিত্যালোচনার অপরিহার্য অংগস্বরূপ এই স্তরে বাইরের বই পড়ার প্রয়োজন খুব বেশি। আবার মাতৃভাষা সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার বাহন বলে', কেবল সাহিত্য পুস্তক নয় ছাত্রদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়তে উৎসাহিত করতে হবে।

বর্তমান শিক্ষাসংস্কারের ফলে মধ্যবিদ্যালয়ের শেষে ছাত্রেরা পরবর্তী স্তরের বিভিন্ন শাখা বেছে নেবে। এই নির্বাচনের উপযোগী বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও মানসিক পরিণতি তারা যেন এই স্তরেই লাভ করতে পারে। তাদের নানা কাজে লিপ্ত করে' ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-লব্ধ তথ্য সঞ্চয়দ্বারা শিক্ষকেরা তাদের ভবিষ্যৎ ছাত্রজীবনের ধারায় অনুমানকে বৈজ্ঞানিকভাবে সিদ্ধ করে' নেবেন। বহুশাখাশিক্ষার ধারার ধারায় সাহিত্যিক ও মানবিক বিষয় ভিন্ন বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, যন্ত্র-শিল্প প্রভৃতি যে-কোনো শাখার পাঠ মাতৃভাষায় আয়ত্ত করার অধিকার যাতে তারা পায় সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার উপযোগী ভাষার শব্দসম্ভার, পরিভাষা ও প্রয়োগদক্ষতা তাদের অধিগত করে' দেবেন।

তিন

বিদ্যালয়ের উচ্চতম দুই বা তিন শ্রেণিতে ছাত্রদের কৈশোর অতিবাহিত হয়। নবম থেকে দশম বা একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের গড় বয়স থাকে তেরোচোদ্দ থেকে পোনেরোসতেরো পর্যন্ত। বিদ্যালয়-গুলির পুনর্গঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়প্রবেশের বয়সের নিম্নমাননির্ধারণের ফলে বিদ্যালয় ছাড়ার বয়স ক্রমশ ১৬-১৭ বৎসরে দাঁড়াবে। এই সময়ে ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সংগে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা জন্মানো চাই।

এর আগের স্তরেই ছেলেদের আত্মসচেতনতার উন্মেষ হয়েছিল, এখন জগতের বুদ্ধিগ্রাহ্য দিকটা প্রধানভাবে তাদের সামনে ধরা পড়ে। প্রত্যেক ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝবার ও বিচার করবার চেষ্টার ফলে বহির্জগতের সংগে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। এরা স্বাধীন মত পোষণ করতে আর সমালোচনা করতে শেখে। এই বৃত্তি চিত্তোৎকর্ষের পরিচায়ক এবং সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিচিত্রপথে ফলপ্রসূ

হতে পারে। কার্যকারণানুশীলনের ভিত্তিতে সমালোচনা যুক্তিবাদী মনুষ্যত্বের বিচারশক্তির উদ্বোধক। বাইরের দিকে যে-বয়সের দৃষ্টি প্রসারিত, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দের বিশ্লেষণ তার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে অপ্রতিষ্ঠ, আবেগশীল সমালোচনা ধ্বংসশীলতার পরিপোষক। শিক্ষকের নৈপুণ্যের অভাবে, পাঠ্যক্রম, পঠনপদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অযোগ্যতায়, ব্যর্থ সমালোচনাবৃত্তি ছাত্রকে ফাজিল, ব্যংগপ্রিয় ও বিকৃতমনা কবে।

ছাত্রদের আন্দোলন ও ধর্মঘট এই সময়কাব সংশ্লিষ্ট ঘটনা। রাজনীতির দিক দিয়ে বিচার না করে' শিক্ষার দিক দিয়ে এর ফলাফলের বিচার করতে হবে ; এতে বিদ্যালয়ের শৃংখলা যে শুধু সাময়িকভাবে ভাঙে তা নয়, ছাত্রদের সংযমের মূলে আঘাত করে, তাদের মন পড়াশোনা থেকে অপসারিত হয়। কখন ছাত্রসমাজের স্বার্থরক্ষার অস্ত্ররূপে এর প্রয়োগ হয়,—তাতে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক আবহাওয়া ধ্বংস করে' কৃত্রিম শ্রেণিসংগ্রামের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশ উত্তেজনা এক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে ছাত্রদের বিচারবুদ্ধি লুপ্ত করে' অনুকরণশীল অন্ধ বিদ্রোহের অভ্যাসের সৃষ্টি করে।

এ-সব ঘটনার সময়ে মনে রাখতে হবে যে ছাত্রেরা সাধারণভাবে মন্দ বা নির্বুদ্ধি নয়, তারা মোহ ও উত্তেজনার বশবর্তী এবং অনেক সময়েই শিক্ষকের অহংকৃত, নির্মম ও নিরাগ্রহ ব্যবহারেই তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একথাও ভুললে চলবে না যে যারা দেশের মংগলসাধনের কল্পনায় পথভ্রষ্ট হচ্ছে তাদের পথপ্রদর্শনের ভার শিক্ষকের এবং যে বিচারবুদ্ধি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ছাত্রসমাজকে এই গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে রক্ষা করতে পারে তা তাঁরই দেয়।

তাড়নদ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়, তাই বিভিন্ন কর্মসূত্রে পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত বিষয়ের বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়-

বহির্ভূত সমাজের মধ্যে যোগ স্থাপিত করতে হবে। সমালোচনার সংগে সংগঠনের, দাবীর সংগে দায়িত্বের সামঞ্জস্য রাখতে হবে। আন্তরিক ধৃতি ও কর্তব্যবোধের ওপর বিদ্যালয়ের শৃংখলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবে শিক্ষার সংগে কাজের অভিজ্ঞতাদানের ও সমাজ ও শিক্ষানিকেতনের যে অংগাংগিভাবের পরিকল্পনা করা হয়েছে তার প্রয়োগ এই সমস্যার সমাধানে প্রধানভাবে কার্যকর হতে পারে ; কিন্তু শুধু সমাজসেবায় নয়, জ্ঞানার্জনেও ছাত্র-জীবনের সার্থকতার পথ দেখাতে হবে। জ্ঞানের মূল্য ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে এবং জ্ঞানতপস্যার ও আবিষ্করণের দ্বারা দেশসেবা যে দেশপ্রেমের প্রধান অংগ তা তাদের উপলব্ধি করাতে হবে।

এই আদর্শোন্নয়নের ক্ষেত্রে, মনোগঠনের ক্ষেত্রে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সাধনা প্রধান অংশ গ্রহণ করতে পারে। বাংলাভাষা মাতৃভাষা, বাংলা সাহিত্য বাঙালির জাতীয় সাহিত্য, তারই সুপরি-চালিত শিক্ষার ওপর জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিপত্তন হবে।

পাঠ্যক্রমের নিম্নমানতা ও পরীক্ষাপদ্ধতির অযোগ্যতা ছাত্রদের অপরিপূর্ণ পরিণতির অন্যতম কারণ। "সুকুমারমতি" বালকবালিকারা কতটা গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে তাই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে একমাত্র মুখস্থভিত্তি বহিঃপরীক্ষার চাহিদার ভিত্তিতে। গন্ধমাদনের ওজন যে বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনীর চেয়ে অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই, কাজেই সর্বৈব কণ্ঠাগ্রতা আর সার-গ্রাহিতার মানের মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। ভাষাসমেত তথ্যের মুখস্থবিদ্যাই যদি শিক্ষাপরীক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রাহ্য হয়ে চলতে থাকে তবে শিক্ষা আর ছাত্রশৃংখলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্যদিকে, সারগ্রহণ ও চিত্তবিকাশের পথে শিক্ষা পরিচালিত হলে অনেক বেশি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে

উঠতে হবে সেই শিক্ষাকে, পাঠ্যক্রমকে অনেক বেশি বিস্তারিত করে' জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পূর্ণপরিচায়ক করে' তুলতে হবে।

মধ্যস্তর থেকেই বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ্যক্রমের নিম্নমানতা অনুভব করা যায়। বাংলার যথেষ্ট গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান পাঠ্যক্রমে চাওয়া হয় না এবং শিক্ষক বা পরিদর্শক কেউ দাবী করেন না। নির্দিষ্ট পাঠ "আয়ত্ত" করার জন্য সাধারণ বুদ্ধিমান বালকের বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়না বলে' বালকবালিকার অতিসচেতন মন কখন কখন বিপর্যয় ঘটায় আর উচ্চস্তরের ছাত্রেরা পাঠের প্রতি শ্রদ্ধাবিযুক্ত হয়ে সাফল্য হারায়।

বর্তমান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রতিও ওই কথাই প্রযোজ্য। এতে মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপকতর সাহিত্যালোচনার পরিবর্তে অধিকতর ব্যাকরণ ও মুখস্থবিদ্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে।

মাতৃভাষাশিক্ষার অবনয়নের অপর কারণ বাংলাভাষার প্রতি সমাজের অবহেলা। এর মূলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মানসিক বাতাবরণের প্রভাব নিহিত আছে। মাতৃভাষা, রাজ্যভাষা ও শিক্ষার বাহনরূপে বাংলার যে সম্মান প্রাপ্য তা তাকে দেওয়া হয় না, ও বহু ক্ষেত্রে বাংলার শিক্ষা ও শিক্ষকের সম্মান বিদ্যালয়ে খুব কম। এটা যুগসন্ধিকালীন অবস্থা হ'তে পারে, কিন্তু প্রতিকারের অভাবে এর স্থায়িত্বলাভ অসম্ভব নয়।

অনেকে বলেন বিদ্যালয়ের পাঠের আদর্শ উঁচু হ'লে, যে-সব ছাত্র পড়ায় ভালো নয় তাদের প্রতি অবিচার করা হবে, তারা বারে বারে পরীক্ষায় "ফেল" করবে, কিন্তু এই পাশফেলের ব্যাপারটির নির্ভর যোগ্যতার বিচার চাই। বিদ্যালয়ের উচ্চতম ধাপের সমস্ত পাঠ যদি পরীক্ষার অভিমুখী হয়ে পড়ে এবং ফলত শিক্ষক বা ছাত্র কারো পরীক্ষা-প্রশ্নের সম্ভাবনার বাইরের কোনো বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্তি থাকে

 পরীক্ষার দাবী যদি শিক্ষার মনোবিকাশের ও নাগরিকতার

:দ্দশ্যকে পরাস্ত করে তবে সেই পরীক্ষায় ব্যক্তির ও দেশের-দশের কি য়োজন ?

তাছাড়া আজকাল এত নানাপ্রকারের সূক্ষ্ম পরীক্ষণপদ্ধতি উদ্ভাবিত :য়েছে যার প্রয়োগে কর্তৃপক্ষ 'ভালোমন্দ" প্রত্যেক ছাত্রের যোগ্যতার বিচার করতে পারেন এবং সেগুলির ব্যবহারের ফলে কোনো কোনো গ্রসর দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বহিঃপরীক্ষার পরিবর্তে বিদ্যালয়ের াক্ষরকেই গ্রহণ করা হয়েছে। বহু বৎসরের সমুচ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে ঠিত এই সাক্ষ্যের মূল্য আকস্মিক বহিঃপরীক্ষার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি। াপরপক্ষে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ন্যায়বোধের ওপর যদি বিশ্বাস না াকে তবে তাঁরাই যখন পরীক্ষকরূপে একে অপরের ছাত্রের খাতা দখেন তখন তাঁদের সেই বিচারও অন্তত সমানই অগ্রাহ্য।

বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের উপযোগী মানের শিক্ষাদানের জন্য কোনো কানো বিদ্যালয়ে সাধারণ পাঠ্যবিষয় সমান রেখে ছাত্রদের বুদ্ধির ারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে পড়ানো হয়। বুদ্ধ্যংকের ক্ষ্ম পরিমাপের পরীক্ষা উদ্ভাবিত হ'লেও কাজের প্রয়োজনে এদের ত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনটি মোটা ধাপে ভাগ করা হয়। াই মোটা বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো কোনো অগ্রসর দশে প্রত্যেক শ্রেণিতে ত্রিধারায় পঠনপাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের ীতি গৃহীত হয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ কোনো ব্যবস্থার ায়োজনীয়তার কথা ভারতীয় শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবে উল্লেখ করা য়েছে।

অপরপক্ষে শ্রেণিতে সাধনা, সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতামূলক াধুনিকতম শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহৃত হ'লে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিস্তরের ছাত্রদের াকসংগে পড়ানোতে একদিকে উচ্চমানদের দায়িত্ববোধের বৃদ্ধি ও ন্যদিকে নিম্নমানদের মনোবিকাশের সুবিধা ঘটে।

ভাষাশিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি

এক

সমস্ত শিক্ষার যা মূলনীতি মাতৃভাষার শিক্ষাও সাধারণভাবে সেগুলি ওপর স্থাপিত। আধুনিক শিক্ষানীতিতে মানবস্বভাবের প্রকৃতিদ শিক্ষাধারাকে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে' ধরা হয়েছে, মাতৃভাষার শিক্ষা সেই ধারার অনুসরণ করে। প্রকৃতির কোলে মানুষ যে নিয়মে ধী ধীরে তার এক বিরাট সভ্যতা গড়ে' তুলেছে ও জ্ঞানভাণ্ডার আহ করেছে, সেই নিয়মকে মানবসন্তানের চরিত্রবিকাশ ও জ্ঞানলাভে স্বাভাবিকতম পন্থা বলে' স্বীকার করা হয়।

তরুণস্বভাব ইন্দ্রিয়প্রধান বলে' ইন্দ্রিয়পথেই ছাত্রের মর্মে প্রবেশ ক সম্ভব। তারা সজাগ ও সক্রিয় বলে' শিক্ষাকে নিশ্চেষ্ট শ্রবণমনে ক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে' কর্ম ও অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ক আবশ্যক: তাদের মন কৌতূহলপূর্ণ, রোমাঞ্চকর উত্তেজনার জন্য উন বলে' ক্রমান্বয়ে প্রয়াস ও ভ্রমের পথে, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের প বিশ্লেষণ ও গবেষণার পথে শিক্ষার অগ্রসর হওয়া চাই। তাই বস্তু ছুঁয়ে, নেড়েচেড়ে, দেখেশুনে শিশুশিক্ষার আরম্ভ হবে। শিক্ষ উপাদান নিয়ে শিশু খেলবে, বালক অনুসন্ধান ও গঠনমূলক কা উদ্যত হবে ও কৈশোরে বিচারবিশ্লেষণ ও গবেষণার সাধনা প্রাধ লাভ করবে।

এইজন্য সহজ, সরল, অভ্যস্ত, পরিচিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বস্তুভিত্তি, বিষ সমূহ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এমন সহজ ধাপে ধাপে জটিল, কঠি অজানা ও ভাবভিত্তিক বিষয়ের দিকে অগ্রসর হ'তে হবে যাতে ছাত্রে

বিবর্তমান মনের পক্ষে তার অনুসরণ সহজ হয়। আবার পর্বতারোহণের পথে মাঝে মাঝে মালভূমির সমতলে স্থাপিত করে' শিক্ষার অন্নকে জ্ঞান ও নৈপুণ্যের রক্তমাংসে পরিণত হবার সুযোগ দিতে হবে।

আজন্ম অনুকরণশীল, সহজ ভাবগ্রাহী শিশু অভিনয়াত্মক কার্যকলাপে আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির আনন্দ পাবে, স্বভাবত যূথচারী বালক একা বসে' মুখস্থ করার চেয়ে পাঁচজনের সংগে মিলেমিশে সহজে শিখবে ; আত্মগ্রাহী ও আনন্দোন্মুখ ছাত্রদল সেইসব কাজ করতে চাইবে যাতে তারা সাফল্যলাভ করে' প্রশংসা পেতে পারে।

মাতৃভাষার শিক্ষক ছাত্রদের চরিত্রের এইসব লক্ষণগুলি তো বুঝে নেবেনই, উপরন্তু বিদ্যালয়ের অন্যান্য পঠনীয় বিষয়ের থেকে মাতৃভাষার প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

বিদ্যালয়ের অন্যান্য পঠনীয় বিষয় থেকে ভাষার প্রথম প্রভেদ এই যে ভাষা মানুষেব মনের সংগে অংগাংগিভাবে যুক্ত। মানুষের চিন্তাব প্রধান যন্ত্র, ভাবের বাহন ভাষা আসংগজাত একটা সামাজিক অভ্যাস। বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয় তথ্যপ্রধান কিন্তু ভাষা আত্মপ্রধান। বোধ, চিন্তা ও প্রকাশের যন্ত্ররূপে ভাষা একটা শিক্ষণীয় কুশলতা,—অন্যান্য যে-কোনো কৌশলের মতো একে ক্রমাগত অভ্যাস ও ব্যবহারের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, ভাষা বাইরের বস্তু নয়, কাজ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত একটি ব্যবহারক্ষমতা বলে' জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, ভাষা একটা জীবন্ত আত্মিক সত্তা হ'লেও বাক্‌যন্ত্রের মধ্য দিয়েই এর বহিঃপ্রকাশ ও স্থাপনা বলে' এর উচ্চারিত রূপই এর শিক্ষার প্রথম অংগ।

ভাষার সংগে মানবমনের এই নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা ভেবে শিক্ষক

মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ও নিজের পর্যবেক্ষণক্ষমতা মিশিয়ে, ছাত্রদের আগ্রহ ও এষণা জাগ্রত করে' শিক্ষার উপযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন।

শিশু প্রথমে মাতৃভাষা শেখে শিক্ষকের উপদেশে নয়, নিজের চেষ্টায়। তার চারদিকে প্রবাহিত বাংলা শব্দের যে প্রবাহ তার কানে ঠেকে তার মধ্যে থেকে তার শব্দসম্পদ গঠিত হয় আর চারদিকে যে বাক্যগুলি উচ্চারিত হ'তে থাকে তার অবচেতন অনুকরণে সে স্বাভাবিক ভাবে নিজের বাক্যগুলি গড়ে' তোলে। শিশুর বাক্যগঠনে বা উচ্চারণে ভুল হ'লে সবসময়ে মাতাপিতা তা দেখিয়ে দেন তা নয়, সে নিজের পর্যবেক্ষণ দ্বারা আপনাকে সংশোধিত করে' নেয়,—সবাই যেমন করে' কথা বলে, তেমনিভাবে কথা বলতে প্রণোদিত হয়।

শিক্ষকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকেই ছাত্রস্বভাবের বৈশিষ্ট্য ও তাদের কাজকর্মের রীতির কথা বুঝতে পারলেও প্রশ্নের উত্তরগুলি একটু বৈজ্ঞানিকভাবে যাচিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে,—যেমন

কি করে' ছেলেপিলের মনে ভাষাশিক্ষার যথার্থ আগ্রহ ও ইচ্ছার সঞ্চার করা যায়?

কোন কোন কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের ভাষাব্যবহারের নৈপুণ্য ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করা যায়?

ভাষার শব্দসম্পদ ও স্পষ্ট ধারণার ক্ষমতা কোন কোন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে গঠিত করা যায়?

কি কি ধরনের অভ্যাসের দ্বারা ভাষার ধারাগুলি ছাত্রদের মনে বদ্ধমূল করা যায়?

কি উপায় অবলম্বন করলে বারবার অভ্যাস করায় ছাত্রদের অবসাদ বা বিরক্তির উদয় হবে না?—ইত্যাদি।

দুই

মনস্তত্ত্ববিদেরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান করেছেন মানুষের মনের প্রক্রিয়ার আলোচনায়। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল যে-সব সূত্রে নিবদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে থর্নডাইকের শিক্ষানীতি বিখ্যাত। থর্নডাইক তিনটি প্রধান ও পাঁচটি অপ্রধান নীতির কথা বলেন।

তাঁর প্রথম সূত্র "সাফল্যের নীতি"। প্রেরণার উত্তরে লোকে কাজে উদ্যত হয়, সাফল্যলাভ করলে সন্তুষ্ট হয়, নতুবা নয়। মানুষের মন সফল প্রতিক্রিয়া বা কাজকে স্থায়ী করতে চায় আর নিষ্ফলগুলিকে মুছে ফেলতে চায় বলে' শিক্ষাক্ষেত্রে যে যে কাজে ছাত্রেরা সাফল্যলাভ করে সেগুলি তাদের মধ্যে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় আর যা তারা করতে পারেনা, সেগুলিকে বর্জন করে, অর্থাৎ তারা যা পারে তা শেখে আর যা পারেনা তা শেখেনা। কাজে সাফল্য তাদের উত্তরোত্তরবর্ধিত চেষ্টা ও উৎকর্ষণের দিকে নিয়ে যায় আর ক্রমাগত অসাফল্য আশাভংগের সৃষ্টি করে। যে-কোনো ছাত্রের পক্ষে যে-কাজ করা সম্ভব তা সে শিখতে পারে আর যে কাজ সে সাধারণভাবেও সম্পন্ন করতে পারেনা তার মান ক্রমাগত অবনত হ'তে থাকে। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রের বয়স ও বুদ্ধ্যংকের উপযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষার ক্রম নির্দিষ্ট হ'লে তবেই শিক্ষা সুকর হ'তে পারে।

দ্বিতীয় সূত্র "অভ্যাসের নীতি"। প্রেরণা বা উত্তেজনা ও তার উত্তর প্রতিক্রিয়ার বারবার যোগসাধনের দ্বারা স্মৃতি ও অভ্যাসের বন্ধন দৃঢ় হয় আর যোগসাধন স্থগিত থাকলে কালক্রমে বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। এই হ'ল "ভুলে যাওয়া", তাই ছাত্রদের কিছু ভালভাবে আয়ত্ত করাতে হ'লে সেই কাজ বারবার করাতে হয় আর শেখা জিনিস

যাতে তারা ভুলে না যায় তাই ক্রমাগত পুনরভ্যাস ও পুনঃপঠনের ব্যবস্থা করতে হয়।

যাঁরা ভ্রমশীলতার বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা বলেন যে শিক্ষার অব্যবহিত পরেই ভ্রমের গতি সবচেয়ে বেশি হয়, কিন্তু তারপর যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু সহজে হারায় না। ভ্রমের এই তত্ত্বের সংগে থর্নডাইকের অভ্যাসের নীতি মিলিয়ে নিয়ে বলা যায় যে ভুলের প্রথম ধাপে যদি বারবার অভ্যাসদ্বারা বন্ধন বা স্মৃতিকে দৃঢ় করা যায় তাহ'লে ভ্রমের পরিমাণ কমে যাবে।

তৃতীয় সূত্র হ'ল "প্রস্তুতির নীতি"। ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক উপযোগিতা ও উন্মুখতা সাধিত হ'লে কোনো উত্তেজনার উত্তর প্রতিক্রিয়ায় কাজে সন্তোষ ও নিষ্কর্মতায় বিরক্তি উৎপন্ন হয়। এর একদিক হ'ল যে শিক্ষায় সাফল্যের জন্য শরীর ও মনের বিবর্তনের উপযোগিতা চাই, ইচ্ছা ও আগ্রহ উদ্রিক্ত হওয়া চাই। এর অন্যদিক হ'ল যে প্রস্তুতির পূর্ণতায় উন্মুখ অবস্থায় উপস্থিত হবার পর শিক্ষাকর্মে অংশগ্রহণ করতে না পারলে ছাত্রদের মনে আশাভংগজনিত বিরক্তির উদ্ভব হয়। ছাত্রদের সামনে যে শিক্ষণীয় বিষয় স্থাপিত করা হয় তার উপযোগী দেহমনের পরিণতি যদি তাদের না হয়ে থাকে আর তাদের মন যদি ওই বিষয়গ্রহণে ইচ্ছুক না হয়ে থাকে, তাহ'লে তারা সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেনা। আবার উপযুক্ত পরিণতিসম্পন্ন ও শিক্ষায় উন্মুখ ছাত্রদের যদি সেই শুভযোগে শিক্ষা না দেওয়া হয় তবে পরে তাদের শেখানো কঠিন, এমনকি অসম্ভবও হ'তে পারে। এই নীতি দৈহিক ও মানসিক পরিণতি অনুসারে বিষয় ও পদ্ধতির ক্রমবিন্যস্ত করার ও বিষয়গ্রহণে ইচ্ছা ও উন্মুখতার উদ্রেক করার প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ দেয়।

উপরিউক্ত তিনটি প্রধান ছাড়া থর্নডাইক পাঁচটি অপ্রধান সূত্রের কথা বলেছেন। প্রথম,—"বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার নীতি"। একটি উত্তেজকের

থেকে বিষয়ীর দেহমনের নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'তে পারে। যে পশু বিবর্তনের যত উচ্চস্তরে স্থাপিত তার প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাও তত বিচিত্র হয় এবং শিক্ষার সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। আবার বুদ্ধ্যংকের, মনোবিকাশের ও শিক্ষার স্তর যত উচ্চস্তরে থাকে তত কম উত্তেজনায় বেশি প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। ছাত্রদের বুদ্ধি যত বেশি, শিক্ষা যত অগ্রসর, শিক্ষণীয় বিষয়ের তত বিচিত্র ব্যবহার তারা তত বেশি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে করতে পারবে।

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বুদ্ধিমান ও অগ্রসর ছাত্রেরা নানা-প্রকার মৌলিক সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশমূলক কাজে সাফল্যের সংগে অংশ গ্রহণ করতে পারে, আবার কমবুদ্ধি ছাত্রদের পক্ষে ভাষার প্রাথমিক কৌশলগুলি আয়ত্ত করাই যথেষ্ট আয়াসসাধ্য হয়। বুদ্ধ্যংকের সংগে ভাষার ব্যবহার ও সৃষ্টিক্ষমতার মান ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে' উচ্চকোটির বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা শব্দসম্পদ, বাক্যগঠন, ভাবগ্রহণ, বর্জন প্রভৃতি সর্ব-বিষয়েই বয়ঃক্রমানুসারে নিম্নকোটির বুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চশ্রেণির ও অধিকবয়স্ক ছেলেদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়,—"দৃষ্টিভংগি, উদ্দেশ্য বা মনোভাবের নীতি"। যে-কোনো প্রেরণার বিষয় বা বস্তু ছাত্রদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে, না বিরক্তিকর হবে, তাদের প্রতিক্রিয়া সদ্ভাবাপন্ন হবে না বিরোধী হবে, তা নির্ভর করে ওই বিষয়ে তাদের মতামত বা মনোভাবের ওপর। যেমন, অনেক ছাত্র আগে থেকে ব্যাকরণবিরোধী মনোভাব বা ব্যাকরণভীতি পোষণ করে বলে' ব্যাকরণ পড়ায় বিমুখ ও অপারগ হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতি ও প্রেরণার ভিত্তিতে ওই ভীতি দূর করা গেলে তারা হয়তো আগ্রহের সংগে ব্যাকরণ শিখে সাফল্যলাভ করতে পারতো।

তৃতীয়,—"আংশিক কর্মের নীতি।" একটি বিষয় বা পরিস্থিতির সমগ্র একত্রে গ্রহণ না করে' তার একেক অংশ নিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়।

যেমন, ছাত্রেরা পড়াশুনোয় নানাপ্রকারের অনেক ভুল করতে থাকলে শিক্ষক সমস্ত ভুলের একত্র প্রতিকারের চেষ্টায় তাকে বিপর্যস্ত না করে' একেক প্রকারের ভুল ধরে' ধরে' ধাপে ধাপে সংশোধনের কাজে অগ্রসর হ'লে বেশি সফল হবেন।

চতুর্থ,—"সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্যের নীতি"। যে-কোনো পরিস্থিতি-সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান, পরিচয়, অভিজ্ঞতা বা সহজাত সংস্কারের ভিত্তি নেই, সেইসব ক্ষেত্রেও অন্যান্য জানা বিষয়ের সংগে সাদৃশ্যের তুলনাদ্বারা স্পষ্ট-বোধ ও ধারণার সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন বলা হয়—"পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল", "বরফের দেশ যেন শ্বেতপাথরে মোড়া", অথবা সাহিত্যসৃষ্টিতে যেমন রূপক ও উপমার ব্যবহার অদৃষ্ট বস্তুকে, অনাস্বাদিত ভাবকে প্রত্যক্ষবৎ করে।

পঞ্চম,—"সাদৃশ্যজাত সঞ্চারণের নীতি"। এক ক্ষেত্রে অর্জিত কর্মক্ষমতা অন্য কর্মের ক্ষেত্রে অনুরূপ নৈপুণ্যের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, প্রাক্‌বিদ্যালয়ী স্তরে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশুর পেশীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বাড়ানো যায়, আশা করা যায় যে তার ফলে তার লিখতে শেখার সময়ে লিখনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ হাতের লেখা ভালো হবে। অথবা, ভাষাশিক্ষাপ্রসংগে ছাত্রদের বিভিন্ন স্তরে যে নানা বস্তু, বিষয় ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করা হয় তাতে ভাষার ব্যবহার-ক্ষমতার বৃদ্ধির সংগে সেই সেই বিষয়ের জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। আবার মাতৃভাষা অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার বাহন হওয়াতে প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষার সংগে মাতৃভাষার অধিকারও বৃদ্ধি পায়। সঞ্চারণের নীতি মনোভাব গঠনের প্রতিও প্রযোজ্য, পড়বার বই পছন্দ না হ'লে বা শিক্ষকের প্রতি বিরোধিভাব থাকলে অনেক সময়ে পঠনীয় বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মায়। আর বই, বিষয় ও শিক্ষকের প্রতি সুভাব থাকলে সেই বিষয়ে আগ্রহ জন্মায়।

থর্নডাইকের পরে যাঁরা মনোবিজ্ঞানের চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে জেস্টল্টের মতবাদ আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী। জেস্টল্টবাদীরা শিক্ষানীতিকে "সামগ্রিক" মনের ধারণার ওপর স্থাপিত করেছেন। মানুষের মন একটি একক, জটিল সত্তা, বস্তু ও ভাবময় জগতের আবেদনে ও অখণ্ডরূপেই সাড়া দেয়, বৃত্তি, প্রবণতা ইত্যাদির অনুসারে শাখাপ্রশাখায় কাজ করে না।

জেস্টল্ট মতাবলম্বী কফ্‌কা শিক্ষার দুইপ্রকার বাতাবরণের উল্লেখ করেন। একটি বাহ্যিক,—অবস্থান, পরিস্থিতি, ঘটনা, বস্তু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত স্পর্শ ও দৃষ্টিগোচর বাস্তব পরিবেশ। অপরটি আভ্যন্তরিক,—পরিস্থিতিজাত অভিজ্ঞতা, মানসিক প্রতিক্রিয়া, চিন্তা ও ব্যবহারের অভ্যাস প্রভৃতি দিয়ে রচিত চিন্ময় জগত। শিক্ষায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বাতাবরণ সমান মূল্যবান। ঘটনা ও তথ্যসমুচ্চয়ের মধ্যে জীবনের সমস্ত সত্য নিহিত নয়, শিক্ষকশিক্ষার্থীর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, ভাব, বিচার ও মতামত সমান সত্য। এদের প্রত্যেক অংশ নিজেকে ছাড়িয়ে, পরস্পরকে জড়িয়ে এক অখণ্ড সমগ্রতার সৃষ্টি করেছে। অংশ ও সমগ্রের এই সম্বন্ধ এত গভীর যে শিক্ষার কোনো সমস্যার সমাধান আংশিকভাবে করা যায় না।

যেমন কবিতাপাঠের সাফল্য সমগ্র কবিতার মধ্যে এককভাবে নিহিত থাকে। পৃথক পৃথক ছত্রের বিশ্লিষ্ট আলোচনায় নয়। মনের পরিণতির ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য, যে-কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে ছাত্র যখন আগ্রহান্বিত হয়ে গ্রহণবর্জনের দ্বারা অগ্রসর হয়ে চলে তখন তার মন সমগ্রভাবেই বিবর্তিত হ'তে থাকে, শিক্ষার অংশবিশেষের দ্বারা ক্ষমতাবিশেষের উন্নয়নের দ্বারা নয়।

এই মতের সংগে থর্নডাইকের তৃতীয় অপ্রধান নীতির বিরোধ থাকলেও ভ্রমসংশোধনের কার্যিক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে ভ্রমসংশোধনের

প্রথা প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। শিক্ষক যখন একটি করে' ভুলের সংশোধন করতে থাকবেন তখন মনের সামগ্রিক কার্যকারিতার ফলে তার সংগে সংগে শিক্ষার অন্যদিকেও সেই উন্নতি যদি সঞ্চারিত হয়ে যায় তবে তাতে শিক্ষার্থী লাভবান হবে।

মৌলিক সাহিত্যকর্মে বাহ্যিক-আন্তরিক-সংশ্লেষে মানুষের সমগ্র মন কাজ করে। একদিকে বাস্তবের ভিত্তি, প্রত্যক্ষ, জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্য, জাগতিক পরিস্থিতি আর অন্যদিকে অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, আশা-আকাংক্ষা, দাবিদাওয়া। সৃষ্টির উপকরণস্বরূপ ইটকাঠ, মাটিপাথর, রংতুলি, কাগজ প্রভৃতির ওপর এদের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় রূপরসের সৃষ্টি মূর্তিগ্রহণ করে।

মনোবিজ্ঞানী স্পিয়রম্যান মানুষের নূতন সৃষ্টির তিনটি সূত্রের কথা লিখেছেন। প্রথম ধাপে সহজ বোধ,—স্রষ্টা প্রত্যক্ষ, অনুভূতি, এষণা প্রভৃতি অনুভব করে। দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন প্রত্যক্ষাদির মধ্যে সম্বন্ধ-সমূহের স্থাপন,—যেমন দুটি বিষয় (প্রত্যক্ষ বা ভাবগত) দিয়ে স্রষ্টা তাদের সাদৃশ্য, মিল, অমিল প্রভৃতি দেখতে এবং বুঝতে পারে। তৃতীয় ধাপে বিষয় ও তজ্জাত সম্বন্ধসমূহের ধারণার মধ্য থেকে নূতন নূতন ভাবরূপের সৃষ্টি, যেমন জীবনের অভিজ্ঞতাকে নূতন পরিস্থিতি, নূতন ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করে' উপন্যাসের রচনা হয়।

তিন

মনোবৈজ্ঞানিকদের বিশ্লেষণজাত তথ্যগুলিকে শিক্ষণপদ্ধতিগঠনে প্রয়োগ করা শিক্ষাবিদ্‌দের কাজ। মানসিক গতিপ্রকৃতির অনুসারী স্বাভাবিক পদ্ধতি শিক্ষায় সাফল্যদান করে আর অস্বাভাবিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা শিক্ষকছাত্রের জীবনকে কণ্টকময় করে এবং শিক্ষার

নের অবনতি ঘটায়। মনস্তত্ত্বভিত্তিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল রাগুলিকে প্রধানত পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত বাতাবরণের কথা। বিদ্যালয়ের আবহাওয়া হবে সহানুভূতি-র্ণ, স্বাভাবিক, আনন্দময় ও মুক্ত, শিক্ষার্থী যাতে তার নিজেকে খুঁজে-ঝ নেবার উপযোগী পরিস্থিতি পায় ও বিদ্যালয়কে একান্ত আপনার :র' নিতে পারে। প্রকৃতি মানবসন্তানকে যেমন আনন্দময় কর্মের ধিকারী করে' সৃষ্টি করেছিল বিদ্যালয় যেন তাকে তেমনি করেই কশিত করতে পারে।

বিদ্যালয়পূর্ব বয়সের শিশু স্বাভাবিক খেলার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও ন্তাশক্তির ব্যবহারে নিজের মনের উৎকর্ষসাধন করে, স্বাধীন নুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিক্ষকের র্দেশ যদি এই প্রচেষ্টাকে খর্ব করে তবে তাতে কেবল তার পূর্ণ রিণতিলাভের পথে বাধা দেওয়া হবেনা, কৃত্রিম নিশ্চেষ্টতা ক্রমান্বয়ে ক্ষার মানের অবনতি ঘটাবে। অনেক বিদ্যালয়ে নিচের শ্রেণিতে াড়া বা কর্মমূলক কোনো আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে' শুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পরিচালনার সুযোগ ঘটে ; কিন্তু ওপরের াসে বালকবালিকার স্বচেষ্টার চেয়ে গুরূপদেশকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ল' শিক্ষার্থী নিচের ক্লাসগুলিতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে রতে ওপরের ক্লাসে উঠে সহসা কৃত্রিম পদ্ধতির অধীন হওয়ায় তার দ্ধি খুলতে চায়না।

এই মুক্ত আবহাওয়াকে বিদ্যালয়ের প্রশাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত :তে হবে। শিক্ষকছাত্রের সম্পর্কসম্বন্ধে তিনপ্রকার মতবাদের উল্লেখ রা যায়। প্রথম কর্তৃত্ব,—শিক্ষক হবেন কর্তা ও অধিশাস্তা। দ্বিতীয় প্রম,—শিক্ষকছাত্রের ভালবাসার সম্পর্ক হবে, ছাত্র শিক্ষককে ভালবেসে ার অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। তৃতীয় সহযাত্রা, জ্ঞান ও বোধের,

আবিষ্কার ও সৃষ্টির রোমাঞ্চকর পথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হবে সমান অভিযাত্রী। শিক্ষক প্রেরণা জোগাবেন, প্রয়োজনমতো সাহায্য করবেন এবং শিক্ষা অগ্রসর হবে পারস্পরিক আদানপ্রদানদ্বারা।

আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় তৃতীয় পথটি শ্রেষ্ঠ বলে' বিবেচিত হ'লেও, শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা যতই সাম্যমূলক হোক না কেন শিক্ষকছাত্রের প্রভেদ থাকবেই। জ্ঞানবৃদ্ধ ও মনস্তত্ত্ববিদ্ হওয়ার কারণে একপথে অগ্রসর হ'তে হ'তে শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয় এবং তৎসম্বন্ধে ছাত্রদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া পূর্বজ্ঞাত থাকবেন। যেমন ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার সময়ে প্রস্তুতবিষয়ের ভাবার্থের বোধে ছাত্রদের স্বয়ংসক্রিয় করলেও শিক্ষক নিজের পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিপদে সাহায্য করতে পারবেন এবং মনোবিজ্ঞান জানার ফলে ছাত্রমনের প্রেরণা-প্রতিক্রিয়াসমূহের স্বরূপও আগে থেকে অনুমান করে' নেবেন। প্রয়োজনমতো যে-কোনো বিষয় বুঝতে তিনি সাহায্য করবেন, তথ্যসমূহ কি ভাবে, কোথা থেকে, সংগ্রহ করতে হয় দেখিয়ে দেবেন, বিচারবিশ্লেষণের পদ্ধতি শেখাবেন গূঢ়ানুভূতির সন্ধান দেবেন। কখন কোন সাহায্যের দরকার, কখন কোন প্রতিক্রিয়াকে বিকশিত করার ও কোন বোধকে জাগ্রত করার প্রয়োজন এ-সমস্ত ছাত্রেরা নিজেরা না জানলেও শিক্ষক জেনে, বুঝে, তাদের স্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে খর্ব না করে' সহায়তাদানে অগ্রসর হবেন।

দ্বিতীয়ত প্রস্তুতি ও বিকাশের ক্রমের কথা। শ্রেণিকক্ষের কর্ম-প্রেরণায় অংশগ্রহণের উপযোগী করার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের সাবধানে প্রস্তুত করবেন। প্রত্যেক বয়সের উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক, চারিত্রিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের নানা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করবেন এবং বয়ঃসন্ধিকালের বিকাশোন্মুখ শক্তিসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবহার করবেন। শিক্ষার ক্রমনির্দেশে কেবল বয়সের বিচার করলে চলবে না, বুদ্ধির মান ও বিশেষ আগ্রহ ও ক্ষমতার অনুসারে ব্যক্তিগত পরিণতির ধারানির্দেশ

রতে হবে। বয়ঃসন্ধির উভয়মুখিতার কথা মনে রাখতে হবে,—তখন লকে নিছক বড়র দলে ফেল্লে চলবেনা, তার মধ্যে বাল্যশৈশবের যে চহ্নগুলি থাকবে এবং ব্যবহারে প্রকাশ পাবে তার কথা বুঝে নিতে বে। আবার উচ্চবুদ্ধি ছাত্র যে বস্তু ও ভাবসমৃদ্ধ পরিবেশে অধিকবয়স্ক াত্রদের চেয়ে বেশি মৌলিক ভাষা ও ভাবের ব্যবহার করতে পারে কথাও মনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত এষণা ও অভ্যাসের সামঞ্জস্যের কথা। শিক্ষার্থীর মনে চুর আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করতে হবে এবং বারবার অভ্যাসমূলক াজগুলিকে এমন বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষক করতে হবে যাতে বুদ্ধিমান্ াত্রদের আগ্রহ নষ্ট না করে' মন্দবুদ্ধি ছাত্রদের জন্য যথেষ্ট পুনরুক্তি ও নঃপঠনের ব্যবস্থা হ'তে পারে।

শিক্ষার্থীকে উদ্যমে প্রবৃত্ত করতে হ'লে তার মধ্যে প্রয়োজনবোধ াগ্রত করতে আর শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করতে হবে। বারবার অভ্যাসে াতে বিরক্তি না জন্মায় তার জন্য বিচিত্র পরিস্থিতির প্রবর্তন করতে বে। শিক্ষার্থীকে রুটিনের বাঁধাধরা নিয়মের সম্পূর্ণ বশবর্তী না করে' তদূর সম্ভব স্বপ্রণোদিত কর্মধারার অনুসারী করতে পারলে ভাল হয়। ক কাজ বারবার করবার সময়ে অবসাদের গ্লানি এড়াবার জন্য একবার াজ, একবার লেখাপড়া, একবার বিশ্লেষণ, একবার অভিনয় ইত্যাদি ভিন্নভিন্ন রূপে করতে হবে। উচ্চবুদ্ধিদের ক্ষমতার ঐশ্বর্য নিম্নবুদ্ধিদের ন্নয়নে ও পাঠ্যাতিক্রান্ত সম্পৃক্তবিষয়ের চর্চামূলক প্রয়োগে ব্যবহার রতে হবে। একই পাঠ্যক্রমের একাধারে অভ্যাসমূলক ও ঐশ্বর্যমূলক রিবেশনে শ্রেণির সকলকে সমভাবে আবিষ্ট করতে হবে।

চতুর্থত জীব থেকে শিবে অতিক্রমণের কথা। শিক্ষা সরল, সহজ, স্তুভিত্তি, পরিচিত বিষয় দিয়ে আরম্ভ করে' ধাপে ধাপে কঠিন, জটিল, পরিচিত ও ভাবময় বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবে।

মানবসন্তানের প্রথম জ্ঞান জৈবিক প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি ও বস্তু ওপর নির্ভরশীল, নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে বস্তু থেকে বাক্যে এবং বাক থেকে বস্তুতে যাতায়াত করে' মানবসভ্যতার পুনরাবৃত্তি করে' সে শিক্ষ পায়। এইজন্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থাপিত ব্যক্তি ও বস্তু তজ্জাত অভিজ্ঞতা শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপজীব্য। সংগে সংগে চিত্র বস্তুরূপ (model) কালোপটের লেখা, নক্সা (chart), মানচিত্র প্রভৃ প্রতিনিধির সাহায্যে পরিবেশরচনা করতে হবে। অনুকরণমূলক খেল থেকে আরম্ভ করে' নাটকীয়, ক্রিয়া, অভিনয় প্রভৃতিকে শিক্ষা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া বলে' গ্রহণ করতে হবে।

শিশুর "খেলাই কাজ, কাজই খেলা" খেলতে সে ভালবাসে আ তার বড় সাজার ইচ্ছা ও কল্পনা (make believe) এত প্রবল যে (কাজ করতে আরো ভালবাসে বলে' তার খেলাও কাজেরই অনুকরণ নির্ঝরের উদ্দামতাকে মানুষ যেমন করে' ব্যবহারে লাগায় তেমনি শিশু ক্রীড়াশীলতাকে শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করে' বয়সের ধাপে ধাপে কাজ কাজ খেলাকে বাস্তবিক কাজে বা ক্রিয়াশীলতায় উত্তীর্ণ করতে হবে।

পঞ্চমত, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা। শিক্ষা হবে স্বয়ংসক্রিয়তা দ্বারা,—শৈশবের খেলা থেকে আরম্ভ করে বাল্য ও কৈশোরের গঠন সৃষ্টিমূলক কাজের মধ্যে শিক্ষার্থী বাস্তবিক প্রয়োগদ্বারা বয়স্কজীবনে কুশলতা, জ্ঞান ও ভাবজগতে উত্তীর্ণ হবে। সচেষ্ট কর্মশীলতার দ্বারা সর্ব বৃত্তির উন্মেষ হবে। শিক্ষার্থীকে যদি সবকিছু দেখেশুনে, ব্যবহার করে মেপে, তুলনা করে', যাচাই করে' শিখতে হয় তবে তার শিক্ষা হবে অখণ্ড কর্মস্রোতের মধ্য দিয়ে (learning by doing), শান্ত হয়ে বেঞ্চিতে বসে' বই পড়ে' নয়। এই শিক্ষার উদ্যোক্তা ও উদ্দিষ্ট শিক্ষার্থী স্বয়ং শিক্ষক নিমিত্তমাত্র। শিক্ষার্থী নিজের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অনুভবের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করবে, সহযাত্রী শিক্ষক পথপ্রদর্শন করবেন

প্রত্যহ দেখা জিনিষ ও পরিস্থিতি থেকে অজানার রাজ্যে ও ভাব-
়গতে বিচরণ করার শিক্ষা হবে আরোহপদ্ধতিতে (inductive
ıethod)। ছাত্র পূর্বাবিষ্কৃত তথ্যসমূহের কথা বসে' বসে' শুনবেনা, নিজে
[নরাবিষ্কার করবে। ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তার সামনে
পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারলে সে শিক্ষকের সামান্য সহায়তায়
ান্তর্নিহিত সাধারণ নিয়ম বের করতে পারবে। সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়ে,
ক্তৃতা দিয়ে নিশ্চেষ্ট করে' রাখলে সে তোতাপাখীর মতো পরের বুলি
াাওড়াতে আওড়াতে অন্ধ অনুকারী হয়ে পড়বে, যে "নবনব উন্মেষ-
ালিনী বুদ্ধি" আবিষ্কার ও উন্নতির পথে প্রণোদিত করে, তার সেই
[দ্ধি নষ্ট হবে।

ভাষাশিক্ষার শাখাপ্রশাখা

জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষের পক্ষে ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য ; ক: চিন্তা ও ভাবের বিচিত্র বিকাশের বাহন ভাষা। তাছাড়া, পরিপ্ আত্মবিকাশের জন্য, পরস্পরের সংগে যোগসাধনের জন্য, সাহিত্যরসো' ভোগের আনন্দলাভের জন্য ভাষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভাষার সং ও প্রয়োজন মানবজীবনে এত নিবিড়, গভীর এবং ব্যাপক বলে' ভাষ শিক্ষা বিস্তৃত এবং নিগূঢ় হওয়া চাই।

মানুষ কথার সাহায্যে পরস্পরকে নিজের প্রয়োজন জানায় এ সহানুভূতি, ভালবাসা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ কে ধূর্তব্যক্তি ভাষার ছটায় ভুলিয়ে লোককে ভ্রান্ত করতে পারে, ভাষ দ্বারা বাগ্মিগণ জনতা আন্দোলিত করেন।

বলতে শেখা শিক্ষার অংগ। শিশু যখন বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণি আসে তখন কথিত ভাষার অধিকার তার সম্পূর্ণ হয় না, শিক্ষকে তার সংগে আলাপ-আলোচনা করে' তাকে নিজের প্রয়োজনের কথ অভিজ্ঞতার কথা বলতে উৎসাহিত করে' এমনভাবে গুছিয়ে কথা ব শেখাতে হবে যাতে অর্থ পরিষ্কার হয়। প্রাঞ্জলভাবে নিজের ক অপরকে বোঝাতে পারলে জীবনে ভুলবোঝার দুঃখের হাত এড়া যায়, কাজ ও কাজের নেতৃত্বের পথ সুগম হয়। তারপর শিক্ষার্থী শুধু পরিষ্কার করে' বিশদভাবে নয়, এমনভাবে কথা বলতে শেখাতে হ যাতে তার কথা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে। এই শক্তি বিদ্যালয়েই আয়ত্ত করবে, শুধু ক্লাসের কথাবার্তায় নয়, নানা কাজ এ বক্তৃতা, তর্ক, আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। অভিনয়, আবৃ প্রভৃতির দ্বারা সুসাহিত্যের ভাষাকে রূপদানের অভ্যাস হ'লে নিজে

বক্তব্য ও উপযুক্ত ভাবভংগিসহকারে বলতে পারবে। কোনো শিক্ষার্থীর মধ্যে বাক্‌প্রতিভা নিহিত থাকলে বাগ্মীটিকে গড়ে' তোলার ভার যেন বিদ্যালয় নিতে পারে।

মানুষ শুধু কথা বলেনা, লেখাপড়া করে। শিক্ষার্থী পড়তে শিখবে কেবল নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নয়, কাজকর্মে ও জ্ঞান আহরণে ভাষার মাধ্যম সফলভাবে ব্যবহারের জন্য, মানুষের সংগে ভাবযোগ সাধনের জন্য, গভীর সাহিত্যরস উপলব্ধি করার জন্য।

পড়তে শেখার প্রথম প্রয়োজন জ্ঞান আহরণ করার এবং কাজের কথা পড়ে' বোঝার জন্য। এই কারণে শিশুকে তার পড়ার মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যবহারের সংগে পরিচিত করে' দিতে হয়। অন্যান্য শ্রেণিতে সে বাংলাভাষার মাধ্যমে যে-সব বিষয় পড়বে সেগুলিকে সহজে আয়ত্ত করার মতো ভাষার অধিকার তার চাই। ভাষার দুর্বলতার জন্য জ্ঞানার্জন কঠিন হ'লে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে পেয়েও জাতীয় জীবনে শিক্ষা সফল হবে না।

শিশু অল্প বয়স থেকে সাহিত্যরস উপভোগ করতে পারে ; যখন ছেলেভুলোনো ছড়া আর ছোট গল্প পড়তে শিখবে তখন থেকেই সাহিত্যের সংগে তার পরিচয়। এখান থেকে তাকে উদারতর সাহিত্য ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে' দিতে হবে যাতে তার আনন্দ আর কাব্যাস্বাদ দুইই ঘটে। তারপর সাহিত্য শিক্ষিতমনের যে মিলনসাধন করে তার মূল্য কম নয়। পাশ্চাত্ত্যভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত বাঙালির শিক্ষিত ইংরেজের সংগে যতটা মিল আছে অশিক্ষিত বাঙালির সংগে তার একাংশও নেই বলে' রবীন্দ্রনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মধ্যে সেই অন্তরংগতা স্থাপিত করতে হবে, দেশের সংগে দেশবিচ্ছিন্ন শিক্ষিত বাঙালির মিলনসাধন করতে হবে, তাদের দেশকে চেনাতে হবে।

যেমন জীবনে, তেমনি বিদ্যালয়ে, ভাষার দুই ব্যবহার, এক কার্যি ও জ্ঞানিক এবং অপর ভাবময় ও সাহিত্যিক। শিশু যখন প্রথম পড়ে শেখে তখন ছড়া, গল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আনন্দে পাঠের পাথে সঞ্চয় করে' ক্রমশ সাহিত্যের মাধ্যমেই নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পে থাকে, তখন সে দেশের, জগতের, নানা তথ্য আহরণ করতে ও জীব সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারে। এইজন্য সাহিত্যপাঠের প্রসং বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের স্থান আছে। উপরন্তু সাহিত শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধপাঠে যে শব্দসম্ভার ও ভাষাব্যবহার আয়ত্ত করে তার সহায়তায় অন্যান্য বিষয়ের পাঠও সহজ ও সফল হয়

অপরপক্ষে সাহিত্যের দিকটা বিদ্যালয়ে অবহেলা পায়। বিদ্যাল সাধারণত যে পদ্ধতিতে এবং যতটুকু সাহিত্যপাঠ হয় তার সাহা সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা কঠিন, এইজন্য সাহিত্যোপভোগের পাঠে দরকার এবং ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের গ্রন্থাবলি যাতে স্বেচ্ছা উপভোগ করতে পাবে সেই শিক্ষা তাদের দেওয়া চাই। বিদ্যাল সাহিত্যালোচনার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে মানসিক সংগ স্থাপিত কর হবে। ছাত্রেরা যে শুধু সাহিত্যের সমালোচনা করবে তা নয়, সাহিত পাঠ ও অনুভব তাদের শিক্ষার অংগ হওয়া চাই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদে সৃষ্টি একসংগে উপভোগ করতে পারলে সাহচর্য আরো নিবিড় হবে।

প্রশ্ন করা হয়, নিছক সাহিত্যপাঠের কোনো মূল্য আছে কিনা বোধে সাহিত্যপাঠের পূর্ণতা ; কিন্তু পাঠ তার প্রথম সোপান, এইজ সাহিত্যপাঠ, বিশেষ করে' কাব্যপাঠের যথেষ্ট মূল্য আছে। নিছ পাঠের ক্ষেত্রে অবশ্য নীরবের চেয়ে সরব পাঠ অধিক প্রভাবশীল আবার এমনও হ'তে দেখা গেছে যে, যে বিষয় প্রথম বোধগম্য হ'ল সেটি বারবার পাঠে বোঝা যায়। অধিকন্তু প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টির স্বভা হ'ল গূঢ়তা ও বহ্বার্থতা। একবারে যার পূর্ণ অনুভব হয়না ব্যাখ্যা

দ্বারা তার কূল পাওয়া সম্ভব নয়। বহুদ্বার মন্দিরের একেকটি দ্বার অতিক্রমণের দ্বারা ক্রমান্বয়ে যেমন ইষ্টদেবতার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, সহস্রদল পদ্মের একেকটি দলের উন্মীলনে যেমন তার হৃদয় উন্মোচিত হয়, অনেক যবনিকার অপসারণে যেমন সৃষ্টিরহস্য প্রকাশিত হয়, তেমনি বহুপঠনে, বহুদিনে, শ্রেষ্ঠসাহিত্য মনের দ্বারে ধীরে উদ্ঘাটিত হ'তে থাকে।

শিক্ষক প্রচুর পরিমাণে সাহিত্যের জোগান দেবেন। বিদ্যালয়ের গন্থাগার যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হ'লে পুস্তকসংগ্রহের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। ছাত্রেরা নিজেদের বই বদল করে' পড়তে পারবে অথবা চাঁদা এবং দান সংগ্রহ করে' ছোটখাট পুস্তকসংগ্রহ গ'ড়ে তুলবে। পাঠ্যবহির্ভূত পাঠের জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির সংগেও যোগাযোগ চাই।

ব্যাপকক্ষেত্রে সাহিত্যপাঠের একটি সমস্যা হ'ল শিক্ষকেরা যে সমস্ত বই পড়া ছোটদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন সেগুলি থেকে ছাত্রদের সরিয়ে রাখার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়।

প্রথমত "অবাঞ্ছনীয়" বই দুই প্রকারের হ'তে পারে, এক,--যে বয়সে যেরূপ বইয়ের উপযোগী অভিজ্ঞতা বা মানসিক পরিণতি হয়নি সে বয়সে সেরূপ বই পড়া অবাঞ্ছনীয়, আর দুই,—যে-সব বই রুচি ও নীতির দিক দিয়ে হীন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির বই ছাত্রদের মারাত্মক ক্ষতি করেনা, বরং একটি নিষেধের প্রাচীর তুলে ধরাটাই গোপনে পড়ার প্রবৃত্তি দিয়ে বেশি মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণির অবাঞ্ছনীয় বইয়ের দিকে ঝোঁক শিক্ষক সুসাহিত্যের প্রচুর খোরাক জুগিয়ে ও সাহিত্যিক উপভোগের একটা মান সৃষ্টি করে' দূর করবেন।

চরিত্রগঠনোপযোগী সাংস্কৃতিক পরিবেশ না পেলেই কুরুচি ও দুর্নীতির আবেদন মারাত্মক হ'তে পারে, নতুবা নয়।

পড়ার মত লেখাকে আনন্দ, ব্যবহার ও উপভোগের পথে আত্ম-প্রকাশ ও সৃষ্টির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে' দিতে হবে। প্রথম লিখবার সময়ে আনন্দ না পেলে লিখতে শেখা শিশুর পক্ষে কঠিন, তাই যা তার ভাল লাগে সেইসব বিষয় অবলম্বনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত লেখার দ্বারা তার লেখার শক্তি গঠিত হ'লে তবে ক্রমশ ব্যবহারবিশুদ্ধির অভ্যাস করাতে হবে। ব্যাকরণ সে প্রয়োগদ্বারা শিখবে আর ব্যবহার শিখবে সত্যকার ব্যবহারে। খেলায় আনন্দের সংগে কাজের সমন্বয় ঘটবে। খেলার ছলে ডাকঘর, ব্যাংক, দোকান ইত্যাদি স্থাপন ক'রে তার কর্মপদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হবে, বেচা-কেনা এবং কাজকর্ম-সম্বন্ধীয় কথাবার্তার গুছিয়ে কথাবলার অভ্যাস হবে, লেবেল, টিকিট, বিল, তালিকা, বিজ্ঞাপন ও সাইনবোর্ডগুলি পড়তে পড়তে পড়ার অভ্যাস হবে এবং সেগুলি যারা লিখবে তাদের লেখারও অভ্যাস হবে। ডাকে দেবার জন্য এবং দোকানের কাজের সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি লিখে রচনাশক্তি বাড়বে। ইংরেজিতে চিঠি লেখার ক্লাস আছে, বাংলাতেও থাকা উচিত, কিন্তু শ্রেণিকক্ষে বসে' শিক্ষকের হুকুমে লেখার চেয়ে চিত্তাকর্ষক কাজের সম্পর্কে আন্তরিক তাগিদে লেখা অনেক সরস হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিতে শুধু কাজ-কাজ খেলা নয়, বাস্তবিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ছেলেপিলেরা বাগান বা শিল্পসম্পর্কে যে কাজ করবে সে-সবের হিসেব রেখে', বর্ণনা লিখে লেখাপড়া শিখবে। ভারতীয় শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবে বিদ্যালয়ী শিক্ষার সবস্তরে কাজ ও সমাজসেবার কথা বলা হয়েছে, সাহিত্যের শ্রেণিতে সে-সব বিষয়ে আলোচনা ও লেখা হ'তে পারে।

এইসব খেলা আর কাজ একাধারে জ্ঞানবৃদ্ধি, ভাষাশিক্ষা, জাগতিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা দান করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার সাফল্য থেকে "পুস্তকহীন" শিক্ষার আদর্শের প্রবর্তন হয়েছে, তাতে

শিশু ব্যবহারের দ্বারা লেখাপড়া শেখে এবং সাহিত্যানুভূতির জন্য ইচ্ছামত বয়সোপযোগী বই পড়ে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করেনা।

বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একটি শিল্পের (প্রধানতঃ সুতো কাটা ও কাপড়বোনা) চারিদিকে কেন্দ্রীভূত হয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে এরূপ এককেন্দ্রিকতা সম্ভব নাও হ'তে পারে, কিন্তু বিষয়সীমা অতিক্রম ক'রে কয়েকটি সাধারণক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। বস্তুত আধুনিক শিক্ষাচিন্তা যেমন তথ্যের আহরণ অপেক্ষা অভিজ্ঞতা ও অনুভবের ওপর জোর দিচ্ছে তেমনি অনেক অগ্রসরশীল দেশে পাঠ্যক্রমের মধ্যে বৃহত্তর বিষয়কেন্দ্র ব্যবহৃত হচ্ছে। কোথাও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রে স্থাপিত ক'রে নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সমস্ত বিষয়ের অধ্যয়ন ও আলোচনা হয়। কোথাও দুচারটি ক'রে বিষয়সীমা লঙ্ঘন ক'রে বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থাপিত হয় (যেমন ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির মূল কথাগুলি নিয়ে সমাজ-বিদ্যা নামক বিষয়ের প্রবর্তন অথবা সমাজ বিদ্যার সংগে ভাষা-শিক্ষাকেও জড়িত করে' নেওয়া), আবার কোথাও বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ একাকার না ক'রে পারস্পরিক অনুবন্ধের দ্বারা পড়ানো হয়।

আমাদের বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা নিয়মের আবহাওয়ায় উল্লিখিত অন্যান্য ব্যবস্থার প্রয়োগ সহসা সম্ভব না হ'লেও সমস্ত শিক্ষার সংযোগসূত্র মাতৃভাষাকে প্রত্যেক বিষয়ের সংগে গভীরভাবে অনুবন্ধিত করার উপায়চিন্তার প্রয়োজন আছে। এতে বহুপ্রয়োগের দ্বারা ভাষার অধিকার বাড়বে, বাস্তবক্ষেত্রে বিন্যস্ত হয়ে ভাষার ব্যবহার বাস্তবিক হয়ে উঠবে এবং অন্যান্য বিষয়ও ভাষার সাবলীলতায় উজ্জ্বলতর হবে।

এ ভিন্ন ছাত্রেরা যদি মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির উৎসাহ পায় অথবা হাতেলেখা মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ বা দেয়ালপত্রী চালাবার সুযোগ পায় তবে সাহিত্যশিক্ষা সর্বাংশে সাফল্যলাভ করবে। শিশু

চিরকালের স্রষ্টা, আত্মপ্রকাশের আকাংক্ষা তার মধ্যে আছে। এ চেষ্টা যাতে আদৃত ও সম্মানিত হয় শিক্ষককে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া তাদের মধ্যে দু-একটি কবি ও সাহিত্যিকের অংকুর থাকতে পারে, ও তাদের সৃষ্টিপ্রেরণা যেন উৎসাহিত হয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের "হরিণবাটি" থেকে পালিয়ে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন, ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথকে অংকুরিত ও বিকশিত করার গৌরব যেন বিদ্যালয়ই পেতে পারে।

বলা, লেখা ও পড়ার মধ্য দিয়ে ধীরেধীরে ধাপেধাপে, ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যপরিচয় অগ্রসর হয়। এর বহু অংগ। কথা বলতে, বাগ্‌বিন্যাস করতে, তর্ক ও বক্তৃতা করতে, আবৃত্তি ও অভিনয় করতে শিখে ভাষার মৌখিক ব্যবহার আয়ত্ত হয়; শব্দ ও বাক্যের পাঠ শিখে পড়া শেখা হয়: পাঠ দুর্বল থেকে ক্রমে সাবলীল অনায়াসপাঠে উত্তীর্ণ হয়ে কঠিনতর পাঠের দিকে অগ্রসর হয়, সাহিত্য সাহিত্যশ্রেণি ছাড়িয়ে অন্যান্য বিষয়ের সংগে জড়িত হয়। লেখার ব্যাপারেও তাই। প্রথমে কাজ ও খেলার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের সঙ্গে, ছোটছোট বাক্যে, সহজ রচনা, তারপর ক্রমে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি। এর আয়োজন অনেক —কথাবার্তা, আলোচনা, তর্ক, বক্তৃতা, অভিনয়, বইপড়া, ব্যাখ্যা করা, পড়া দেওয়ানেওয়া, ব্যাকরণ, অনুবাদ, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরীক্ষাসাগর পার হ'লে তবে ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলে' ধরা হয়।

এরমধ্যে কোনো কোনো কাজ শ্রেণিকক্ষের মধ্যে, কোনো কাজ কক্ষের বাইরে এবং কিছু কিছু বিদ্যালয়ের বাইরে করা হবে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের আপাতিক শুষ্ক রীতির আওতায় সর্জনমূলব সাহিত্যিক প্রচেষ্টা প্রায় অসম্ভব বলে শিক্ষাবিদেরা ছাত্রদের জন্য সাহিত্য সমিতির স্থাপনের কথা বলেছেন। সমিতিতে সভ্যরা স্বতঃ

প্রবৃত্তভাবে কাজ করে বলে' শিক্ষকরা এক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ, স্বভাব, নৈপুণ্য প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করতে পারেন। সমিতিতে তারা আনন্দের মাধ্যমে রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে। নিয়মানুবর্তিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার অভ্যাস, তৎপরতাব বৃদ্ধি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রকৃতির দ্বারা তাদের মানসোৎকর্ষ সাধিত হয় এবং বিশুদ্ধ সাহিত্যরসে তাদের অবসরবিনোদন হয়।

বিদ্যালয়ের পঞ্চমষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই ছাত্রদের সাহিত্যসমিতির গঠন করতে উৎসাহিত করা যায়। সমিতির তত্ত্বাবধানের ভার একজন শিক্ষকের ওপর থাকবে এবং ছাত্রদের মধ্য থেকে সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবপরীক্ষক নির্বাচিত হবে। সমিতির নিয়মিত কার্যবিবরণী রাখা হবে এবং প্রত্যেক সভ্যের একেকটি করে' প্রশ্নোত্তর ও সংগ্রহের খাতা থাকবে।

প্রতিমাসে চাঁদা সংগ্রহ করে' ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা হবে। উপরন্তু দানগ্রহণ এবং সাহিত্যিক প্রদর্শনী, বিচিত্রানুষ্ঠান, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি ব্যাপারে প্রবেশমূল্য ধার্য করেও অর্থসংগ্রহ করা যাবে।

প্রতি শনিবার একঘণ্টা সময় সমিতির অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এবং অংশগ্রাহী ছাত্রদের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য প্রশংসাপত্র, পুরস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকতে পারে।

সমিতির সভ্যরা তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের উৎসাহ ও সহযোগিতায় মৌলিক গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি রচনায় উদ্যোগী হবে। সেগুলি সংগ্রহ করে' হাতের লেখা পত্রিকা ও দেওয়ালপত্রীতে প্রকাশ করবে এবং শেষে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে বিদ্যালয়পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্বাচিত করা হবে।

বিতর্ক, আবৃত্তি ও অভিনয়কে সাহিত্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ধরা যায়। সাহিত্যপ্রসিদ্ধ কোনো স্থানে ভ্রমণ বা জীবিত সাহিত্যিক

সন্দর্শনের ব্যবস্থাও সাহিত্যিসমিতি করবে। স্বাধীন সাহিত্যপাঠ ও আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া, বেতারে বা সভাসমিতিতে সাহিত্য বক্তৃতা শোনা বা আলোচনায় যোগ দেওয়া, সাহিত্যিকদের বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে' আনা প্রভৃতি সাহিত্যসমিতির কর্তব্যের অন্তর্গত হবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বহু অপচেষ্টা ও পদ্ধতির অপপ্রয়োগ রয়েছে; বহু অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে, বহু আবশ্যককে অবহেলা করা হয়েছে; বাহিরের ব্যবহারিক, যান্ত্রিক, অর্থ ও রাজনৈতিক নানা কারণবশত বহুক্ষেত্রে মনোবিকাশের সত্যকে খর্ব করা হয়েছে, আদর্শকে সংকীর্ণ ও বিকৃত করা হয়েছে; বহুক্ষেত্রে প্রাচীনের প্রতি অনাবশ্যক মোহ ও নূতনকে গ্রহণ করায় কুণ্ঠার ফলে সুপদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাহত হচ্ছে; এই সবের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাতরীর পরিচালনা করতে হবে, বাস্তবের সমস্ত তুচ্ছতার সম্মুখীন হয়ে, তাকে জয় করে' আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মুখের পড়া

ভাষা মানুষের পারস্পরিক সংযোগসূত্র। মুখের ভাষাই এর সর্বাধিক ব্যবহৃত রূপ। শিশু যখন বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণিতে ভর্তি হয় তখন কথাবার্তাই হ'ল তার চিত্তাকর্ষণের প্রধান উপায়। তার সংগে কথা বলে', তার কথা শুনে, তাকে ভুলিয়ে, বুঝিয়ে, তার চিত্তবিনোদন করে' শিক্ষক তাকে আপনার করে' নেবেন তাকে আগ্রহান্বিত করে' বিদ্যালয়ের নানা কাজে লিপ্ত করবেন।

গল্পবলা কথাবার্তার অংগ। গল্প যেমনভাবে শিশুকে মুগ্ধ করে' আকর্ষণ করে তেমন আর কিছু নয়। পরির গল্প সর্বদাই ছোট শিশুর প্রিয়। মন্তেসরির শিক্ষাব্যবস্থায় অসত্যকথনের অভিযোগে পরিকাহিনীর বিরোধিতা করা হয়েছে। সম্ভবত ওই শিক্ষাপদ্ধতি প্রথমে অস্বাভাবিক শিশুদের নিয়ে প্রবর্তিত হওয়ায় তার মধ্যে স্বাভাবিক শিশুচিত্তের কল্পনার ঐশ্বর্যের দিকটা গ্রাহ্য হয়নি। বাস্তব অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করতে পারেনি যে পরির গল্প মিথ্যার সহায়ক, কাজেই এগুলি সবচেয়ে ছোট শিশুদের কাছে নিশ্চিন্তচিত্তে বলা যেতে পারে। এ-ছাড়া শিশুজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গল্পও তারা আগ্রহের সংগে শোনে। কোনো কোনো শিশু গাড়িঘোড়া, কলকব্জার প্রতি ঔৎসুক্য দেখায়, আবার অন্যেরা অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়। এইসব চাহিদা মেটাবার উপযোগী গল্প সংগ্রহ করার ভার শিক্ষকের, তিনি যেন সবরকমের গল্পের একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেন যাতে শিশুচিত্তের সব অংগ সমানভাবে বিকশিত হয়। তাছাড়া জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ইসপের কাহিনী প্রভৃতিতে এমন অনেক গল্প পাওয়া যায় যাতে জীবজন্তু,

গাছপালা, জিনিষপত্র প্রভৃতিকে নায়করূপে কল্পনা করা হয়েছে; এগুলিও শিশুদের প্রিয়।

ক্রমশ শিশুর সামনে একদিকে যেমন দেশবিদেশের নানা রূপকথার ভাণ্ডার খুলে যাবে, অপরদিকে তেমন ইস্কুলের গল্প, গার্হস্থ্যজীবনের গল্প প্রভৃতি সে উপভোগ করবে। বই পড়তে শিখে সে গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করবে, কিন্তু তখনও তার গল্পশোনার কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবেনা এবং শুধু গল্প নয়, গল্পের ছলে দেশবিদেশের অথবা সাহিত্য-ইতিহাসের নানাকথা শুনতে সে চিরকাল ভালবাসবে। বিদ্যালয়ে যদি বাইরের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বড় বড় সাহিত্যিক ও লেখক-দের সম্মানিত অতিথিরূপে আহ্বান করে' এনে ছাত্রদের বক্তৃতা শোনার ব্যবস্থা হয় তবে দৈনন্দিনের জড়তামুক্ত শিক্ষায় আগ্রহবৃদ্ধি হবে। এছাড়া বেতারে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং গ্রামোফোন রেকর্ড শুনে গান, নাটক, আবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষা ও মনোরঞ্জন একত্রে হয়, প্রসিদ্ধ গায়ক, অভিনেতা, সাহিত্যিকের কণ্ঠ শোনা যায়, দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা শোনা যায়। আজকাল টেপ-রেকর্ডারের প্রচলন হওয়ায় মূল্যবান বক্তৃতা, আদর্শ কণ্ঠস্বর প্রভৃতি স্থায়ী করে' রেখে পরে প্রয়োজনমতো বারবার ব্যবহার করা যায়।

মৌখিক পড়ানোর মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর। শিশু যখন অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে কয়েক ছত্র পড়তে পারে মাত্র তখন বইকে তার জ্ঞান-লাভের একমাত্র পথ করলে সে পথ তার কাছে একরকম রুদ্ধ থাকে। তাই পড়তে শিখবার পরও কথার ছলেই অনেকখানি শিক্ষা হওয়া উচিত। শুধু নিচের ও নিম্নমধ্য শ্রেণির নয়, ওপরের ক্লাসের ছেলেদের কাছেও অধীতবিদ্যার চেয়ে শ্রুতবিদ্যা অধিক চিত্তাকর্ষক। কলেজের অধ্যাপনাও হয় "বক্তৃতার" দ্বারা।

শিক্ষক যদি উপযোগী উপকরণের সাহায্যে সুন্দর ভংগিতে শিক্ষা

দিতে পারেন তবে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা বইয়ের শিক্ষার চেয়ে ফলপ্রদ হয়। মুখে মুখে জ্ঞানসঞ্চারণে ছেলেরা গ্রন্থকীট হ'তে পারেনা, বইয়ের কথাকে সর্বস্ব মনে করে' পরীক্ষা দিয়ে যায়না। বক্তৃতার সংগে সমীক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা জ্ঞান অর্জনে অভ্যস্ত হয় বলে' প্রমাণের যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে। এই পদ্ধতিতে ক্লাসের পড়ার ওপর নির্ভর করতে হয় বলে' মন দিয়ে চটপট বুঝে নেওয়ার অভ্যাস হয়, অন্যথা ছাত্র যদি জানে যে সে যতই ফাঁকি দিক না কেন, শেষ মুহূর্তে বইয়ের কয়েকটা পৃষ্ঠা কণ্ঠস্থ করে' নিলেই হবে, তাহ'লে শুধু যে তার শিক্ষা দোষপূর্ণ থেকে যায় তা নয়, শিক্ষার প্রতি তার শ্রদ্ধা কমে' যায়।

কানে শুনে শেখার পদ্ধতি বালস্বভাবসম্মত। বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকা অল্পবয়সের রীতি নয়। বালক তার শরীরমনকে কাজে নিযুক্ত করে' যে জ্ঞান অর্জন করে তা দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়।

আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকছাত্রের আলোচনার ভিত্তিতে পাঠ ও কর্মপ্রকল্প গৃহীত ও পরিচালিত হয় বলে' এতে বলা ও শোনার প্রাধান্য। আলোচনায় বলার যত প্রয়োজন শোনারও ততটাই। একজন বলবে, অপরে শুনবে এইভাবে পরস্পরের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যানের সম্পূর্ণ বোধের ভিত্তিতে কাজ অগ্রসর হবে। এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কাজে নির্ভুলভাবে নির্দেশপালনের জন্য নিপুণভাবে শুনতে শেখার প্রয়োজন।

উপযুক্ত শ্রোতৃত্বের নৈপুণ্য অর্জনের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। শিক্ষক বা ছাত্রনেতার প্রত্যেক নির্দেশ শুনে বোঝা, গল্প, বক্তৃতা, ভাষণ, আবৃত্তি, অভিনয়, রেড়িও ও টেপ-রেকর্ডারে গৃহীত বিবিধ বিষয় শুনে তার অর্থগ্রহণ ও ভাবানুভব, আলোচনার সময়ে সৌজন্যের সংগে, ভদ্রতার সংগে পরস্পরের কথা শোনা ও বোঝা, এই সমস্ত নৈপুণ্যই শিক্ষাসাপেক্ষ। কি করে' কথিত বিষয়ের মূলকথাগুলি কানে শুনে

ধরতে হয়, কি করে' ধৈর্যের সংগে অপরের মতামত শুনতে হয়, এইসব বিষয়ে শিক্ষক কেবল উপদেশ দেবেন না, বারবার উপযুক্ত পরিস্থিতিতে কাজ করিয়ে অভ্যাস করাবেন। শ্রবণলব্ধ ফল নিয়ে ছাত্রেরা আলোচনা করবে, সাফল্য ও অসাফল্যের বিশ্লেষণ করে', কারণনির্ণয় করে' যে-ভাবে সাফল্য পাওয়া যায় সেও সেই পন্থার অনুসরণ করবে এবং অসাফল্যজনক রীতিগুলি এড়িয়ে চলবেন।

শ্রবণশক্তির প্রাখর্য ও সূক্ষ্মতাবৃদ্ধির জন্য নানাবিধ শব্দ শুনে অনুমানে কারণনির্ণয়ের অভ্যাস করাতে হবে। নগরের নানাবিধ যানবাহন, কলকব্জার শব্দ, গ্রামের পাখির ডাক, পাতার মর্মর প্রত্যেকটি যাতে ছাত্রের সংবেদনশীল কর্ণপটাহে বিশিষ্টরূপে ধরা দিতে পারে এরূপ তৎপরতা অভ্যাসদ্বারাই সৃষ্ট হতে পারে।

মৌখিক শিক্ষার দুটো দিক্,—শোনা এবং বলা, আদান এবং প্রদান। শিক্ষকের বলা ছাত্র শোনে আবার তাদেরও বলতে হয়। শিক্ষক সাধারণত শ্রেণিতে প্রশ্নোত্তরদ্বারা পাঠদান করে' থাকেন, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দেওয়ার মধ্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন আবার কৌতূহলী ছাত্র যখন সুশিক্ষকের প্রেরণায় আগ্রহান্বিত হয়ে স্বতঃ-প্রণোদিত প্রশ্নের দ্বারা যে অংশ বোঝেনি তা বুঝে নিতে চায় অথবা যতটুকু শিক্ষক বলছেন তার চেয়ে বেশি জানতে চায়, তখন তার জন্যেও শুনে বোঝা ও বলে' অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করার বিশেষ ক্ষমতার দরকার।

শিক্ষার মতো পরীক্ষার ক্ষেত্রেও মৌখিক পরীক্ষার স্থান আছে। মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা কথাবলার যে অভ্যাস হয় তার মূল্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে খুব বেশি। জীবিকা উপার্জনের সম্পর্কে এবং চিঠিপত্র লেখায় ব্যতীত অধিকাংশ বয়স্ক লোক লেখার কাজ করেনা, তাদের জীবনের অধিকাংশ কাজ ও ভাবের আদানপ্রদান মুখের কথায় হয়।

কর্মজীবনে প্রবেশ করবার সময়েও অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে এবং কর্মক্ষেত্রেও অনেকের জীবিকা মুখের কথার ওপর নির্ভর করে। এইসব কারণে ছাত্রদের গুছিয়ে, সপ্রতিভভাবে কথা-বলার অভ্যাস করিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

মৌখিক পরীক্ষায় পঠিত বিষয়ের জ্ঞানের পরীক্ষার সংগে কথা-বলার সপ্রতিভ ভংগিরও পরিচয় নেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণির পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে মৌখিক এবং তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কিছু লিখে ও কিছু মুখে পরীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ওপরের শ্রেণিতে একেবারে নেই। এ নিয়ম হানিকর। জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দিলেও ছাত্রদের যখন কর্মজীবনে পা দেবার মুখে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয় এবং কাজকর্মেও কথাবলার ওপর প্রভূতভাবে নির্ভর করতে হয় তখন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণি পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন থাকা দরকার।

যে-সব অভ্যাসের দ্বারা ছাত্রের কথাবলার শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে আবৃত্তি তার মধ্যে একটি। খুব নিচের শ্রেণিতে শিশুরা যখন ছড়ার আবৃত্তি করে তখন থেকে উঁচুক্লাসের শ্রেষ্ঠ কবিতার আবৃত্তি পর্যন্ত একই শক্তির ক্রমবিকাশ হয়। আবৃত্তিতে মৌলিক রচনার সুযোগ নেই বলে' কেউ কেউ একে মৌখিক কাজের মধ্যে ধরতে চাননা, কিন্তু এতে আত্মপ্রকাশের শক্তি বিকশিত হয়ে কাব্যরসের মধ্যে ছাত্রের মন মুক্তি পায়।

আবৃত্তির উপযোগী সংগ্রহপুস্তক বাংলায় কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া শিশুপাঠ্য কবিতার বই ও মাসিক পত্রাদি থেকে এবং শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার থেকে শিশুবালকিশোরপাঠ্য কবিতা নিয়ে ছাত্রেরা স্বয়ংসঞ্চয়ন করলে সেগুলি একাধারে সাহিত্যালোচনার ও আবৃত্তির উপকরণরূপে ব্যবহৃত হতে পারবে।

কবিতা মুখস্থ করায় সুপদ্ধতির প্রয়োগ না হ'লে সমস্ত ব্যাপারটা ছাত্রদের পক্ষে কঠিন ও ভীতিজনক হয়ে পড়ে। সাধারণত কবিতার একেকটি ছত্র বহুবার উচ্চারণ করে' একেক ছত্র করে' মুখস্থ করা হয়, কিন্তু এ অভ্যাস গ্লানিকর এবং এতে মুখস্থ করা সহজ না হয়ে বরংচ ভ্রমের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আনন্দের সংগে সত্বর কবিতা মুখস্থ করতে হ'লে আবৃত্তিভংগির সাহায্য নিতে হবে। কবিতাটির অর্থ বুঝে সমগ্রভাবে বারবার পড়ে' তাকে আয়ত্ত করতে হবে। এরূপ অভ্যাসে আবৃত্তির বসে মুখস্থ করার ক্ষমতা ক্রমশ এমন বৃদ্ধি পায় যে ছাত্র কয়েকবারমাত্র আবৃত্তি করে' মুখস্থ করতে পারে।

আবৃত্তি ও অভিনয়ের নিকট সম্পর্ক। আবৃত্তিতে ভাবপ্রকাশের যে-সব পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি অভিনয়ধর্মী। শিশুশ্রেণির প্রথম থেকেই অভিনয় করা চলবে। যে অতি ক্ষুদ্র শিশু ড্রাইভার, পুলিশ, সেপাই ইত্যাদি সেজে কল্পনার উৎস খুলে দেয়, সে-যে শৃগাল সেজে দ্রাক্ষাফলের জন্য লাফাতে বা মৌমাছি সেজে নেচে নেচে মধুর সন্ধানে যেতে চাইবে তাতে সন্দেহ নেই। শিশুশিক্ষার প্রায় সকল পাঠকেই শিশুরা নিজেরা ছোট ছোট নাটিকায় রূপান্তরিত করতে পারে। এতে শিশুর পাঠ্য বুঝবার সহায়তা করে এবং সাহিত্যরচনা ও অভিনয় দুই কাজ একত্রিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ "বনের কুকুর ও ঘরের কুকুর" বা "মৃন্ময় কলসী ও পিতলের কলসী"র গল্প নেওয়া যেতে পারে। প্রথমে শিশু গল্পটি পাঠ্যপুস্তকে পড়লো। পুনরালোচনার সময়ে শিক্ষক প্রশ্ন করে' শিশুদের কাছ থেকে তাদের ভাষায় কথোপকথনটি বলিয়ে নিয়ে নাট্যাকারে বোর্ডে লিখে দিতে পারেন। তারপর পাত্রনির্বাচন। দুই শিশুকে অভিনয় করার ভার দেওয়া হ'ল, অন্যেরা শুনবে ও পরে সমালোচনা করবে। প্রথম অভিনয় হয়ে গেলে বোর্ড মুছে দিয়ে অপর

়টি শিশুকে পুনরভিনয় করানো যেতে পারে। এতক্ষণে কথাগুলি াদের এত অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে বোর্ডে লেখা না থাকলেও তারা নুরূপ ভাষায় কথা বলতে পারবে। শিক্ষক কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মূল বষয়ানুযায়ী মৌলিক প্রচেষ্টাকে বেশি উৎসাহ দেবেন। শেষে অভিনয় ও সমালোচনার সাহায্যে নাটকের অভ্যাস ও উৎকর্ষ সাধিত হ'লে শশুরা খাতায় লিখতে পারে।

শ্রেণিতে এবং বিদ্যালয়ের উৎসবাদি উপলক্ষ্যে ছোট ছোট কবিতার ভিনয় সুন্দর হয়। "কোথা থেকে আসছ তুমি ছোট্ট মানুষটি" বা ছোটখাট কৃষক আমি" প্রভৃতি নাট্যাকারে রচিত কবিতা সাজপোষাক নয়ে অভিনয় করানো যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতার অভিনয় করানো যায় তবে তার থা অন্যরূপ। এগুলির রূপায়ণে আবৃত্তি ও অভিনয়ের সংমিশ্রণ টে। উদাহরণস্বরূপ "নগরলক্ষ্মী" কবিতার অভিনয় করতে হ'লে দ্ধদেব, সুপ্রিয়া ও বিভিন্ন নাগরিকদের অংশগুলি বিভিন্ন ছাত্রকে নিতে বে আর সাধারণ অংশগুলি (যেগুলি কারো উক্তি নয়) পড়বার জন্য কদল বালককে পৃথক করতে হবে। এই বালকের দল সাধারণ ংশগুলি সমস্বরে পড়তে থাকবে এবং ব্যক্তিবিশেষের উক্তিস্থলে থামবে, খন যার যে উক্তি সেই সেই অনুসারে তারা বলবে। উচ্চশ্রেণির াত্রেরা পরিপূর্ণ গ্রন্থ বা উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করে' অভিনয় রতে পারে, যথা, শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি", "রামের সুমতি" বা ইংরেজি তপাঠ্য "শিবাজি।"

বিভিন্ন বিষয়ের অনুবন্ধের দ্বারাও অভিনয় হতে পারে। ইতিহাস া ভূগোল ও সাহিত্যের সফল অনুবন্ধ হয়। হয়তো শ্রেণিতে বুদ্ধদেবের বষয়ে পড়ানো হচ্ছে তখন সাহিত্যের শিক্ষক বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে গল্প ও বিতা পড়াবেন, যাদুঘরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধযুগসম্বন্ধীয়

দ্রষ্টব্যবস্তু দেখাবেন, তারপর ছাত্রেরা ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সাহিত্যিক পরিবেশকে মিলিত করে' নাটিকা রচনা করে' অভিনয় করবে। ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে নাটকীয় উপাদানের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে তার রূপায়ণে সাহিত্যানুভবের সংগে জাতীয় চরিত্র গঠিত হবে। বিচিত্র দেশ ভারতের ভৌগোলিক সৌন্দর্য ও জাতিসমুচ্চয়ও এইভাবেই নাটকের বিষয়বস্তু জোগাবে।

ছোটবড কোনো ছাত্রই শ্রেণিকক্ষের মধ্যে অভিনয় করে' সন্তুষ্ট থাকবেনা, সাজপোষাক পরে' দর্শকের সামনে অভিনয় করতে চাইবে। শ্রেণির কাজের মধ্যে নাটকের রচনা ও অভ্যাস হ'লে পর কোনো ছুটির দিনে পাবপূর্ণ অভিনয়ের সুযোগ পেলে তারা আনন্দিত হবে। কোনো বৃহত্তর উৎসবের দিনে প্রত্যেক শ্রেণিকে তার শ্রেষ্ঠতম অবদানকে রূপায়িত করতে বলা যেতে পারে। বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অভিনয়েও ছাত্রেরা সাফল্য অর্জন করবে।

মনোবিকাশের দিক দিয়ে অভিনয়াত্মক কার্যকলাপ অত্যন্ত মূল্যবান অচেতন অনুকরণই শিশুর প্রথম অভিনয়। বড়রা যা করে তার পুনরাবৃত্তি করে' শিশু জাগতিক জীবনে অভ্যস্ত হয় বলে' অভিনয়ে তার অদম্য পিপাসা। দুইতিন থেকে পাঁচছয় বছরের শিশুর জীবনই নাটক এবং এই নাটকে সে নিজেই নাট্যকার, নায়ক ও দর্শক। এই নাটক তার আত্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ, "আমি কে?" এই প্রশ্নের উত্তরসন্ধান এরপর পাঁচছয় থেকে দশবারো বছরে নিজের সংগেসংগে সমাজের পরিচয়—মাতাপিতা, শিক্ষকগুরুজন, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব এদের চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাটকের চরিত্রাবলির আচরণের মধ্যে দিয়ে। এই বয়সের স্বরচিত নাটকের চরিত্রগুলি যে-কোনো দেশ কালপরিবেশে বিচরণ করুকনা কেন তাদের মধ্যে আশপাশের চেনা পরিচিত মানুষগুলিরই প্রতিফলন দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের শ্রে

নাটকের রূপায়ণে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের চারিত্রিক, মানসিক, ভাবগত, নানা সমস্যার সমাধান এবং ব্যক্তিসত্তার মুক্তি পায়।

গল্পবলা মৌখিক কাজের একটি প্রধান অংগ। শিশুর প্রথম কথা পূর্ণবাক্যরূপ ধারণ করে না, শব্দ তখন তার প্রধান উপজীব্য, তারপর সে ধীরে ধীরে বাক্যভংগি আয়ত্ত করে। যখন সে বিদ্যালয়ে আসে তখনও তার দু'এক কথায় কাজ সারবার ইচ্ছা প্রবল থাকে, তাই প্রথম প্রথম শিক্ষক গল্প বলবেন, শিশু শুনবে, ক্রমশ শিশুও গল্প বলবে। শিক্ষক তাকে বাক্যগঠন ও বাক্যসজ্জা রচনা করতে শেখাবেন। ছবি দেখিয়ে গল্প বলানো এর ভাল উপায়। যেমন, একটা ছবি দেখানো হল যাতে একটি ছোট মেয়ে আধখানা জিলিপি হাতে নিয়ে পুতুল কোলে করে' দাঁড়িয়ে আছে। ছবির বর্ণনা নীরস কাজ, কিন্তু গল্প বলা আনন্দজনক।

যা চোখে দেখা যাচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি হবে এইরকম—"একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে আধখানা জিলিপি আছে। তার কোলে একটা পুতুল আছে। পুতুলের জামা নীল। মেয়েটির শাড়ি লাল।"

তৎপরিবর্তে শিক্ষক যদি নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তার কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করতে পারেন তবে বিবরণটি সরস গল্পে পরিণত হবে। যথা,—

মেয়েটির নাম কি? ওকে পুতুলটা কে দিয়েছে? পুতুলের নাম কি? ও জিলিপি নিয়ে কি করছে? শুধু একাএকা খাচ্ছে কি? জিলিপি ওর কেমন লেগেছে?

এর থেকে প্রশ্নোত্তরসহায়ে এইরকম গল্প দাঁড়াতে পারে—"বীণা লক্ষ্মী হয়ে পড়াশুনো করেছিল বলে' তার মা তাকে একটা পুতুল দিলেন। সে পুতুলের নাম দিয়েছে সোনা। বীণা আর সোনা দু'জনেই জিলিপি খেতে ভালবাসে। তারা প্রায় জিলিপি খায়।"

গল্পটি বড়দের কাছে তত চিত্তাকর্ষক না হ'লেও ছোটরা এতেই আনন্দ পাবে। একটি মেয়ে বাঘ আর ঘোড়ার কথোপকথন নিয়ে এই গল্পটি বলেছিল—"বাঘ রাস্তার ধারে বসে আছে, এমন সময়ে ঘোড এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলো "বাঘ, তুমি আমার কাঁচি নিয়েছ ?"—বা বল্ল—"না, আমি তোমার কাঁচি নিইনি—" ঘোড়া তখন রাগ করে বল্ল —"তুমি কিচ্ছু জাননা, খালি বসে' বসে' খাও আর ঘুমোও"—।

এইভাবে প্রথমে চিত্র ও চিত্রপরম্পরা অবলম্বন করে' গল্প লিখে পরে ছবির অবলম্বন ছাড়া শিশু নিজের খেলার বিষয়ে, ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতার বিষয়ে অথবা সম্পূর্ণ কল্পিত বস্তু নিয়ে গল্প রচনা করতে পারবে। শিক্ষকের কাছে শোনা এবং বইয়ে পড়া গল্পের পুনরাবৃত্তি করেও তারা আনন্দ পাবে।

গল্প বলার সময়ে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমত ছোট ছেলেপিলেকে যেন লম্বা গল্প বলতে না দেওয়া হয়। লম্বা বক্তৃতায় বড়দেরও অনেক সময়ে খেই হারিয়ে যায়, ছোটদের তাই দিয়ে অনাবশ্যক বিড়ম্বিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। নিচের ক্লাসের গল্পগুলি খু সংক্ষিপ্ত হওয়া ভাল ; প্রথম প্রথম কয়েকটি মাত্র বাক্যই যথেষ্ট, কেননা পারম্পর্য রক্ষা করে' তার বেশি ধারণা করার সামর্থ্য শিশুর থাকেনা তাছাড়া একজন অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিলে শ্রেণির অন্যান্য ছাত্রদের ধৈর্য চ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা। এইজন্য লম্বা গল্প হ'লে শিক্ষক সেটি বলার কাজ শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন।

দ্বিতীয়ত ছাত্র যখন গল্প শুনে বা পড়ে' গল্প বলবে তখন শিক্ষক যেন তাকে সেটি সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাষায় বলতে বাধ্য না করেন শিক্ষকের ভাষা বা বইয়ের শব্দ ব্যবহার করে' ফেলা তার পক্ষে স্বাভাবিক, সেটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলে গল্পের খেই হারিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাছাড়া বইয়ের ভাষা সহজভাবে আত্মসাৎ করতে

পারলে ভাল ছাড়া মন্দ হওয়ার কথা নয়। শিশু যদি বৃষ্টির সময়ে বলে —"টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ছে"—বা চিড়িয়াখানার বাঘ দেখে বলে - "ওর গায়ে কালো কালো দাগ" তখন বুঝব যে ছড়ার বাক্য তার মুখে এসে তার প্রকাশভংগিকে সমৃদ্ধ করছে। শিক্ষককে শুধু এইটুকু দেখতে হবে য ছাত্র যেন অর্থটা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে আর ভাষাটা চেষ্টা করে' মুখস্থ না করে।

কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজ অবলম্বনে আলাপ-আলোচনার দ্বারা সপ্রতিভভাবে কথাবলাব অভ্যাস হয়। প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনে, কর্মপদ্ধতির নির্ধারণে, কর্মফলের মূল্যায়ণে, বিষয়বস্তুর সংগ্রহ ও সংকলনে শিক্ষকছাত্র ও ছাত্রদের পারস্পরিক আলোচনার সময়ে বিষয় ও মতের প্রকাশ, ভাববিনিময়, সহযোগিতামূলক আলাপ, পরমত-সহিষ্ণুতা প্রভৃতির ভিত্তিতে কথাবার্তার অভ্যাস হয়। তথ্যসংগ্রহের সময়ে প্রশ্ন করার নৈপুণ্য বিবর্তিত হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানসন্দর্শনে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে কথাবলায় কি কি জানতে চাওয়ার প্রয়োজন, আগে থেকে তার তালিকা করে' নিয়ে যথাযথভাবে, ভদ্রোচিত ব্যবহারের দ্বারা উত্তরগুলি সংগ্রহ করা এই অভ্যাসের বিষয়ীভূত। তাছাড়া শ্রেণির সামনে গৃহীত পরিকল্পনা ও কৃত কাজের বিবরণী দিয়ে ছাত্ররা ছোটখাট বক্তৃতা দিতে শেখে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণিতে দিনের প্রথম কাজ হয় "খবর বলা"। এতে আগ্রহজনক ঘটনাগুলি উৎসাহের সংগে বলা হয় এবং অনেক সময়ে দেয়ালপত্রীর মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়।

বিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রকাশন ব্যবস্থা ও বিভিন্ন বিষয়ক সমিতির প্রচলন থাকলে বিভিন্ন কাজের সম্পর্কিত আলোচনা, পরিচালনা, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ, ঘোষণা, ভাষণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রভূতভাবে কথাবলার অভ্যাস হয়।

তর্ক এবং আলোচনা মৌখিক কাজের রূপভেদ। অতি অল্পবয়সে যুক্তিতর্কের ক্ষমতার ভাল বিকাশ হয়না বলে' অনেকে এই অভ্যাসকে নিচের শ্রেণিতে প্রযোজ্য বলে' মনে করেননা। কিন্তু নিচের শ্রেণি শিশুরা যখন অন্যের ভাষা, উচ্চারণ বা কথাবলার ভুল ধরে' দেয় কিংবা কোনো ছবি বা গল্পের উৎকর্ষাপকর্ষের সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করে তখনই তারা সেই বৃত্তির পরিচয় দেয়। কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর পারস্পরিক সহযোগিতায় নানারূপ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে' অতি অল্প বয়সেই আলাপ আলোচনার ক্ষমতা বিকশিত করে। যে-সব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে মন্ত্রিনির্বাচন, শ্রেণিশৃংখলারক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুদে আলোচনার অভ্যাস হয়। তারপর নিম্নমধ্য শ্রেণিগুলিতে ও প্রক্রিয়ার রীতিমতো প্রয়োগ করাতে ও উচ্চশ্রেণিতে আলোচনা তর্কসভার ব্যবস্থা হ'তে পারে।

বিদ্যালয়ে আলোচনা বা তর্কসভার অনুষ্ঠান করতে হ'লে প্রবন্ধ রচনার মতোই যত্ন নেওয়ার দরকার। প্রবন্ধ লেখাবার আগে যেম বিষয়বস্তুটি নানা ভাবে, সবদিক থেকে আলোচনা করা হয়, আলোচনা ও তর্কের আগেও তেমনি করা চাই। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হ'লে পর শিক্ষক ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পাঠাগা থেকে বই বা বইয়ের অংশ পড়ে' জ্ঞানবৃদ্ধি করার নির্দেশ দেবেন আলোচনা বা তর্কসভার দিন যাতে পূর্বনির্ধারিত বক্তা ভিন্ন শ্রেণির অ সকলেও আলোচনায় যোগ দেয় সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন।

ক্লাসের পাঠের মধ্যে কোনো সমস্যাপূর্ণ বিষয় থাকলে সেটিকে অবলম্বন করে' তর্ক বা আলোচনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ গ্রাম্য জীবনের বর্ণনামূলক কবিতা বা প্রবন্ধপাঠের পর গ্রাম্য ও নাগরি জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে তর্ক এবং ওয়াজেদ আলি

"ভারতের বৈশিষ্ট্য" পাঠের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনামূলক আলোচনা সফল হয়। বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা বা তর্ক করাতে হ'লে বিষয়টি যেন চিত্তাকর্ষক এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সংগে কোনোভাবে জড়িত হয়।

তর্ক ও আলোচনার মধ্যে পদ্ধতিগত প্রভেদ আছে। তর্কের জন্য দুটি প্রধান ও দুটি অপ্রধান বক্তা নির্দেশ করে' দিতে হয়, তাদের বলা হয়ে গেলে অন্যেরা যোগ দেবার অধিকার পায়। আলোচনায় একজন বিষয়ের উত্থাপনকর্তা ও কয়েকজন প্রধান বক্তা নির্দিষ্ট থাকে। তর্কে বিষয়ের দুইদিক দেখাতে হয়, কিন্তু আলোচনায় নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তর্কে বক্তাদের দুইপক্ষের একটিকে অবলম্বন করতে হয়, আলোচনায় নিরপেক্ষ বক্তৃতার স্থান আছে। তর্কের নিয়ম আইনসভার নিয়মের অনুসারী, আলোচনার তেমন কড়া নিয়ম নেই।

উদারতা ও নিরপেক্ষতার দিক দিয়ে তর্কের চেয়ে আলোচনা বেশি বাঞ্ছনীয়; অপরপক্ষে তর্কে নিয়মানুযায়ী কাজ করার পদ্ধতির (formal procedure) অভ্যাস হয়। বস্তুত দুইই সমানভাবে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের উপযোগী।

এইভাবে নানা বিশিষ্ট মৌখিক কাজ ও ক্লাসের সাধারণ পাঠের মধ্যে কথাবলার অভ্যাস হয়। এইজন্য প্রশ্নবহুল এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির এত আদর। ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে—"Little children should be seen and not heard", কোনো শিক্ষাবিদ এটিকে পরিবর্তিত করে' বলেছিলেন "The class teacher should be seen and not heard",—অতদূর অগ্রসর না হয়েও বলা যায় যে নিজে কম কথা বলে' ছাত্রদের কাছ থেকে বেশি আদায় করতে পারাতেই শিক্ষকতার কৃতিত্ব।

পাঠ ও পাঠ্য

আলোচনার সুবিধার জন্য পড়া এবং লেখা এই দুই কাজের বিষয় পৃথক পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ হ'ল, কিন্তু শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে কাজ দুটি অংগাংগিভাবে জড়িত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একসংগে পরিচালিত হয়। আরো মনে রাখতে হবে যে আধুনিকতম পদ্ধতিসমূহে পড়তে শেখার আগে লেখার যন্ত্রগুলি শিশুর হাতে দেওয়া হয়, অক্ষরকে অক্ষর বলে' চিনতে শেখার আগে সে তার আকৃতির সংগে পরিচিত হয় এবং সেই আকৃতি তার চিত্রাংকনপ্রচেষ্টার মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে। এই স্তরের লেখা সচেতনভাবে লেখার পর্যায়ে পড়েনা বলে' শিক্ষকতার জন্য লেখার সামান্য আগে পড়াকে স্থাপিত করা যায়। তাছাড়া পড়ার চেয়ে লেখার কাজ জটিল, কেননা পড়ার মধ্যে চোখের কাজ আর লেখায় চোখ আর হাতকে একযোগে কাজ করতে হয়।

আগেকার দিনের মত বর্ণপরিচয় ও অক্ষর মুখস্থকরার পথে পড়তে শেখার বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি এখন অচল, এখন সমগ্র বাক্য এবং শব্দ নিয়ে বাক্যানুক্রমিক ও শব্দানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিশুর পড়া আরম্ভ হয়। এর কারণ, প্রথমত, প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে আনন্দের স্থান ছিলনা, মেরে ধরে' অক্ষর মুখস্থ করানোর মধ্যে যে ধরণের নীরস মজুরি আছে সেটা শিশুস্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। পড়তে দুষ্টুমি করা বা অনিচ্ছাপ্রকাশ এই পদ্ধতির ব্যবহারের ফল। শিশু যাতে আনন্দ পায় সেই কাজ করতে চায়, পড়তে শেখায় সে যদি প্রচুর আনন্দ পায় তবে সে মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং তার শিক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বর্ণের সূক্ষ্ম কারিগরি শিশুর অনভ্যস্ত চোখে

ধরা পড়া অসম্ভব বলে' বাক্য ও শব্দের সমগ্র রূপই তার পক্ষে চেনা সহজ হয়।

এই কারণে শিক্ষার পদ্ধতিও এখন বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। কাজ বা খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করলে শিশুর নিজের ক্রিয়াকলাপই তার মনে পড়ার সহজ তাগিদের সৃষ্টি করে। যথা, ডাকঘর বা দোকানের খেলায়, কিংবা বাগানের কাজের হিসাবে, যে শিশু পড়তে জানে তার সুবিধা দেখে আর সকলেও পড়া শিখতে চায়। তাছাড়া বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্যসূচিতে পড়াশোনার আরো নানা প্রয়োজন সৃষ্টি করা যায়। যেমন, প্রত্যেক শিশুর বসার ও জিনিষপত্র রাখার জায়গায় নাম লেখা থাকলে সে নিজের নাম পড়তে শিখবে। তারপর, প্রত্যেকদিন শ্রেণিতে মাস, বার, তারিখ টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকলে, সেই কাজের পালা পাবার লোভে শিশু সেগুলি পড়তে শিখবে।

তাছাড়া ছবি ও জিনিসের সাহায্যে পড়তে শেখান যায়। শিশু যা ভালবাসে সেইসব জিনিষ বা তার ছবি দেখিয়ে তার সংগে স্পষ্ট করে' লেখা তার নাম দেখাতে হয়: এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির পর শিশু নামলেখা কার্ড দেখেই লিখিতশব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই পদ্ধতি অভ্যাসের (conditioning) ভিত্তিতে স্থাপিত। এর ব্যবহারের জন্য শিক্ষক উজ্জ্বল, সুন্দর জিনিষ ও ছবি সংগ্রহ করে' রাখবেন এবং সেগুলির নামলেখা মজবুত কার্ড তৈরি করবেন। পড়তে শেখা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য জিনিষ ও ছবি আলাদা গোছায় রেখে মিলিয়ে দিতে বলা যায়। তাতে খেলা আর পড়া একসংগে হয়।

বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিশু সমগ্র বাক্য নিয়ে পড়তে শিখবে। ক্লাসের নির্দিষ্টস্থানে স্পষ্ট অক্ষরে নানা বিজ্ঞপ্তি লিখে টাঙিয়ে রাখলে সেগুলি বুঝবার জন্য পড়তে শেখার উৎসাহ হবে। যেমন বাজে কাগজের ঝুড়ির কাছে লিখে রাখা যায়—"এখানে বাজে কাগজ ফেল"

—দরজার গায়ে লেখা যায়—"দরজা বন্ধ কর"—ইত্যাদি। নিচু ক্লাসে ছবি ও লেখা মিলিয়ে নোটিস দেওয়ার পদ্ধতি ভাল, যেমন, কোনো খেলার নোটিসে সেই খেলার ছবি দেওয়া যায়, যদি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার থাকে তবে ভোজের ছবি দেওয়া যায়। ক্রমশ শিশু ছবির সাহায্য ছাড়াই নোটিসের অর্থ বুঝতে শিখবে।

পড়তে শেখার জন্য **"sight cards"** এরও ব্যবহার করা যায়। লম্বা কার্ডবোর্ডের টুকরোয় কাজের বর্ণনা বা হুকুম লেখা থাকে, শিশুদের সামনে সেগুলি একে একে তুলে ধরলে তারা সেই অনুসারে কাজ করে। যেমন, কার্ডে যদি—"আমরা এমনি করে' ঘোড়ায় চড়ি" —"আমরা এমনি করে' নৌকো চালাই"—ইত্যাদি কাজের উল্লেখ থাকে তবে শিশুরা সেগুলি দেখে তার অভিনয় করে। কার্ডে যদি— "উঠে দাঁড়াও"—"বোসো"—"দরজা খোলো"—"দরজা বন্ধ কর"— প্রভৃতি নির্দেশ লেখা থাকে তবে তারা তা পালন করে। কার্ডে যদি প্রশ্ন লেখা থাকে তো শিশু মুখে তার উত্তর দেয়। এতে খেলা ও পড়ার সংগে অভিনয়ের আনন্দ মিলে যায়। কার্ডগুলিকে দুই অংশে ভাগ করে' মিলিয়ে নিতে বলে' শিক্ষার পরীক্ষা করা যায়। এইভাবে শব্দ ও বাক্যানুক্রমিক দুই পদ্ধতির মিশ্রণ পড়তে শেখানো ভালো।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সময়ে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে সাবধানতা অবলম্বন না করলে অনুকরণের অভ্যাস হ'তে পারে। বুদ্ধিমান শিশুরা অর্থ বুঝে কাজ করে কিন্তু অন্যেরা তাদের দিকে চেয়ে অনুকরণ করে' পার পেতে চায়।

বাংলাভাষায় ফলা ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহারকে অনেকে স্বাভাবিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগের অন্তরায়স্বরূপ মনে করেন। যুক্তাক্ষরবর্জিত শিশুসাহিত্যরচনার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু তার অসুবিধা এই যে শিশুর পরিচিত, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত যে-সব বস্তু, মানুষ ও ভাব এ

দ্ধতির ভিত্তি সে-সবের যুক্তাক্ষরবর্জিত নাম খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে ব্যবহৃত যুক্তাক্ষরসমন্বিত শব্দই শিশুর ক্ষে বেশি সহজ হয়। এ বিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করাই ভাল, অর্থাৎ যুক্তাক্ষর এড়িয়ে চলা হবে, কিন্তু ভাষা ও ভাবের অস্বাভাবিকতা সম্পাদন করে' সেগুলিকে বর্জন করা হবেনা। এইরূপ নির্বাচন ও সংমিশ্রণের চমৎকার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের "সহজপাঠ"। বস্তুত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি ব্যবহার না করলে যুক্তাক্ষরের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়।

শিশু যেমন একদিকে বিবিধ কার্যিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা ভাষাযন্ত্র আয়ত্ত করবে, অন্যদিকে তেমনি সংগে সংগে সাহিত্যচর্চাও লবে। কোনো কোনো আধুনিক শিক্ষাবিদ বলেন যে শিশুর সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রসবোধের বিকাশ বিনা মনোগঠন ও ভাবসমৃদ্ধিসাধন সম্ভবপর হয়না বলে' শিশুকে প্রথম থেকে সাহিত্যের সম্মুখীন করতে হবে। ছড়া ও গল্প শিশুর প্রথম সাহিত্য। পড়তে শখার আগে গল্প শোনা ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে এগুলির সংগে পরিচয় সাধিত হয়। পড়ার কিছু অভ্যাস হ'লে উজ্জ্বল ছবি ও বড় বড় হরফ-ওয়ালা ছোট ছোট বই পড়তে দিতে হয়। শিক্ষক যদি বড় বড় ছবি এঁকে তার নিচে দুই-এক ছত্র করে' কবিতা বা গল্প লিখে দেয়ালপত্রের মতো টাঙিয়ে রাখেন তবে সেগুলি সব সময়ে শিশুদের সামনে থেকে প্রভাব বিস্তার করবে।

অপেক্ষাকৃত অগ্রসরশীল ছেলেরা লিখবার অভ্যাস করতে যে-সব বি ও গল্পের বই তৈরি করে সেই বই এদের পড়তে দিলে ছবি ও গল্প মলিয়ে পড়া আনন্দজনক হবে। তাছাড়া এরোপ্লেন, মোটর, রেলগাড়ি, পাখি, ফুলফল, জীবজন্তু প্রভৃতির বিষয়ের ছবির বই থেকে শিশুরা যে-যার রুচি অনুযায়ী পড়ার খোরাক সংগ্রহ করবে। এগুলি

রাখার নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে, শিশুরা ইচ্ছামতো নিয়ে, পড়ে' আবার তুলে রেখে দেবে। শিশুশ্রেণি আর বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পৃথক বইয়ের আলমারি থাকলে শিশুরা নিজেরাই ওই গ্রন্থাগারের পরিচালনা করবে এবং স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করে' আনন্দ লাভ করবে। ছাপা বই কেনবার সময়ে এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিশুরা শিক্ষকের সামান্য সাহায্যেই সেগুলি পড়তে ও বুঝতে পারে।

ব্যাবহারিক ভাষাশিক্ষা ও স্বাধীন সাহিত্যপাঠ মিলিয়ে "পুস্তকহীন' শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে। এতে শিশুশ্রেণি এবং বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বাংলার পাঠ্যপুস্তক থাকেনা, বহুকথন ও ভূয়োলিখনের দ্বারা কার্যক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত হয় আর ছোট গ্রন্থশালায় বহুপঠনে জ্ঞান আহরণ ও রসোপভোগ হয়।

তৃতীয় শ্রেণির আগে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু নিতান্তই কোনো বই নির্দিষ্ট করতে হ'লে প্রচ্ছদপট, ছবি, ছাপা বাঁধাইয়ের সংগে বিষরবস্তুর উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখে নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষক যদি একটি বইয়ে আবদ্ধ না থেকে, বিভিন্ন বইয়ের শ্রেষ্ঠ উপাদান সঞ্চয় করে' "পুস্তকহীন" প্রণালিতে শিক্ষা দেন তবে ব্যাবহারিক ও সাহিত্যিক শিক্ষার মধ্যে কিছুটা সমন্বয় সাধিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণি থেকে ছাত্র পাঠ্যপুস্তকের ধরাবাঁধা পাঠের অধীন হয়। বাংলা পড়ার বইয়ে কবিতা ও গল্প ছাড়া নানাপ্রকার জ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলিত হয়। সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার উপযোগী ভাষাজ্ঞান ও শব্দসম্ভার আয়ত্ত করে' মাতৃ ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষালাভের সুবিধা হয়।

তাছাড়া এতে অন্যান্য শ্রেণির পাঠের সংগে বাংলা পড়ার অনুবন্ধ স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ে সাধারণত যেসব পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয় তা

মধ্যে এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। 'কিশলয়ে' এমন কতকগুলি পাঠ আছে যার সংগে পরিবেশপরিচিতি, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা, প্রকৃতিপাঠ প্রভৃতির অনুবন্ধ হয়। অন্য বইয়ে "দার্জিলিং" প্রবন্ধ পড়ানোর সময়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থানের বিষয়ে বলা যায়; ঋতুবর্ণন পাঠ্য হ'লে প্রকৃতিপাঠের সংগে যুক্ত করা যায়; 'বিমানপোত' প্রবন্ধ অবলম্বন করে' আকাশযানের উন্নতি ও পরিণতির আলোচনা হয়; 'সেকেন্দ্রা' কবিতায় ইতিহাস ও ভূগোলের মিলনের সুযোগ পাওয়া যায়।

তথাচ সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় ছাত্রকে বাংলা সাহিত্যের সংগে পরিচিত করে' দেওয়া সাহিত্যপাঠের মূল উদ্দেশ্য। সুখের বিষয় আধুনিক সাহিত্যসংকলনগুলিতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যাংশের উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মাতৃভাষার সাহিত্যের সেটুকু পরিচয় যথেষ্ট নয়। বাংলার শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে বইখানা পাঠের পথনির্দেশকমাত্র এবং বইকে দ্বারস্বরূপ গ্রহণ করে' বিরাট সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশই শিক্ষকতার আসল লক্ষ্য। আজকের ছাত্রেরা যে পড়া করে তার সংক্ষিপ্তসার খোঁজে নোটবইয়ে, কিন্তু তাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করতে হবে যে পাঠ্যপুস্তকই তাদের নোট বা সংক্ষিপ্তসার, আসল পড়ার বিস্তার তার চেয়ে অনেক বেশি।

পাঠ্যপুস্তকনির্বাচনের সময়ে তার চিত্তাকর্ষকতা ও সরসতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক শিক্ষক পড়ার বইয়ের চিত্তাকর্ষক হওয়া পছন্দ করেননা, কেননা, তাহ'লে ছাত্রেরা আগেই বইটি শেষ করে' রাখবে, তাঁর পড়াবার কিছু থাকবেনা, তারা ক্লাসে মনোযোগ দেবেনা। এই যুক্তি ঠিক নয়, কারণ যে বই পড়তে ভাল লাগে সে বই দু'বার কেন, দশবার পড়বারও আগ্রহ থাকে। তাছাড়া শিক্ষকতার ওপরও ছাত্রের মনোযোগ অনেকাংশে নির্ভর করে; শিক্ষক যদি ক্লাসের

পড়াকে ব্যাখ্যা ও শব্দার্থের সংকীর্ণ পথে নিয়ে চলেন তবে বস্তু যতই নতুন হোকনা কেন ভালো লাগবেনা। অথচ বহু পরিচিত, পঠিত, পুরাতন বইকেও সাহিত্যালোচনার উদার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে' দিলে ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা আকর্ষণ করা যায়। কেবল ভালো লাগার প্রশ্ন নয়, সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক পরিণতির পক্ষে শুষ্ক, নীরস রচনা পড়ানো অবাঞ্ছনীয়।

সাহিত্যশিক্ষককে ব্যাখ্যা, শব্দার্থ, অলংকার বা ব্যাকরণের দীর্ঘ আলোচনা এড়িয়ে চলতে হবে। এই বিশ্লেষণ অনুভবের পরিপন্থী। অনেক শিক্ষক কবিতা পড়াবার সময়েও রসোপভোগের আগে কঠিন শব্দার্থের উল্লেখ না করে' থাকতে পারেন না। শব্দার্থশিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার্য, কিন্তু সাহিত্যপাঠের পক্ষে সে বাহ্য। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন এক্ষেত্রে তার প্রবেশ নিষেধ। অনেকে—"এ ছত্রে অমুক অর্থবোধক কি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?" বা—"অমুক শব্দের প্রতিশব্দ কি কি?" প্রভৃতি প্রশ্নের দ্বারা আভিধানিক বিচারকে খিড়কির দরজা দিয়ে পার করতে চান; কিন্তু সে-ও শব্দার্থভিত্তিক নীরসপাঠের ভেদ মাত্র। অনুরূপ কারণেই শিক্ষক পাঠের শেষে "সার মর্ম" লিখে বা শিখিয়ে সাহিত্য বোধের হানি করবেন না।

পাঠ্যপুস্তকের সংগে দ্রুতপাঠ পুস্তকের প্রচলন আছে; কিন্তু একটি-মাত্র অতিরিক্ত পুস্তকের দ্বারা দ্রুতপাঠের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারেনা। পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম একটি দ্রুতপাঠের বই দিয়ে ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি করে' শেষ পর্যন্ত তিনচারটি বই দিলে সাহিত্যাস্বাদের সহায়তা হবে।

এতে সিলেবাস বাড়বে নিশ্চয়, কিন্তু এই বইগুলোও যদি পাঠ্য-পুস্তকের মতো টীকাটিপ্পনি সহকারে সর্বনাশা পদ্ধতিতে পড়ানো না হয় তবে তাতে হানি ঘটবে না কিছু। বহুপঠনে অভ্যস্ত সাহিত্যরসগ্রাহী

ছাত্র বইয়ের বোঝা বইতে অপারগ হয় না, হয় তারা, যারা মুখস্থ-বিদ্যার ভারবাহী।

সাহিত্যপুস্তক পাঠের উদ্দেশ্যে তার বৈয়াকরণিক ও আভিধানিক বিশ্লেষণ নয়, সাধারণ অর্থবোধে রসোপলব্ধি করা। বড়রাও যে সব সময়ে সব বইয়ের প্রত্যেকটি অর্থ খুঁটিয়ে বুঝতে পারেন এমন ধারণা যুক্তিসংগত নয়। অথচ তাতে সমগ্র বইয়ের উপভোগের বাধা ঘটেনা। বিদ্যালয়ের সাহিত্যপাঠকে সেই পথে চালিত করতে হবে। ছাত্রেরা পড়বে, অর্থবোধের অসুবিধা হ'লে শিক্ষক সাহায্য করবেন। ছাত্র সব সময়ে নিজের অসুবিধা বুঝতে পারেনা, নিপুণ শিক্ষক প্রশ্নের দ্বারা তার বোধের পরিমাপ করে' উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। পাঠ্যারম্ভের পূর্বেও বিষয়বস্তুর কিছু সংকেত দিয়ে দিলে অর্থবোধের সুবিধা হয়।

সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা কঠিন কাজ। আলোচনার সাহায্যে এই বোধ মার্জিত করতে হয়, কিন্তু বোধের তারতম্যানুযায়ী আলোচনা ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ভট ফলদান করে। একবার একটি ছোট মেয়েকে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' পড়ে' হাসতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়েছিল, "কি অদ্ভুত সব গালাগালি রয়েছে!" এরকম সংকট-ময় পরিস্থিতিতে শিক্ষককে বহুবার পড়াতে হবে এবং ধৈর্যের সংগে সেগুলি অতিক্রম করতে হবে। অপরপক্ষে রসগ্রাহী ছাত্রছাত্রীর সহৃদয় সাহিত্যবোধ তাঁকে পুরস্কৃত করবে।

দ্রুতপাঠের বইয়ের নির্বাচনের সময়ে তাঁকে দেখতে হবে যে ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে সেটি যেন সহজ হয়, কেননা কঠিন ভাষা ও ভাবের বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যাপৃত হ'লে দ্রুতপাঠের মূল উদ্দেশ্য পরাজিত হবে।

বইয়ের বিষয়নির্বাচনে মনোবিকাশের স্তর, রুচি ও সাহিত্যবোধ এই তিনদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বইগুলি যেন ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির

উপযোগী, চিত্তাকর্ষক ও সাহিত্যিক মূল্যসমন্বিত হয়। বালক কিশোরদের বইয়ে উদ্যম চাই, কাহিনীর দ্রুততা চাই, কৌতূহ ও প্রাণশক্তির খোরাক চাই। উজ্জ্বল বর্ণনাসমন্বিত আবিষ্কা সাহসিকতা বা ঐতিহাসিক কাহিনী এদের ভালো লাগে। আজকা অনেক সাধারণ জ্ঞানের বই, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী, বংকিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের বালোপযোগী সংস্কর বেরিয়েছে, দ্রুতপাঠ পুস্তকের নির্বাচনের অসুবিধা নেই। এগুলি মধ্যে থেকে বেছে বেছে নিচু থেকে ওপরের শ্রেণি পর্যন্ত এমনভা সাহিত্যচয়ন করে' দিতে হবে যে বিদ্যালয়ের পাঠসমাপ্তির মে ছাত্রেরা বাংলার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার প্রত্য পরিচয় লাভ করতে পারে।

সর্বশেষ কথা এই যে উচ্চতম শ্রেণিতে সাহিত্যবোধ সম্পূর্ণ কর হ'লে সাহিত্যের ইতিহাসের সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার দরকার। স্কু ফাইনাল পরীক্ষার বাংলা পাঠসংকলনের অংশগুলি ইতিহাসে ধারানুযায়ী সজ্জিত আছে; সেগুলিকে সংযুক্ত করে' সরস ও সুন ঐতিহাসিক বিবরণপাঠের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তাছাড়া বর্তমা বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সাহিত্যের ইতিহাস সন্নিবিষ্ট হয়েছে অনেকের মতে এতে ছাত্রদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, কি বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষাপদ্ধতির সংকীর্ণতার ফলে তাদের সাহিত পরিচয় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে বলেই এরূপ ঘটে।

সাহিত্যপরিচয়ের মাধ্যমে সাহিত্যের ইতিহাসের শিক্ষা সাধ করতে হ'লে নিম্নমাধ্যমিক স্তর থেকে তার ভিত্তিস্থাপন করতে হবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে সুসাহিত্যের বহু অংশ সন্নি হয়, সেগুলির পাঠের সময় শ্রেণির মনোবিকাশ ও সাহিত্যজ্ঞানে উপযোগী মানে লেখক ও রচনার বিষয়ে আলোচনা করা যা

'ধারণত সাহিত্যের অংশগুলি সাহিত্যিকের কালের ধারাবাহিকতার কে দৃষ্টি রেখে পড়ানো হয়না বলে' এই আলোচনাগুলি লিখিয়ে লগাপাতার ফাইলে রাখা উচিত। ষষ্ঠশ্রেণিতে যাঁদের নিয়ে লোচনা হ'ল তাঁদের কথা সময়ানুযায়ী সাজিয়ে রেখে সপ্তম ও অষ্টম ণিতেও ওই ফাইলের পৃষ্ঠার ফাঁকে ফাঁকে নূতন আলোচিত ষয়গুলি কালানুসারে সাজিয়ে রাখা যায়। আগে যাঁদের নিয়ে 'লোচনা হ'য়েছে তাঁদের অন্যান্য রচনা পাঠ্য থাকলে পূর্বের সংগে াগ করে দেওয়া যায়। নবম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্তও এই য়মেই আরো উচ্চমানের সাহিত্যের ইতিহাস সংকলিত হ'তে পারে। ই সমস্ত আলোচনা মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্য স্বয়ংসঞ্চয়ন, ত্রকল্প, রূপকল্প প্রভৃতির সাহায্য নিতে হবে।

পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধি

পড়া দুইরকমের, চেঁচিয়ে উচ্চারণ করে' পড়া আর মনে মনে পড়া,—সরব ও নীরব পাঠ।

সরবপাঠ শিল্পবিশেষ ।যে ভালো করে' পড়তে পারে তার পা: শুনতে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ভালবাসেন। এই সুন্দর অভ্যা: শিশুকে ছোটবেলা থেকে করাতে হবে। বুদ্ধিমান শিশু যখন অ: বুঝে চেঁচিয়ে পড়বে তখন তার পাঠ এত পরিষ্কার হওয়া চাই যাতে ভাবের সূক্ষ্ম তারতম্য তার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করতে পারে এবং গদ্য ব পদ্যের তালে তালে তার স্বরের সংগীতের মতো মাধুর্যের সংগে ওঠানাম করা চাই। আদর্শপাঠের লক্ষণ এই তিনটি—প্রাঞ্জলতা, সহানুভূতি ও মাধুর্য। কবিতার ক্ষেত্রেই সরব পাঠের উপযোগিতা অধিক, কেনন বর্ণের পর বর্ণ, বাক্যের পর বাক্য সংযোজিত হ'য়ে যে সম্মিলিত ধ্বনি: সৃষ্টি হয় চেঁচিয়ে না পড়লে তার মাধুর্য উপভোগ করা কঠিন।

চেঁচিয়ে পড়ার প্রথম উদ্দেশ্য ভাষার অর্থ পরিষ্কার করে' ফুটিে তোলা এবং তারপর গদ্য বা পদ্যের ছন্দোমাধুর্য অনুভব করে' অপরকে করানো। এইজন্য পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর সময়ে সরবপাঠের উপযোগিত আছে। কবিতা পড়াবার সময়ে শিক্ষক আগে সমগ্র কবিতাটির (যদি কবিতাটি অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয়) আদর্শপাঠ দিয়ে রসঘন পরিবেশে সৃষ্টি করবেন আর গদ্যপাঠের সময়ে প্রত্যেক অনুচ্ছেদ ছাত্রেরা সরবে পড়ে' নেবে। শিক্ষকের পাঠ ও উচ্চারণের ভংগি উৎকৃষ্ট হওয়া চাই ভাষাশিক্ষকের পক্ষে ছন্দ এবং সমস্ত বিষয়ের শিক্ষকের পক্ষেই উচ্চার ও স্বরনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা আধুনিক শিক্ষণশিক্ষার অপরিহার্য অংশ হওয় উচিত।

শিক্ষকের উচ্চারণ এত স্পষ্ট এবং স্বর এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই যে কণ্ঠস্বরের কর্কশতা বা ভাবের বিকৃতি না ঘটিয়ে শ্রেণির শেষ পঙ্ক্তির ছাত্র পর্যন্ত তাঁর কথা যেন পৌঁছায়। এ কাজ কঠিন হ'লেও অভ্যাসসাপেক্ষ ও সম্ভবপর। স্পষ্ট উচ্চারণ ভাষায় শ্রাব্যতা বাড়িয়ে দেয়, আবার উন্নত ভংগি শব্দকে দূরে যেতে সাহায্য করে এবং কণ্ঠস্বরকে বিশেষ গ্রামে স্থাপিত করলে স্বরযন্ত্রের পীড়ন না করেও শ্রুতিমধুর ও দূরশ্রাব্য করে। বাংলাভাষার বাচনবিন্যাসসম্বন্ধে এদিক দিয়ে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট আলোচনা হয়নি বলে' শিক্ষকই বাঞ্ছনীয় বাচনভংগির দিকে দৃষ্টি রেখে, উপরিউক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিজের শিল্প সৃষ্টি করে' নেবেন। উপরন্তু বাংলার শিক্ষককে বিভিন্ন প্রকার ছন্দের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে ও তার অন্তর্নিহিত তালকে উচ্চারণে ফুটিয়ে তোলায় সমর্থ হ'তে হবে।

শিক্ষক ছাত্রদের ছোটবেলা থেকেই স্বরনিয়ন্ত্রণ ও স্পষ্ট, বিশুদ্ধ উচ্চারণের অভ্যাস করাবেন। উচ্চারণশুদ্ধি শিশুশ্রেণির সরবপাঠের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে গণ্য। ছোট শিশুরা যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তাদের মধ্যে অনেকেরই স্পষ্ট উচ্চারণ করার অভ্যাস থাকে না এবং অনেকে নানারকম উচ্চারণবিকৃতিও নিয়ে আসে। বয়সের অল্পতাজনিত অনভ্যাসের ফলে শিশুর উচ্চারণের যে সব দোষ থাকে সেগুলির সংশোধন শিক্ষকের আদর্শানুযায়ী আপনিই হয়ে যায়, কিন্তু অন্তর্নিহিত বিকৃতির সংশোধন কঠিন।

বিভিন্ন পরিবারের, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের পরিবার, সামাজিক পরিবেশ ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রকারের উচ্চারণবিকৃতি ঘটে থাকে। নিচে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নমুনা দেওয়া হ'ল—

—'শ' জায়গায় 'স'—যথা—"সিখিসহ সিখিনী-সুখিনী।"

—'শ' ও 'প' এর জায়গায় 'হ'এর উচ্চারণ, যথা—শালা = হালা,
পাটি = হাটি।

—'শ' ও 'স' এর জায়গায় 'ছ', যথা—ছামবাজার, মোছলমান।

—'র' ও 'ড়' এর বিপর্যয়, যথা—"ভগবান্ তুমি যুগে যুগে দূত
পাঠায়েছ বাড়ে বাড়ে
দয়াহীন সংসাড়ে"
অথবা, "তোমার বারি কোথায় ?"

—'র' ও 'অ' এর বিপর্যয়, যথা—"আমবাবু রাম খান"।

—'ল' ও 'ন' এর বিপর্যয়, যথা—নাউ, লৌকা ইত্যাদি।

—ঘোষবৎ বর্ণের জায়গায় অঘোষবর্ণের উচ্চারণ, যথা, মাজখানে (মাঝখানে), লাটি (লাঠি)। .

—ব্যঞ্জনবর্ণের অস্পষ্টতা, যথা—"হয়, হানতি পারনা", "পাইযে (পালিয়ে) যাব", "শ্যামবাইয়ার" ইত্যাদি।

উপরিউক্ত নানা কারণেই উচ্চারণ ছাড়া প্রকাশভংগিরও ভিন্নতা দেখা যায়। বাংলাভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণবিধির নির্ধারণের অভাবও উচ্চারণদোষের অন্যতম কারণ।

বালকবালিকার বদ অভ্যাস, শারীরিক গঠন ও উচ্চারণযন্ত্রের দোষ-জনিত উচ্চারণবিকৃতিও অনেক সময়ে ঘটে। যেমন তোৎলামি, নাকে কথা বলা, খুব জোরে নিশ্বাস নেওয়া, ক্রমাগত নাকটানা, টেনে সুর করে' কথা বলা, অর্ধোচ্চারিতভাবে অতিরিক্ত দ্রুত কথাবলা ইত্যাদি। সামান্য বধিরতা অথবা অমনোযোগিতার দরুণ শিশু যদি সম্পূর্ণ শব্দ ভাল করে' শুনতে না পায় তা হ'লেও উচ্চারণের ভুল ঘটে থাকে। উপরন্তু শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ প্রায় সর্বদাই ছাত্রে বর্তায়।

এরমধ্যে যেগুলি বদ অভ্যাস থেকে উদ্ভূত সেগুলি অপেক্ষাকৃত সহজে শোধরানো যায়। শারীরিক বিকৃতির জন্য বিশেষ চিকিৎসা এবং

ব্যবস্থার দরকার, সেগুলির আলোচনা প্রস্তুতের বহির্ভূত : কিন্তু তার ওপর শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই।

এই প্রসংগে এক বিদ্যালয়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একটি মেয়ের সরবপাঠের ও কথাবলার সময়ে প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণের সংগে সশব্দে নিঃশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস ছিল, তাতে তার পাঠ অবোধ্য হয়ে পড়তো। এই শ্রেণিতে এক শিক্ষকশিক্ষণমহা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পড়াতে এলেন। প্রথমদিন যে ছাত্রশিক্ষিকা পড়ালেন তিনি বালিকার পাঠের ধরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং সেই অবসরে ক্লাসের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকা ও অন্যান্য ছাত্রীরা তাঁকে জানিয়ে দিল যে ওই মেয়েটি তোৎলা এবং কোনদিন পড়া পারে না; ছাত্রশিক্ষিকা তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে বসতে বললেন ও সমস্ত ঘণ্টা তাকে সাবধানে এড়িয়ে চল্লেন। এতে শিক্ষণবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে দুটি দোষ ঘটলো; ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের পরামর্শে কোনো বিশেষ ছাত্রীসম্বন্ধে হীনতাজ্ঞাপক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রথম এবং একটি বালিকাকে পাঠের অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা দ্বিতীয় দোষ। কিন্তু তার ওপর যে অন্যায় ঘটলো সেটা অনেক গুরুতর, একটি বিকাশোন্মুখ মনের উন্মেষের পথে বাধা দেওয়া হ'ল।

দ্বিতীয়দিন ওই ক্লাসে অপর একটি ছাত্রশিক্ষিকা পড়াতে এলেন। সেই মেয়েটি পড়তে আরম্ভ করামাত্র আগের দিনের মতোই শিক্ষিকা ছাত্রীদের কলরব উঠলো, কিন্তু এই ছাত্রশিক্ষিকা মুহূর্তের মধ্যে গোলমাল থামিয়ে সহানুভূতির সংগে মেয়েটির পাঠবিকৃতি শোধরাতে উদ্যত হ'লেন এবং দু'একবারের চেষ্টাতেই তার পাঠের কিছু উন্নতি দেখা গেল। শিক্ষকতার সময়ে তিনি ওই মেয়েটিকে অন্য মেয়েদের সংগে প্রশ্নের সমান অংশ বণ্টন করে' দিলেন এবং সেও পরম উৎসাহে উত্তর দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। উপযুক্ত

শিক্ষিকার হাতে পড়লে এই মেয়েটি যে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারতো তাতে সন্দেহ নেই।

উচ্চারণশোধনের সময়ে শিক্ষকের বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হয়। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব এই যে প্রথমত এ স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতার ওপর নির্ভর করেনা, স্বরাঘাতের তীব্রতা ও ক্ষীণতার ওপর নির্ভর করে। বাংলা স্বরের হ্রস্বদৈর্ঘ্য যে নেই তা নয়, কিন্তু তা সংস্কৃত বর্ণমালার ওপর নির্ভরশীল নয়, অনেকাংশে পরবর্তী বর্ণের গুণের অনুসারী। দ্বিতীয়ত বাংলায় প্রতি শব্দের প্রথম অক্ষরে প্রধান স্বরাঘাত পড়ে এবং তৃতীয়ত ব্যঞ্জনবর্ণের বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণের প্রাণস্বরূপ। বাংলার বর্ণমালা সংস্কৃতানুসারিণী কিন্তু উচ্চারণ সংস্কৃতসম না হওয়ায় এর আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে, যথা শ-ষ-স, জ-য-য়, অন্তস্থ ও বর্গীয় ব ইত্যাদি, এগুলির সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে ভ্রমসংশোধন সম্পর্কে করা হ'ল। দুঃখের বিষয় এই যে বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আজ পর্যন্ত গবেষণা হয়নি—এই ভার বাংলার শিক্ষকদের নিজের হাতে তুলে নিতে হবে।

ছাত্রদের উচ্চারণসংশোধনের বহু পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেগুলির সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি সহানুভূতি, এ ভিন্ন উপায় নেই সরব পাঠের সময়ে যে বিকৃতি ধরা পড়ে অভ্যাসের দ্বারা তার সংশোধন করা হয়। সেই সময়ে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ছাত্রের পাঠে বিকৃতি থাকলে সে লাজুক ও ভীরু হয়ে থাকে, কাজেই সংশোধন করতে গিয়ে যেন কোনোরকমে ক্লাসের সকৌতুক দৃষ্টি তার ওপর না পড়ে। তাহ'লে লজ্জা ও সংকোচের চাপে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এইজন্য সমস্বরে সরব পাঠের ব্যবহারের উপযোগিতা আছে।

এরূপ পাঠাভ্যাসের কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, ;-একজনের উচ্চারণশুদ্ধির জন্য সবাইকে সমস্বরে পড়তে বল্লে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করে' অন্যদের সময় নষ্ট না করে', শিক্ষকের পরিচালনের গুণে সে কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, সবাইকে একসংগে পড়তে হ'লে তাল রেখে পড়তে হবে, তাতে ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দের পরিচয়-লাভ সহজ হবে ও আদর্শ সরবপাঠের ভিত্তি স্থাপিত হবে। সর্বশেষ কথা এই যে নিচের শ্রেণির ছেলেপিলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়তে আনন্দ পায়।

সমস্বরে পাঠের বিপদ এই যে এতে গোলে হরিবোল দেওয়া সহজ, সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া ভাষার তাল রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সুর করে' পড়ার অভ্যাস হয়—সেটা এড়িয়ে চলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সমস্বরে সরব পাঠের জন্য এমন কবিতা নির্বাচিত করতে হবে যার মধ্যে ছন্দের বিভাগ সমান ও তাল সুস্পষ্ট।

ক্লাসের সবাইকে একসংগে চেঁচিয়ে পড়তে না দিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ করে' পড়ালে দলবদ্ধ পাঠের দোষ বর্জন করে' উপকারিতা-টুকু রাখা যায়। এরূপ পাঠের জন্য প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের মতো কোনো নাটকীয় রীতি অবলম্বন করলে ছাত্রেরা আনন্দিত হয়। আবৃত্তি ও অভিনয়মূলক কার্যকলাপের ব্যবহারও এরূপ ক্ষেত্রে উপযোগী।

এ ভিন্ন ক্লাসের সকলে যখন সাধারণভাবে কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকে তখন শিক্ষক যদি একেকজনকে কাছে ডেকে, নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলে' ব্যক্তিগতভাবে উচ্চারণসংশোধনের চেষ্টা করেন তবে যে ছাত্রের উচ্চারণ বিকৃত তার প্রতি কারো দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবেনা।

একা এবং সমস্বরে এই দুইরকম সরব পাঠ মিলিয়ে মিশিয়ে অভ্যাস করানো ভালো। এর একটা ক্রম অনুসরণ করা যায়। নিচের ক্লাসে যখন ছোট ছোট বাক্য ও ছড়া পড়ানো হয় তখন সমস্বরে সরব পাঠ

উপকারী ও আনন্দদায়ক। ক্রমে ছাত্র যত অবিরল ও বিশুদ্ধভাবে পড়তে অভ্যস্ত হবে তত সমস্বরে পাঠ কমিয়ে একা পড়ার অভ্যাস করতে হবে। ওপরের ক্লাসে সমস্বরে পাঠ মোটামুটি বর্জন করা যায়।

উঁচু ক্লাসে কবিতা ছাড়া সরবপাঠেরও ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া ভালো। বড়রা যখন পড়েন তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রায় কখন চেঁচিয়ে পড়েন না, নীরব পাঠই পাঠের পূর্ণ পরিণতি এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিকাশ।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দিনেও বাংলাদেশের অনেক বিদ্যালয়ে বানান করে' পড়তে শেখানোর পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং তার ফলে অনেকেরই ওইভাবে পড়ার অভ্যাস হয়ে যায়। আবার এমন ছাত্র দেখা যায় যে বড় হয়েও সে জোরে না পড়লে কোনো বিশেষ পাঠ্যাংশের অর্থ ভালো করে' বুঝতে পারেনা এবং পড়া শিখতে পারে না। এদের নীরব পাঠ অনেক সময়ে সরবপাঠের রূপান্তরমাত্র—পড়ার সময়ে শব্দ না হ'লেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ঠোঁট নড়ছে।

বানান করে' পড়তে যে অনেক বেশি সময় লাগে তা বলা বাহুল্য এবং সাধারণ সরব পাঠেও প্রত্যেকটি অক্ষর ঠোঁট, জিভ ইত্যাদির সাহায্যে পৃথক উচ্চারণ করতে হয় বলে' নীরবপাঠের চেয়ে বেশি সময় লাগে। তাছাড়া সরবপাঠে অক্ষরগুলি একে একে পড়তে হয় বলে' পাঠ্যবস্তুটিকে সমগ্রভাবে দেখা যায় না।

এই দুই দিক দিয়ে নীরবপাঠের উৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত ওপরের শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও কাঠিন্য যখন বেড়ে চলে তখন নীরবপাঠের অভ্যাস না থাকলে বিপদ ঘটে। নীচের ক্লাস থেকে ছাত্রদের অল্পে অল্পে নীরবপাঠে অভ্যস্ত করে' রাখতে হবে যাতে ওপরের ক্লাসে উঠে অসুবিধা না হয়।

মনশ্চক্ষে সমস্ত শব্দ বা বাক্যাংশের প্রতিরূপ দর্শন করার ক্ষমতা

নীরব পাঠের ভিত্তি, এবং এই অভ্যাসের দ্বারা ছাত্রকে সরব পাঠ থেকে নীরব পাঠের দিকে অগ্রসর করতে হবে। একেকটি শব্দ বা বাক্য বোর্ডে লিখে শিশুদের অল্পক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দিয়ে তারপর মুছে দিয়ে সেটি বলতে বা লিখতে দিলে নীরবপাঠের অভ্যাস হবে। তারপর সহজ, সংক্ষিপ্ত অংশ মনে মনে পড়ে' তার সারার্থ সংগ্রহ করতে করতে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বা গ্রন্থ নীরবে পাঠ করে' অর্থবোধ করার অভ্যাস হবে। "পুস্তকহীন" শিক্ষাপদ্ধতিতে নীরবপাঠের অভ্যাস আরো সত্বর এবং সহজে হয়, কারণ তখন কার্যকারণ সংযোগবশত ছেলেদের আগ্রহ অর্থগ্রহণের দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে থাকে।

নীরবপাঠের আরেক স্তর সারগ্রহণ (skimming) বা চোখ বুলিয়ে অর্থবোধের ক্ষমতা। নীরবপাঠ যতই দ্রুত হোক না কেন, তাতে প্রত্যেক শব্দের ওপর দিয়ে দৃষ্টিকে চালিত করা হয় বলে' কিছু অধিক সময় যায়; কিন্তু তার চেয়ে দ্রুতবেগে কোনো অংশের সার-গ্রহণের প্রয়োজন হ'লে সমগ্র অর্থ বুঝে নেবার ক্ষমতা চাই। নীরব-পাঠে খুব পটু না হ'লে এই ক্ষমতা জন্মায়না। এর অভ্যাসের জন্য প্রথম প্রথম পাঠ্যাংশের প্রধান অংশগুলি চিহ্নিত করে' দেওয়া যেতে পারে, পরে সংকেত ভিন্নই প্রধান বিষয়টুকু আপনি আবিষ্কার করার ক্ষমতা জন্মাবে। যেসব ছেলেপিলে খুব বেশি গল্পের বই পড়ে তাদের মধ্যে আপনা থেকেই এই ক্ষমতা বিবর্তিত হয়।

এই প্রক্রিয়ার অত্যধিক ব্যবহারের বিপদ এই যে তাতে ছাত্রের পড়াশোনা অগভীর, ভাসাভাসা হয়ে যেতে পারে। পরীক্ষার সময়ে পঠিত বিষয়ের পুনঃপাঠের জন্য অথবা দ্রুত কোনো অংশের সার-গ্রহণের জন্য এই অভ্যাসের প্রয়োজন, তাই শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন যে ওই প্রয়োজনসাধনের বাইরে এই পদ্ধতির অত্যধিক প্রয়োগে ছাত্রেরা গভীর অভিনিবেশের অভ্যাস যেন হারিয়ে না ফেলে।

লেখা

পড়ার চেয়ে লেখা জটিল কাজ। চোখে দেখে চেনায় কেবল চোখের সংগে মস্তিষ্কের বোঝাপড়ার ব্যাপার, কিন্তু লেখায় মস্তিষ্কের মারফৎ চোখ ও হাতের পেশিসমূহের সামঞ্জস্যময় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। অপরপক্ষে, লেখায় শিশু কর্মশীলতার সুযোগ পায় বলে এতে তার আগ্রহ দেখা যায়।

শিশুর পেশিসমূহকে সুসংযত করে পরিচালনা করার ক্ষমতা পরিপক্ক হ'তে একটু দেরি হয়। যেমন বন্য ঘোড়াকে ধীরে ধীরে পোষ মানিয়ে রশ্মির সূক্ষ্মতম ইংগিতমাত্রের বশ করতে অনেক প্রয়াসের প্রয়োজন, তেমনি শিশুর পক্ষে অবাধ্য ও অনভ্যস্ত পেশিসমূহকে আয়ত্ত করাও বহু সাধনাসাধ্য।

শিশুশ্রেণিতে লিখতে শেখানোর আগে নানা খেলার দ্বারা পেশি-পরিচালনক্ষমতাকে দৃঢ় করাতে হয়। তেঁতুলবীচি বা পাথরের টুকরো সমান সমান রেখায় সাজানো, মোজাইকের ছবি তৈরি করা, পুঁতির মালা গাঁথা, বিল্ডিং ব্লক্স্ দিয়ে বাড়ী তৈরি করা প্রভৃতি উপায়ে এই কাজ সাধিত হয়। এইসব প্রক্রিয়া যাতে যান্ত্রিক অভ্যাস না হয়ে খেলার উপলক্ষ্যে করানো হয় সে বিষয়ে শিক্ষকের সচেতন হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি একটা রেখা টেনে দিয়ে তার ওপর বীচি বা পাথর সাজাতে বলবেননা, শিশুরা যাতে স্বেচ্ছাক্রমে সেগুলিকে কুচকাওয়াজরত সৈনিক বা ব্যায়ামরত বালক মনে করে' বা অন্য কোনা কল্পনায় শ্রেণিবদ্ধ করে তার উপযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন, যথা, তারা কাঠের টুকরোর বাড়ি বানিয়ে, বীচি বা পাথরের দেয়াল, পথঘাট ইত্যাদি রচনা করতে পারে শিশুশ্রেণিতে এই খেলাধুলা ব্যক্তিগত থেকে সামাজিকতার

ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে সহযোগিতামূলক কাজে পরিণতি লাভ করবে। এতে কল্পনার বিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের অনুকরণমূলক পূর্বাভাসের সুযোগও ঘটবে।

সংগে সংগে লেখার যন্ত্রপাতির সংগেও শিশুর পরিচয় সাধন করা হয়। দেখা গেছে যে শিক্ষিত পরিবার থেকে আগত শিশু অশিক্ষিত পরিবার থেকে আগত সমান বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি লিখতে শেখে। লেখাপড়ার আবহাওয়া ও যন্ত্রপাতির সংগে পরিচয়ই এর কারণ।

প্রথমে লেখাপড়ার উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে যা মোটা তাই শিশুর হাতে দিতে হবে। পেন্সিল বা কলম চালনা করার মতো সূক্ষ্ম গতিবিধি তার অনভ্যস্ত পেশীর পক্ষে সম্ভব নয় বলে' এসব তাদের হাতে দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। স্কুলের নীচের ক্লাসের ঘরের দেয়ালের চারদিক, নয়তো অন্ততপক্ষে একদিক, জুড়ে নীচু লম্বা কালোপট লাগানো চাই।' এই পট আলগা ঝোলানো না হয়ে সিমেণ্ট-কংক্রিটের হ'লেই নিরাপদ। আজকাল অনেকে টাঙানো বোর্ডের রং ঘোর শ্যাওলা ও তার ওপর হলদে রঙের খড়িতে লেখার সুপারিশ করে থাকেন। বোর্ড যে রঙের হোকনা কেন, তার সংগে বহুরঙের খড়ির ব্যবহার শিশুর উৎসাহবৃদ্ধি করবে। অথবা বিদ্যালয়ের সিমেণ্টের (যদি তা অতিরিক্ত পালিশ করা না হয়ে থাকে) বা নিকোনো মেঝের ওপর মোটা রঙিন খড়ি দিয়ে শিশুর প্রথম লেখার প্রয়াসকে মুক্তি দেওয়া যায়। আমাদের দেশে শিশুকে যে হাতেখড়ি দিয়ে উঠোনে ছেড়ে দেওয়া হ'ত তার একটা উপকারিতা ছিল এই যে লিখবার বিরাট ক্ষেত্র পেয়ে শিশুর লিখবার ইচ্ছাও বিরাট হয়ে উঠতো। বাড়িতে ছেলে-পিলেদের একটুকরো খড়ি বা পেন্সিল পেলে যে সমস্ত ঘরদোর রং করে' ফেলতে দেখা যায় সেও ওই প্রবৃত্তিরই রূপান্তর। প্রথম

প্রথম সে হয়তো খড়ি ধরতে পারবেনা, হয়তো একটা রেখাও আঁকতে পারবেনা। কিন্তু অদম্য অধ্যবসায়ের সংগে চেষ্টা করে' চলবে।

শিশুর প্রথম প্রয়াস বর্ণমালার অনুলিখন নয়, যথেচ্ছ আঁচড় কেটে লেখনযন্ত্রের পরিচালনের অভ্যাস। ক্রমশ এই আঁচড়গুলোর আকার স্পষ্ট হবে এবং গোল চারকোনা প্রভৃতি নানা আকৃতির মধ্যে তার কয়েকটি প্রিয়বস্তুর মূর্তি উঁকি মারবে ; এগুলি সচেতন চেষ্টায় অংকিত নয়, শিশুর অবচেতন সৃষ্টি ; সম্ভবত এগুলি সে সচেতনভাবে আঁকতেও পারবে না। এই আঁকার মধ্যে দিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করে। কিছুদিন আগে (১৯৬৩) একটি মার্কিনি খবরের কাগজে একটি দুই বছরেব মেয়ের কথা প্রকাশিত হয়েছে যার চিত্রায়ণ একটি প্রতিযোগিতায় "ইম্প্রেশনিস্টিক্" চিত্রকলার দু'টি পুরস্কার পেয়েছে। আরো বড় হয়েও এই অভ্যাস থাকে এবং কোনো কোনো ছেলেকে লিখতে শেখার পরও ছবি এঁকে এঁকে গল্পরচনা করতে দেখা যায়।

এই অভ্যাস কিছুদূর অগ্রসর হ'লে পর শিশুকে রঙের গোলা আর মোটা তুলি দিলে হাতের স্পর্শ পরিষ্কার (delicate) হবে। বেনের দোকানে সামান্য দামে গুঁড়ো রং কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে যে শিশু রং খেয়ে না ফেলে। বড় বড় কাগজের রসদ জোগানোও কঠিন হবেনা, শিশুরা পুরোনো খবরের কাগজ বা ব্রাউন কাগজের ওপরই আঁচড় কেটে, ছবি এঁকে আনন্দ পাবে।

একদিকে শিশুর হাতে লেখনযন্ত্র দিয়ে অন্যদিকে তাকে অক্ষরের আকৃতির সংগে পরিচিত করলে সেগুলিও তার ছবির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এই অবস্থা অক্ষরপরিচয়ের নয়, কেননা এখন অক্ষরের আকৃতি দেখতে ও তাই নিয়ে খেলতে দেওয়া হয়, খেলনা হিসেবে, অক্ষর বলে' নয়। মন্তেসরিপদ্ধতির ব্যবহৃত মোটা কাগজে কাটা অক্ষরের আকৃতি শিশুর হাতে দিলে সে সেগুলি নেড়েচেড়ে, তার ওপর আঙুল

বুলিয়ে, বালির বাক্সে তার ছাপ ফেলে বা আঙুল দিয়ে, বালিতে তার দাগা বুলিয়ে সেগুলির আকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবে। যে শিশু তুলির ব্যবহার শিখেছে তাকে কাটা বাংলা হরফ দিলে সেগুলির ওপর তুলি বুলিয়ে আঁকতে পারবে।

ক্রমে শিশুর হিজিবিজি চিত্রসমূহের মধ্যে দুয়েকটি অক্ষর উঁকি মারে। হয়তো তাদের আকৃতি বিশুদ্ধ নয়, হয়তো সেগুলি উল্টোপাল্টা, বাঁকা-চোরা মূর্তিতে এসে উপস্থিত হয়, হয়তো সেগুলির সম্বন্ধে শিশু সচেতন নয় এবং চেষ্টা করলে লিখতে পারেনা, তবু তারা অক্ষরাকৃতির স্মৃতিছায়া। শিক্ষকের অল্প সাহায্যের ফলে প্রথমে সে দাগগুলির রকমফের করতে শিখবে, পরে দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে অক্ষরের অনুরূপ নক্সা কেটে হাতের লেখার ভিত্তি স্থাপিত হবে। শিক্ষক নানা কাজ ও খেলার উপলক্ষ্যে "পাড" আঁকার অভ্যাস করিয়ে ওই অক্ষর-গুলিকে সমান্তরাল লেখার ছকে ফেলে শ্রেণিবদ্ধ লেখার ভিত্তি স্থাপন করবেন। এখন এদের অবচেতনলোক থেকে চেতনার আলোকে উপনীত করা তাঁর মস্ত কাজ।

শিশু যতদিনে একদিকে ছবি, খেলা ও কাজের সাহায্যে পড়তে শিখছে, ততদিনে অন্যদিকে অক্ষরের প্রতিকৃতি চিত্রিত করে' চলেছে। দুটি প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে চলতে একদিন তাদের সংযোগ ঘটে। সেদিন শিশুশিক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ এবং সেদিন থেকে সচেষ্ট অধ্যবসায় দ্বারা তার ক্রমোন্নতি ঘটবে।

ক্লাসের ঘরে যদি রঙিন ছবি ও তার সংগে যুক্ত শব্দ, গল্প ও ছড়া চারিদিকে টাঙান থাকে তবে শিশুর পড়ার মতো লেখাও সহজ হয়। পরে সে জিনিষের নাম লিখে, কেটে, ছবির সংগে সংযুক্ত করতে পারবে। নানাপ্রকার কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি সফল হয়। কর্ম ও ক্রীড়ামূলক শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণির সমস্ত পাঠই খেলা বা কাজের পরি-

কল্পনাকে ঘিরে পরিচালিত হয়। তাতে যে কেবল প্রয়োজনের অনুভূতিতে শিক্ষার চাহিদা বাড়ে তা নয়, জ্ঞানকর্মের সমগ্রতাবোধের ফলে অখণ্ড পূর্ণমনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং মাতৃভাষাকে সকল চেষ্টার মূলস্বরূপ পাওয়া যায়।

শিশুর নবজাগ্রত আমিত্ববোধের সহায়তায় তাকে নিজের নাম লিখতে প্রবৃত্ত করা যায়,—যেমন পড়ার সময়েও সে নিজের নাম চট করে' পড়তে শেখে। তারপর মাস, বার ও তারিখের কার্ড টাঙানোর পরিবর্তে সেগুলি বোর্ডে লেখানো যায় লেখার শক্তি কিছু পরিণতি পেলে প্রত্যেকে একেকটি বিশেষ খবর লিখে দেয়ালপত্রীতে সেঁটে দিতে পারে। শ্রেণিকক্ষের উপকরণ, বাগানের বা অন্যান্য হাতের কাজের হিসাব, তালিকা, বিবরণ, পুতুলের বিয়ে, চড়ুইভাতি ও আরো অনেক পরিকল্পনার বিজ্ঞপ্তি, বিবরণী ও প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র লিখে লেখার যথেষ্ট অভ্যাস হয়।

সচেতনভাবে বস্তুসমূহের নাম লিখতে পারার সময় থেকে শিশুকে ছবির বই বানাতে দিলে তার আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, তার স্বাভাবিক সংগ্রহপ্রবৃত্তি লেখার কাজে প্রেরণা জোগায়। সাধারণ মোটা ব্রাউন কাগজের খাতা সেলাই করে' তাতে রঙিন ছবি সেঁটে তার বই তৈরি হবে। প্রথম প্রথম সে জিনিসের নাম লিখে সন্তুষ্ট হবে। তারপর ক্রমে সেগুলির বিষয়ে দুচারটি কথা লিখতে চাইবে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী আলাদা আলাদা বই করতে দিলে ভাল, যেমন, এরোপ্লেন, জাহাজ, মোটর, ফুলফল, পাতা, জীবজন্তু সব বিষয়ে একেকটি বই তৈরি হ'তে পারে। প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ করবার জন্য ডাকটিকিটের মতো ছবি বদল করা যেতে পারে। এতে লেখার সংগে সংগে সাধারণজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং সজ্জিত ও সুসংবদ্ধ হয়। ক্লাসের প্রকল্প নিয়েও বই লেখা যায়। যেমন প্রথম শ্রেণিতে

পথচলার নৈরাপত্তের নিয়মসমূহ নিয়ে প্রকল্প হয়ে যাওয়ার পর ছেলেরা সচিত্র বই লিখেছিল। পরিচিত বা স্বরচিত ছড়া ও গল্প নিয়েও বই তৈরী করা যায়। বই তৈরি করায় সময়ে শিশুদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতে হবে, কেবল সংগ্রহ করার নয়। শ্রেষ্ঠ বইগুলি বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সাজানো হ'লে সকলে নিজের বই সুন্দর করতে চেষ্টা করবে।

সুন্দর হাতের লেখা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, লেখকের সৌন্দর্য-বোধ, শিল্পনৈপুণ্য ও যত্নশীলতার পরিচায়ক। হাতের লেখা সুন্দর করার চেষ্টায় ওই গুণগুলিও ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত হয়। সুন্দর হাতের লেখা পরীক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের একটি মূল্যবান সহায়। অপরপক্ষে নোংরা হাতের লেখা অযত্ন ও অবহেলার পরিচয় দেয়, নতুবা বোঝায় যে ছাত্রের মনন ও রূপায়ণের শক্তির সমাঞ্জস্য হয়নি। মনের ভাব স্পষ্ট না হ'লেও অনেক সময়ে হাতের লেখার অবনতি ঘটতে দেখা যায়। একবার একটি ছেলে নোতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে স্বচ্ছন্দ হ'তে পারছিলনা, তার হাতের লেখা সেই সংগে খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু কিছুদিন পর পরিবেশের সংগে সে যখন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল তখন তার হাতের লেখাও তার পূর্বসৌন্দর্য ফিরে পেল। হাতের লেখা থেকে চরিত্রবিশ্লেষণ ও মনোবিকলন দুইই সম্ভবপর তাই ডাক্তার যেমন রোগের লক্ষণ দেখে ওষুধ দেন শিক্ষকও তেমন চরিত্রের বহির্লক্ষণ হাতের লেখাকে শিক্ষার এক যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন।

বিদ্যালয়ের পরিভাষায় "লিখতে শেখা" ও "হাতের লেখা" দুটি আলাদা কথা হ'লেও দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে গভীর যোগ আছে। যে-সব শিশু আধুনিক পদ্ধতিতে লিখতে শেখে, অনেকদিন ধরে' লেখার যন্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার ফলে তাদের হাতের লেখা প্রায় ভালই হয়। তাছাড়া এই পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে শেখার প্রথম স্তর ছবি আঁকা ও হাতের

কাজের পর্যায়ভুক্ত হয় বলে' সে চিত্রাংকনের মতোই মনোযোগের সংগে সুন্দর লিপি প্রস্তুত করে। এতে লেখা স্বভাবতই ভাল হয় বলে' আলাদা করে' হাতের লেখা না লেখানোই ভাল। যত্ন করে' নিজের হাতে ছবির বই তৈরি করার সমান কাজ হয় এবং তাতে সৃষ্টির আনন্দ ও গর্ব মিশে থাকে বলে' হাতের লেখার নীরস প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক চিত্তাকর্ষক। যে শিশু দু'পাতা হাতের লেখা লিখতে সমপরিমাণ কালি ও চোখের জলের ধারা বইয়ে দেয় সেই বিনা আয়াসে সম্পূর্ণ ছবির বই তৈরি করতে পারে।

হাতের লেখা যদি লেখাতেই হয়, তবে হস্তলিপির বই ব্যবহার না করে' শিক্ষকের নিজের হাতে শিশুর খাতায় একছত্র লিখে দেওয়া ভাল ; তাতে শিক্ষকের হাতের চালনা দেখে শিশু উপকৃত হয়। যে-সব শ্রেণিতে অনেক ছাত্র সেখানে প্রত্যেকের খাতায় আলাদা করে' লিখে দেওয়া অসম্ভব হ'লে, শিক্ষক বোর্ডে একছত্র লিখে দেবেন। শিক্ষকের হাতের লেখা খারাপ হ'লে হস্তলিপির বই ভিন্ন গত্যন্তর নেই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে শিশুরা প্রত্যেকটি অক্ষর যথার্থ প্রক্রিয়ায় লিখছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। একটি ছেলে "ত" এর পুঁটলিটি বসাবার সময়ে উল্টোদিকে পাক দিত বলে' ওই অক্ষরটি উল্টো লিখত আর আকারাদির আগে অক্ষর লিখত বলে' এ-কার ও ই-কারের ক্ষেত্রে লেখা অসমান হ'ত।

শিক্ষকের লেখা দেখেই হ'ক বা হস্তলিপির বইয়ের অনুকরণেই হ'ক একছত্র বারবার লিখে হাতের লেখার অভ্যাসের চেয়ে পুরো সাহিত্যাংশের অনুলেখন বেশি সার্থক। হাতের লেখা নিতান্তই যান্ত্রিক কাজ এবং তার শ্রম লাঘব করার জন্য ছেলেরা সময়ে সময়ে এমন সব চালাকির আশ্রয় নেয় যাতে তার উপকারিতা অনেক কমে যায়। অপরপক্ষে সুন্দর সাহিত্যাংশের অনুলেখন স্বয়ংসঞ্চয়ন ব

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ধৃতিসংগ্রহের জন্য করালে তাতে ছাত্রের মন ও হাত একসংগে কাজ করে।

হাতের লেখার ভালমন্দ বিচারের সময়ে শুধু অক্ষরের ছাঁদ দেখলে চলবেনা, সংগে সংগে দেখতে হবে সেগুলির আয়তন সমান হয়েছে কিনা, দুই শব্দের মধ্যে সমান ব্যবধান আছে কিনা, লাইন সোজা হয়েছে কিনা এবং কাজটি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়েছে কিনা। শিশু যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করে তখন বড় কাগজে মোটা লাইন টেনে তাকে বড বড হরফ লিখতে উৎসাহিত করতে হবে। ক্রমশ সাধারণ খাতার লাইনে চলবে এবং তৃতীয় ধাপে অনেকে ডবল লাইনের খাতা পছন্দ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত যেন শাদা খাতায় লাইন সোজা রেখে লেখার অভ্যাসটাই আদর্শ থাকে। শাদা খাতায় প্রথম লিখবার সময়ে বেঁটে কাগজ দিলে ওপর ও নীচের সীমার সংগে সামঞ্জস্য রেখে লাইন সোজা করতে সুবিধা হয়। হাতের লেখা ভাল হ'লেও যদি কালির ছিটে বা কাটাকুটিতে ভরা থাকে তা হ'লে নিন্দনীয়। পরিচ্ছন্নতা যে-কোনো শ্রেণির লেখার অপরিহার্য অংগ।

লিখবার সময়ে ভংগি এবং কগজকলম ধরার পদ্ধতি যত্নের সংগে লক্ষ্য করার বিষয়। কলম যদি ঠিক করে' ধরা না যায়, তবে লেখা ভাল হয় না, তাড়াতাড়ি লেখার অসুবিধা হয় এবং লিখতে লিখতে হাতে ব্যথা হয়। কাগজ ধরার ও বসার ভংগির ভুল সাধারণত এক-সংগে হয়। ঠিক করে' বসতে না পারলে সোজা করে' কাগজ ধরা যায়না আর সোজা করে' কাগজ ধরা না থাকলে বসারও সুবিধা হয়না। বাঁকা করে' বসলে বা কাগজ ধরলে বক্রদৃষ্টিতে দেখে লিখবার ফলে চোখ খারাপ হয়, আবার অনেক সময়ে যাদের চোখ খারাপ তারা বাঁকা হয়ে বসে' কাগজ বাঁকা করে' ধরে' লেখে। তাই ভাল করে' মূলানুসন্ধান করে' এই দোষের সংশোধন করা উচিত।

লেখার যন্ত্রের সম্পর্কে কিছু আলোচনা আগে হয়েছে। খড়ি ও তুলি ছেড়ে পেন্সিল ধরার সময় প্রায় সব বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতেই আসে, তৃতীয় শ্রেণির পর থেকে ধীরে ধীরে কলম ধরানো হয়। কলমের নিব প্রথম প্রথম মোটা হওয়া চাই। একটু বড় হ'লে ছেলে-পিলেরা প্রায় নিজেদের জেদেই ঝর্ণাকলম ধরে। এই বিষয়ে অনেক শিক্ষক বিরোধিমত পোষণ করেন এবং অনেকের ধারণা এই যে ছোটবেলা থেকে ঝর্ণাকলম ধরলে হাতের লেখা খারাপ হয়ে যায়।

একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে এই বিশ্বাস যুক্তিসংগত নয়। ঝর্ণাকলমের ব্যবহারে খরচ সামান্য একটু বেশি। আজকাল অত্যন্ত সস্তায় এই জিনিস বিক্রি হয়। সস্তা ঝর্ণাকলমের নিবের সাধারণ কলমের নিব থেকে খারাপ হবার কথা নয় আর অল্প একটু দামি ঝর্ণা কলম কিনতে পারলে তো কথাই নেই। আমার বহুপরীক্ষিত অভিজ্ঞতা এই যে প্রথম থেকেই বালকের হাতে ঝর্ণাকলম দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সময় ও গতিবিজ্ঞানের (time and motion study) বিচারে এ-বিষয়ে দ্বিরুক্তি হওয়া উচিত নয়। সাধারণ কলমে লিখতে বারবার কালি নেওয়ার প্রক্রিয়ায় লেখার গতি ব্যাহত হয়, সময় নষ্ট হয়, লেখার দিক থেকে মনোযোগ বিকর্ষিত হয়। ঝর্ণাকলমে এ-সব অসুবিধা নেই। তাছাড়া কালি ফেলে ঘরদোর নষ্ট করার বিভ্রাটের সম্ভাবনা ঝর্ণাকলমের ব্যবহারে অনেক কম।

ছেদচিহ্নের প্রয়োগের শুদ্ধতা যে-কোনো লেখার পক্ষে আবশ্যক। লিখতে শেখার শুরু থেকেই ধাপে ধাপে এর প্রয়োগ শেখাতে হবে। যেমন প্রথমে দাঁড়ি, তারপর জিজ্ঞাসার চিহ্ন, তারপর কমা, আশ্চর্যের চিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন ইত্যাদি।

সর্বশেষে শ্রুতলিপির বিষয়ে দু'এক কথা বলব। বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত বানানবিশুদ্ধির পরীক্ষার জন্য শ্রুতলিপি দেওয়া হয়ে থাকে

কিন্তু এতে বানানশিক্ষার সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে অন্ধভাবে মুখস্থ করার অভ্যাস হয়। অপরপক্ষে কানে শুনে লেখার ক্ষমতা অনেক কাজে লাগে। যে-ছেলে কলেজে যাবে তাকে লেকচার শুনে নোট নিতে হবে আর কর্মক্ষেত্রেও অনেককে এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার করতে হয়। হাতের লেখার পক্ষেও এর উপযোগিতা আছে, এতে তাড়াতাড়ি অথচ পরিষ্কার করে' লেখার অভ্যাস হয়।

শ্রুতলিপির অভ্যাসকে বাস্তবিক কাজে লাগাতে হ'লে এমন অংশ নিতে হবে যাতে কঠিন বানান বেশি না থাকে। তারপর যদি ছাত্রদের নির্দিষ্ট অংশটি আগে পড়ে' আসতে বলা যায় অথবা লিখবার সময়ে কঠিন শব্দগুলি বোর্ডে তুলে দেওয়া যায় তবে ছাত্রেরা বানান সম্বন্ধে দুর্ভাবনামুক্ত হয়ে লেখার অভ্যাসরূপে কাজটি করতে পারে।

শ্রুতলিপিকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য সুন্দর গদ্য ও কাব্যাংশ বেছে নিতে হবে। এই অংশগুলি স্বয়ংসঞ্চয়ন, রচনা প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করা যায়। বস্তুত, সোজাসুজি শ্রুতলিপি না দিয়ে এইগুলিকে উপলক্ষ্য করে' তার অবতারণা করলে ছাত্রের আগ্রহ বজায় থাকবে ও তারা আনন্দের সংগে লিখবে।

রচনা

কোনো কিছু গড়ে' তোলাকে রচনা বলা যেতে পারে। ভাষার রচন যে কাগজে লিখতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। শিশু যখন প্রথ: মুখে মুখে বাক্যরচনা করে তখন থেকেই তার রচনার সূত্রপাত হয় লিখতে-পড়তে শেখার আগে সে এমনি মৌখিক রচনাব পদ্ধতি আয়ত করে' নেয়। "আমি খাব" বা "লালফুল" শিশুমনের সম্পূর্ণ রচনা।

লেখা ও কাজের মধ্যে দিয়ে কি-ভাবে ক্রমশ মৌখিক ও লিখিত রচনার অভ্যাস হয় তার আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে। খবর বল ও লেখা থেকে আরম্ভ করে' ক্লাসের কাজের পরিকল্পনা, আলোচন ও হিসাবনিকাশ সবই রচনার প্রয়াসের অন্তর্গত। তাছাড়া শিশু ছবি: বইয়ের জন্য গল্প লিখবে ও রচনা করবে এবং ক্লাসের প্রকল্পজাত জ্ঞান বিধিবদ্ধভাবে লিখে রাখবে। এর উদাহরণও আগে দেওয় হয়েছে।

ভাষার অধিকার ও বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ধারণা রচনার ভিত্তি। ভাষা: দিক থেকে রচনার মূল বাক্যে গ্রথিত শব্দ। শিশু প্রথমে সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বাক্য বলতে শিখবে, পরে খাতায় লিখবে। এইজন্য তার বাক্য গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যাকরণ ও রীতিসম্মত অথচ সহজ ও উজ্জ্বল বাক্যই সুন্দর রচনার ভিত্তি।

বাক্যরচনার সংগে বাক্যপরম্পরা সজ্জিত করার অভ্যাস করাতে হবে। শিশু একটি বাক্য বলে' বিরত হবেনা, যে-কটি বাক্যেই হোক তার বক্তব্যবিষয় সম্পূর্ণ করবে।

ভাবের দিকে রচনার মূল হ'ল ধারণা। প্রকাশের তাগিদ শিশুকে রচনায় উদ্যত করবে ও ধারণার স্পষ্টতা তার রচনাকে স্পষ্ট ও সাবলীল

করবে। বস্তু, কর্ম ও ঘটনাপ্রবাহ প্রভৃতি ধারণার উদ্ভব ও নির্ভরের স্থলস্বরূপ।

কর্মভিত্তি শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজের জন্য কথাবলার ও লেখার প্রয়োজনবোধ থেকে রচনার প্রেরণা ও বিষয়বস্তু উপজাত হয় এবং কাজের ক্রমেই শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদাদির পথে রচনাশৈলী পরিণতি পায়। এতে বিদ্যালয়ের প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই সুন্দর রচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

গল্পের সাহায্যেও রচনার অভ্যাস করানো যায়। মৌখিক কাজের সম্পর্কে চিত্রভূমিক গল্পরচনার কথা বলা হয়েছে, লিখবার সময়েও এই রীতি অবলম্বন করা হয়; দুই কাজ একসংগে করা যায়,—শিশু মুখে রচনা করে' পরে খাতায় লিখতে পারে। ঘটনা ও ছবি ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করে বলে' ভাব সহজেই তার অনুবর্তন করতে পারে।

শিশুর রচনা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। প্রথমে বাক্য ও তারপর অনুচ্ছেদের বেশি লিখবার দরকার নেই। অনুচ্ছেদরচনা রচনার একটি কঠিন অংগ, কিন্তু শিশুর সজীব মন আগ্রহজনক বিষয় পেলে সহজেই তাতে সাফল্যলাভ করবে। যেমন, ক্লাসে একটি ছবি দেখানো হ'ল—একটা বেড়াল একটা খোলা খাঁচার ভেতরকার পাখিটিকে ধরবার চেষ্টা করছে। এটি অবলম্বনে রচিত দুটি গল্পের নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল—

১। দিদির মেনি বড় দুষ্টু। ঝি পিসিমার টিয়াপাখির খাঁচা খুলে রেখেছিল। মেনি পাখিকে খাবার চেষ্টা করছিল। মা মেনিকে তাড়িয়ে দিলেন।

২। আজ সকালে আমাদের বাড়িতে একটা কাণ্ড হয়েছিল। ঝি পিসিমার টিয়াপাখিটাকে খাবার দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছিল আর সেই অবসরে দিদির পুষি এসে তাকে ধরতে গেছে। ভাগ্যিস মা টিয়াপাখির চিৎকার

আর ডানা-ঝটপটানি শুনে, তাড়াতাড়ি এসে পুষিকে তাড়িয়ে দিলেন, নাহ'লে টিয়াপাখি বেচারা মারাই যেত।

ওপরের দুটিই গল্প, ছবির বিবরণমাত্র নয়। কিন্তু প্রথমটিতে বাক্যগুলি বিচ্ছিন্ন রয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে গল্পের রস দানা বেঁধেছে। একটি বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিস এই যে দুটিতেই শিশুমন পাখিটির মৃত্যুসম্ভাবনা এড়িয়ে চলেছে।

একাধিক অনুচ্ছেদে গল্প লেখা এর পরের স্তর ;—তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতে এই অভ্যাস আরম্ভ করানো যায়। কোন বিষয়কে কি ভাবে, কয় অনুচ্ছেদে ভাগ করতে হবে তা শিশুর পক্ষে বোঝা কঠিন, তাই প্রথম প্রথম আলোচনা করে' বোর্ডে সংকেত লিখে দেওয়া যায়। যেমন, একটা ছবিতে আছে যে দুটি ছেলেমেয়ে মাঠে একটা কুকুরছানা কুড়িয়ে পেয়েছে। এই বিষয়ের তিনটি অংশ,—কুকুরটিকে পাওয়া, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং পোষা। এই তিন অংশ তিন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে' গল্পটি দাঁড়ালো এইরকম—

"খুকু আর সোনা দুই ভাইবোন। একদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে তারা দেখলো একটা ছোট্ট, সাদা ধবধবে কুকুরছানা পড়ে' পড়ে' কুঁইকুঁই করে' কাঁদছে। এই দেখে তাদের এত কষ্ট হ'ল যে তারা সেটাকে বাড়ি নিয়ে এলো।

"মা ছানাটাকে দেখে বল্লেন—'এটা বোধ হয় ভালো জাতের কুকুর হবে।' তিনি ওকে দুধ খেতে দিলেন আর একটা ছোট ঝুড়িতে ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে নরম বিছানা পেতে দিলেন।

"সেই থেকে কুকুরটা ওদের খেলার সাথি হয়ে রইলো। ওরা তার নাম দিয়েছে 'ঝুমরো'।"

পড়বার সময়ে যেমন চিত্র ও বাক্যপরম্পরার সাহায্যে গল্প পাঠ করানো হয় তেমনি লিখবার সময়ে সেই পদ্ধতির ব্যবহার করলে

ানুচ্ছেদবিভাগ সহজ হয়। একেকটি ছবি একেক অনুচ্ছেদের ;পাদানস্বরূপ হবে , প্রথমে ছবিগুলি দেখিয়ে, গল্পটি মুখে মুখে রচনা ়রিয়ে, তারপর ছবিগুলি সরিয়ে ফেলে গল্পটি লেখাতে হবে। শিক্ষক াসিক পত্রাদি থেকে এরূপ চিত্রপরম্পরা সংগ্রহ করে' বড় করে' ঁকে রাখতে পারেন। স্কুলে যদি এপিডায়াস্কোপ বা এপিস্কোপ- াতীয় যন্ত্র থাকে তবে ছোট ছবিকে অতি সহজেই বড় করে' নেওয়া ায়, তাছাড়া রঙিন বা শাদাকালো ছবি দেয়ালে বা পর্দায় প্রতিফলিত রে' পাঠ উজ্জ্বল ও বস্তু সরস করা যায়। তিনি কিন্তু কখনও গল্পের াখ্যায়িকাটি নিজে গড়ে' তুলবেননা, শিশুর কল্পনাশক্তি উদ্রিক্ত রে' তাকে দিয়ে গঠন করাবেন, কেননা, সৃষ্টির আনন্দ ভিন্ন একাজ াশুর কাছে সহজ ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারেনা।

এরপর ছবির সাহায্য ছাড়া গল্প লেখার পালা। শিশুর পূর্বগঠিত । শ্রুত গল্প বলে' বোর্ডে সংকেত লিখে দিতে হয়, শিশু সংকেত অব- ম্বনে গল্পটি লেখে। এই অভ্যাস একটু পরিপক্ব হ'লে গল্প বলার ময়ে সংকেত লেখা হবে, কিন্তু উপস্থাপনের শেষে বোর্ড মুছে দিয়ে াশুকে লিখতে বলা হবে। পূর্বপঠিত গল্প লেখাতে হ'লে দৃষ্টি রাখতে বে শিশু যাতে বইয়ের ভাষা মুখস্থ না করে। বইয়ের ভাষার ছায়া চনায় আত্মপ্রকাশ নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু হুবহু মুখস্থ করার প্রয়াস শুধু ন্টাইল" নয়, ভাষাবিশুদ্ধি লাভেরও অন্তরায়।

শিক্ষক "সংকেত" বা আখ্যানভাগের কাঠাম দিয়ে ছাত্রদের গল্প- চনায় প্রবৃত্ত করতে পারেন। এক শিক্ষক একটি ছেঁড়া কাগজ নিয়ে াত্রদের বলেছিলেন যে তাঁর গল্প-লেখা কাগজখানা অনবধানতা- শত ছিঁড়ে গেছে এবং যে অংশ বাকি আছে তার অবলম্বনে ছাত্রেরা দটি যেন আবার রচনা করে' দেয়। এরূপ চাতুরি গল্পরচনার রিবেশ-সৃষ্টিতে আগ্রহ আনে।

তাদের লেখা ছবি ও গল্পের বই প্রদর্শনীতে সাজিয়ে শিশুদের এবং দেয়ালপত্রী, মাসিকপত্র প্রভৃতি প্রকাশের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বড়দে রচনাকে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করা যায়।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে ছেলেপিলেরা যা শেখে তা বাস্তবিব কার্যক্রমে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা শেখে বলেই তাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। ছবির বই তৈরি করে' যারা লিখতে শেখে তাদেরও ধারণাশক্তি স্পষ্ট ও ভাষা সবল হয়ে থাকে। এ-ছাড়া রচনা লেখার আগে শিক্ষক ছাত্রের মৌখিক আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লিখবার আগে আলোচনা করলে ছাত্রদের মনের যে ভাবগুলি এলোমেলো ছিল সেগুলি স্পষ্ট ও সংবদ্ধ হয়ে রচনার উৎকর্ষসম্পাদন করে। যারা স্বচ্ছন্দে পড়তে শিখেছে তাদের বই থেকে রচনার বিষয়বস্তুর জ্ঞান আহরণ করতে উৎসাহ দেওয়া যায়। প্রবন্ধরচনার সম্পর্কে এই উপায়গুলির আরো আলোচনা হবে।

রচনাশিক্ষার প্রথম অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্যের চেয়ে ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতার প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখতে হয়। পরিষ্কার করে', বিশুদ্ধভাবে পারম্পর্য রক্ষা করে', যুক্তিসংগতরূপে ভাবপ্রকাশক্ষমতা অর্জন ক আবশ্যক। যেখানে প্রাঞ্জল ও সরলভাবে আত্মপ্রকাশ করাই স্বাভাবি সেখানে কৃত্রিম স্টাইলের প্রচেষ্টা ভাবকে আচ্ছন্ন করে। এই স্তরে গুছিয়ে লিখবার ক্ষমতার বিকাশের সংগে সংগে মানসিক পরিণা এবং বুদ্ধি ও মনীষার অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে। কোনো শি অন্তর্নিহিত সর্জনপ্রতিভার অধিকারী হ'লে তার পূর্বাভাস কখ কখন এই স্তরেই দেখা যায়।

তথাপি, সাধারণভাবে এই স্তরে বিষয়বস্তু প্রধান, রচনারীতি বিশু ও যুক্তিসংগত হলেই হ'ল। ক্রমশ, ভাবকে গুছিয়ে প্রকাশ করা ক্ষমতা মজ্জাগত হয়ে গেলে, ভাষার কারিগরির দিকে দৃষ্টি দেও

যায়। এইবার যে স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত স্টাইলের উদ্ভব হবে তা ভাষাবিশুদ্ধির ও যুক্তিপরতার দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত। এই ভিত্তি না থাকলে ভাষার ছটা বা অলংকারবহুল বাগ্‌বিন্যাসের কোন অর্থ হয় না। অনেক শিক্ষক ছাত্রের লিখনরীতির উৎকর্ষসাধনের জন্য সুললিত বিশিষ্ট ভংগি মুখস্থ করান, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিমভাবে আহৃত অলংকারসম্ভারের স্মৃতিতে ভাষার সৌন্দর্য বাড়েনা, তার সাবলীল গতি ব্যাহত হয় মাত্র। এতে তাদের নিজেদের যে স্বাভাবিক, অনলংকৃত রীতি গড়ে' উঠতে পারতো তার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

ভাষার যে বিশিষ্ট ভংগিগুলি কেবলমাত্র সাধুভাষার অলংকাররূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলি শিখবার কোনো প্রয়োজন নেই, আর দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে যে-সব বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচলিত আছে, যেগুলির দ্বারা জীবনের সত্যকার প্রয়োজন সাধিত হবে, সেগুলি সহজপথেই শিখিয়ে দেওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বাংলার কতকগুলি বিশিষ্ট ভংগির উল্লেখ করা যায়, যেগুলি বাদ দিলে বাংলাভাষার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যেমন,—করে' ফেলা, দিয়ে দেওয়া, নিয়ে নেওয়া, বসে' পড়া, ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়াপদ ; দাঁত-টাত, ঘোড়া-টোড়া, খাবার-দাবার, ইত্যাদি শব্দের দ্বিত্ব ; বাসনপত্র, বাক্সপেঁটরা, ইত্যাদি দ্বিগুণিত বিশেষ্য ; সোনার বাটি, কাঠের খেলনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ষষ্ঠীর ব্যবহার। এইগুলি এবং অনুরূপ আরো অনেক বিশিষ্ট রীতি কণ্ঠস্থ করার পরিবর্তে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সহজে, স্থায়িভাবে শেখানো যায়।

বইয়ের ভাষা বা বিশিষ্ট সুললিত বাগ্‌বিধির মতো নোটবইও ছাত্রেরা মুখস্থ করবে না। বিষয়বস্তুর ধারণায় অস্পষ্টতা বা ভাষার গোড়াপত্তনে দুর্বলতা থাকলে এরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু বইয়ের ভাষা মুখস্থ করলে কত ক্ষতি হয় সেকথা আগে বলা হয়েছে। না জেনে মুখস্থ করার ফলে নিচু ক্লাসের ছেলেদের ভাষা অর্থহীন প্রলাপে

পর্যবসিত হতে পারে আর উঁচু ক্লাসে অন্তত গুরুচণ্ডালী দোষ নিশ্চয় ঘটে।

অপরপক্ষে সাহিত্যিক আদর্শের উপকারিতা প্রভৃত এবং সেই আদর্শের প্রভাব ছাত্রের ওপর ধীরে ধীরে বিস্তারিত হওয়া ভালো। এইজন্য নিচের ক্লাস থেকে একদিকে যেমন ভাষার সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিযুক্ততার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে অপরদিকে তেমনি শিশুকে সুন্দর লিখনরীতির প্রভাবের বশবর্তী করতে হবে। অতি ছোট শিশুর মধ্যেও এই অজ্ঞানকৃত অনুকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। আড়াই বছরের ছেলে যখন বলে "টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ছে" কিংবা চিড়িয়াখানায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করে "মা, বাঘের গায়ে কেন কালো কালো দাগ?" তখন তার হয়তো খেয়াল থাকেনা যে ছেলেভুলোনো ছড়ার সাহিত্যিক ঐশ্বর্য তার আত্মপ্রকাশকে অলংকৃত করছে। এইভাবে যে রীতির সূত্রপাত হবে, বড় বয়সে সাহিত্যসম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে তা স্বাভাবিকভাবে পূর্ণতা লাভ করবে।

সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা লিখনরীতি সুন্দর করার উপায়-বিশেষ। স্বয়ংসঞ্চয়নও এদিকে সাহায্য করে। আমাদের বিদ্যালয় সমূহে এগুলি নিতান্ত অবহেলিত। বিশেষত বড় বড় লেখকদের ভাষার বিশেষত্বগুলির দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। তাদের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়ানো ও শোনানো শিক্ষকদের একান্ত কর্তব্য। উচ্চতম শ্রেণিতে ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনাও আবশ্যক। রচনার সম্পর্কে গদ্যরীতি ও ব্যাকরণের আলোচনায় তাদের নিজস্ব রীতির উৎকর্ষ সাধিত হ'তে পারে।

এ-কথা বলা বাহুল্য যে ছাত্রদের চেষ্টা ও অনুরাগ উদ্রিক্ত না হ'লে চারিদিকের শত সুযোগ সত্ত্বেও লিখনরীতির উন্নতি হবে না। কাজেই ভাষার ব্যবহারক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্য যে-সমস্ত অভ্যাসের দরকার

সেগুলো তাদের নানাপ্রকার খেলা ও প্রতিযোগিতার ছলে করাতে হবে। নিচে কতকগুলি প্রক্রিয়ার কথা দেওয়া হয়েছে, শিক্ষক তার সম্পর্কে নানা প্রতিযোগিতার উদ্ভাবন করতে পারবেন।

ভাষাশিক্ষার প্রথম স্তরে শিশুদের কতকগুলি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ দিয়ে জোড় বাঁধতে বলা যেতে পারে। যেমন, একদিকে লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, উঠছে, বসছে, লিখছে প্রভৃতি, আর অন্যদিকে রাম, পাখি, খোকা, যদু, প্রভৃতি শব্দের তালিকা থেকে বেছে নিয়ে তারা "ব্যাং লাফাচ্ছে", "খোকা চেঁচাচ্ছে", "পাখি উড়ছে", "রাম বসছে", "যদু লিখছে", প্রভৃতি বাক্যরচনা করবে। যদি কোনো শিশু "রাম উড়ছে" বা "পাখি লিখছে" বা অনুরূপ অপপ্রয়োগ করে তবে শ্রেণির সমবেত সমালোচনায় তৎক্ষণাৎ তা সংশোধিত হয়ে যাবার কথা।

এইভাবেই বিশেষ্যবিশেষণের প্রয়োগের অভ্যাস করানো যায়। যেমন, গাছ, বাঘ, কাক, বরফ, কুকুর প্রভৃতি বিশেষণের সংগে ঝাঁকড়া, কালো, ঠাণ্ডা, সবুজ, বড় প্রভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত করে' "সবুজ গাছ," "বড় বাঘ", কালো কাক," "ঠাণ্ডা বরফ", "ঝাঁকড়া কুকুর", প্রভৃতি বাক্যাংশ তৈরি করতে পারে। এগুলিকে উল্টোপাল্টা করে' দিয়ে শিশুর সামঞ্জস্যবোধের পরীক্ষা করা যায়। যেমন একটি শিশুকে বলা হয়েছিল,—"আমি ঠাণ্ডা চা আর গরম আইসক্রিম খাচ্ছিলাম"—সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"দ্যুৎ বোকা! গরম চা আর ঠাণ্ডা আইসক্রিম।"

শূন্যস্থান পূরণের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার বাক্য রচনার অভ্যাস হ'তে পারে ; যথা—"কুকুর—কামড়েছিল", "রাম—মেরেছিল", অথবা —"বেড়াল ইঁদুর—", "কাঠুরে কাঠ—," "ধোপা কাপড়—" ইত্যাদি।

বিশেষণাদি যোগ করে' একেকটি বাক্যকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করানো যায়। যেমন পূর্বলিখিত বাক্যগুলির সংগে একেকবারে একেকটি শব্দ যোগ করে'—"কাঠুরে ভারি কুড়ুল দিয়ে মোটা কাঠ

কাটছিল'', "ধোপা ভাল সাবান দিয়ে রেশমের কাপড় কাচছিল'', "আমাদের পোষা সাদা বেড়ালটা একটা প্রকাণ্ড মেঠো ইঁদুর ধরেছিল" —ইত্যাদিতে পরিণত করা যায়। শিশু একেবারে পূর্ণ সম্প্রসারণটি করতে পারেনা বলেই একাজ তাকে দিয়ে ধাপে ধাপে করাতে হয়। আরেকটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল, যেমন—"এই গাছে ফুল ফোটে" কথাটিকে এইভাবে বাড়ানো যায়,—"এই গাছে শীতকালে ফুল ফোটে"—"এইগাছে শীতকালে লাল ফুল ফোটে",—"এই গাছে শীতকালে অনেক লালফুল ফোটে"—"এই বড় গাছে······" এই বড় গাছে প্রতি শীতকালে···" ইত্যাদি। বাক্যটিকে বাডাবার সময়ে ক্লাসের প্রত্যেক শিশুকে একেকটি করে' শব্দপ্রয়োগ করতে বল্লে তার খেলার মতো আনন্দ পাবে।

এর মধ্যেও উপযোগিতার বিচার হবে ; যেমন "লাল বেড়ালট একটা হলদে ইঁদুর ধরেছিল", বা "কাঠুরে করাত দিয়ে কাঠ কাটছিল' ইত্যাদি অচল।

বাক্যযোজনাও একটা প্রক্রিয়া। "রাম পিঁড়িতে বসে" আ "রাম ভাত খায়" এই দুই বাক্য মিলে হবে "রাম পিঁডিতে বসে' ভা খায়"। "আমি পুকুরের ধারে গেছিলাম" আর 'আমি মাছ ধরে ছিলাম', মিলে হবে—"আমি পুকুরের ধারে গিয়ে মাছ ধরেছিলাম"।

বাক্যপরিবর্তন আরেক প্রকারের অভ্যাস। যেমন শিক্ষক একা শিশুকে আদেশ করলেন—"দরজা বন্ধ কর", তারপর তিনি আরেক জনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি অমুককে কি বল্লাম?" সে উত্ত দেবে—"আপনি অমুককে দরজা বন্ধ করতে বল্লেন।" এরূপ দীর্ঘত অংশ কাগজে লিখে পরিবর্তিত করানো যায়।

গল্পের বচন কাল, পুরুষ ইত্যাদির পরিবর্তন করে' লিখতে ব যায়। যেমন গল্প যদি হয় যে "রামের একটা পোষা কুকুর ছিল এ

:স তাকে এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে পয়সা দিলে দোকান থেকে মিঠাই কিনে আনতো''। এই ভাষার কালগত পরিবর্তন করে' বর্তমানে আনা যায়, পুরুষগত পরিবর্তন করে' ''আমার'' কুকুরের গল্প করা যায়, অথবা "আমার যদি একটা কুকুর থাকতো—" এইভাবে লেখা যায়। বিচক্ষণ শিক্ষক নিজেই অনুরূপ নোতুন নোতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করবেন।

এই ধরনের অভ্যাসের মধ্য দিয়ে প্রয়োগমূলক কার্যিক ব্যাকরণের শিক্ষাও চমৎকার হয়। ওপরের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাকরণের একেকটি বিষয়ের পাঠ নিহিত আছে। এতে খেলার মধ্যে দিয়ে রচনা ও ব্যাকরণ দুয়ের শিক্ষা হয় অথচ চোখের জল পড়েনা।

কবিতা অবলম্বনে গল্পরচনা করানো যায়। এতে কবিতার মধ্যে থেকে মূল কাহিনীটি বেছে নিয়ে প্রকাশ করাতে ভাষার সরলতা ও ভাবের প্রাঞ্জলতার অভ্যাস হয়, অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া কবিতার ভাষার প্রভাবে রচনারীতি সরস হ'তে পারে।

আজকাল পাঠ ও রচনার মধ্যে দিয়ে সর্জনক্ষমতার বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে ছাত্র কোনো সাহিত্যাংশের সম্পর্কে অনুভব-মূলক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে কল্পনালোকে উত্তীর্ণ হ'তে পারে। পড়া গল্পের বা ঐতিহাসিক ঘটনার কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করে' ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কে কোনটি হ'তে চাইত তার আলোচনা লেখানো বা গল্প বা কাব্যের ঘটনাবলিকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করানো যায়।

নিচের ক্লাসেও নানারকম চিত্তাকর্ষক কাজের অবতারণা করানো যায়। তৃতীয় শ্রেণিতে বেড়াল সম্বন্ধে একটি কবিতা পড়ানো হ'ল যাতে বেড়ালের কাছে তার কুঁড়েমি, মাছ চুরিকরা প্রভৃতি দোষ নিয়ে অনুযোগ করা হয়েছে। এরপর প্রথমে ছেলেমেয়েদের বেড়ালের মুখ দিয়ে অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়ে রচনা লিখতে দেওয়া হ'ল। তারপর, তাদের অনেকেরই পোষা পশুপাখি আছে বলে' প্রত্যেককে

নিজের নিজের পোয়ের সংগে অনুরূপ অনুযোগ-প্রতিবাদের কথা নাটকীয় ভংগিতে লিখতে বলা হ'ল। এতে নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্ববিকাশ ও মৌলিক রচনার অভ্যাস দুইই হ'ল।

গল্প লেখা বা রচনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া পরীক্ষার খাতায় কয়েক প্রকারের রচনার প্রশ্নের প্রচলন দেখা যায়: যেমন,—ব্যাখ্যা, সারার্থ (Summary), ভাবার্থ (Substance), ভাবসম্প্রসারণ (amplification), অনুবাদ ইত্যাদি।

পাঠ্যপুস্তক বা কোনো সাহিত্যাংশের উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য দেওয়া হয়। দুয়ের সাধারণ প্রকৃতি এক, তবে পাঠ্যপুস্তক থেকে অংশ তুলে ব্যাখ্যা করতে দিলে লেখকের ও রচনার নাম ও অংশটির পূর্বপরিচয় দিতে হয়। এই পরিচয় (context) আগে দিয়ে তবে মূল ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে ঠিক যতটা পরিচয় দেওয়া দরকার ততটাই দেওয়া এই রীতির আদর্শ। তারপর মূলের বিশ্লেষণের পুংখানুপুংখতার ওপর ব্যাখ্যা অংশের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এর মধ্যে কেবল অর্থ নয় সাহিত্যেতিহাস বা অন্য কোনো বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ (allusion) থাকলে তাও বুঝিয়ে দিতে হয়। অনেকে মূল ব্যাখ্যার মধ্যে সব অংশ নিবদ্ধ করতে না পেরে পাদটীকা সংযুক্ত করে' দেন। অনেক "নোট" বইয়েও এই রীতি দেখানো হয়েছে। কিন্তু এতে ব্যাখ্যার সাহিত্যসৌন্দর্যের হানি হয়; যথেষ্ট নৈপুণ্যের সংগে ব্যাখ্যা করতে পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাদটীকার প্রয়োজন হয়না। নির্বাচনক্ষমতা, যুক্তিযুক্ততা, প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি ক্ষমতার বিচার করার পক্ষে ব্যাখ্যা অংশের মূল্য আছে কিন্তু এই কাজটিতে অপেক্ষাকৃত পরিণত-বুদ্ধির প্রয়োজন বলে' সপ্তম শ্রেণির আগে এর ব্যবহার করা উচিত নয়।

আধুনিকতম শিক্ষাচিন্তায় দুই কারণে মাতৃভাষার শিক্ষার এই পরি-

চয়প্রদানপূর্বক পুংখানুপুংখরূপ ব্যাখ্যার মূল্য অনেকাংশে অস্বীকার করা হয়। প্রথমত,—এরদ্বারা ছাত্রদের সাহিত্যবোধের পরিমাপ করা হয়না আর দ্বিতীয়ত, এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষার অংগীভূত হওয়ায় নোটবুকের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। দুঃখের বিষয় এই যে যতদিন না মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হবেন, ততদিন শিক্ষকের পক্ষে এই কাজ করানো অনিবার্য থাকবে।

সারার্থ ও ভাবার্থপ্রকাশ অনেকটা এক ধরনের কাজ। প্রথমটিতে সমগ্র বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার দিতে হয় আর দ্বিতীয়টিতে মূল ভাবটিকে প্রকাশ করা চাই। সংক্ষেপে, সরলভাবে রচনার অভ্যাস করার পক্ষে এই প্রক্রিয়ার মূল্য থাকলেও এর বিপদ অনেক। প্রথমত, এতে সাহিত্যাংশের সৌন্দর্যহানি হ'তে পারে। শিক্ষক যখন শ্রেণিতে একটি সুন্দর কবিতার রসানুভব করিয়ে তার সারাংশ বোর্ডে তুলে দিতে চান তখন সমগ্র পরিবেশে একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত বৃহৎ অংশকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে অনেক সময়েই বিমূর্তভাবের সৃষ্টি হয় যা উচ্চতম শ্রেণির ভিন্ন ছাত্রদের বয়সোপযোগী নয়। এইজন্য সারাংশ উচ্চতম শ্রেণি ভিন্ন রচনা করতে দেওয়া উচিত নয়, দিলেও এমন অংশ দিতে হয় যার প্রধান প্রধান কথা নির্বাচন করা সহজ এবং তাতে যার সৌন্দর্যহানি ঘটেনা, কিন্তু কবিতার সারাংশ করতে দেওয়া যতদূর সম্ভব বর্জনীয়।

ভাবসম্প্রসারণ অনেকটা প্রবন্ধজাতীয়। এতে নির্ধারিত অংশ অবলম্বন করে' ছাত্র নিজমনের ভাব প্রকাশ করে, বিষয়বহির্ভূত না হ'লে বাইরের কথা এরমধ্যে স্থান পেলে ভাল। এতে এবং ব্যাখ্যায় সম-উক্তি-উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে।

অনুবাদ রচনাশিক্ষার জন্য আবশ্যিক প্রক্রিয়া নয়, এবং যে-সব দেশে বিদ্যালয়ে দুটি ভাষার প্রচলন নেই সেখানে অনুবাদ চলতে

পারেনা। পুরাতন শিক্ষানীতিতে বিদেশি ভাষাশিক্ষার একটি প্রক্রিয়া-রূপে বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলার অনুবাদ ব্যবহৃত হ'ত। সহজ প্রত্যক্ষ পদ্ধতির প্রচলনের ফলে ভাষাশিক্ষার উপায়স্বরূপ অনুবাদ অচল তবে অনুবাদ কেন করা হবে?

অনুবাদের কিছু সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে। বর্তমানযুগে "এক দুনিয়ার" আদর্শে বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদসাহিত্যের স্থান উচ্চ—এই কারণে এর অভ্যাস সাহিত্যানুশীলনের অংগীভূত করা যেতে পারে। ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষা করে' যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করা অনুবাদের আদর্শ; কিন্তু যে অংশের আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব নয় সে-সব অংশের ভাবানুবাদ করতে হয়, প্রবাদবাক্য, বিশিষ্ট বাগ্বিধি প্রভৃতির অনুবাদ যতদূর সম্ভব অনুরূপ বাক্য ও বাগ্বিধির সাহায্যে করতে হবে এবং অনুবাদের ভাষারীতিও মূলের ভাষারীতিকে অনুসরণ করবে

অনুবাদ যে কত অদ্ভুত হ'তে পারে তার আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "শিক্ষা" গ্রন্থে করেছেন। এর বিপদ এড়াবার জন্য অনেকে পুনরনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে পরসাহিত্যপরিচয় ভিন্ন অনুবাদের অপর কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন সে-ক্ষেত্রে উক্ত প্রক্রিয়া অনুবাদের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। বিদেশীয় ভাব ও ভাষার স্বাজাত্যসাধনেই অনুবাদের সার্থকতা এবং সেই কারণে বিদ্যালয়ের সাহিত্যিক অভ্যাসের মধ্য থেকে একে বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

তথাপি যতদিন বিদ্যালয়ে অনুবাদ করানো হচ্ছে, ততদিন শিক্ষক অনুবাদ করাবেন ও সুপদ্ধতির অনুসরণ করবেন। অনুবাদ করার জন্য একটি সহজ ও সরস অংশ নির্বাচন করতে হবে এবং ক্লাসে এটি সাধারণ সাহিত্যাংশের মত প্রশ্নোত্তর দ্বারা আলোচনা করতে হবে ইংরেজি অংশের আলোচনা বাংলাভাষায় করার ফলে ছাত্রদের পক্ষে কঠিন ও অজানা শব্দগুলিও জানা হয়ে যাবে। সাধারণ সাহিত্যাংশের

মতো আলোচনার সংগে বোর্ডে সংক্ষিপ্তসার বাংলায় রচনা করা হবে, উপস্থাপনের শেষে বোর্ডের কাজ মুছে দিয়ে ছেলেদের অনুবাদটি করতে বলা হবে।

প্রবন্ধ রচনা

প্রবন্ধরচনার সাহিত্যিক প্রক্রিয়া উচ্চশ্রেণির উপযোগী হ'লেও তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণি থেকেই সহজ বিষয় নিয়ে ছোটখাট প্রবন্ধ লেখানো যেতে পারে। যে-সব বিষয় ছাত্র জানে, যা লিখতে তার ভাল লাগে, সেই সব বিষয়েই তাকে লিখতে দেওয়া উচিত, কেননা তারই বর্ণনা সে উজ্জ্বলভাবে করতে পারবে।

শিক্ষাতত্ত্বের নিয়মে জানা থেকে অজানায় যাওয়ার যে বিধি আছে তার অনুসরণে অনেকে স্কুলের ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার অথবা গরুঘোড়া প্রভৃতি পরিচিত বস্তু বা জীবজন্তুর বিবরণের ওপর প্রবন্ধ রচনার ভিত্তি-স্থাপন করতে চান এবং 'আকৃতি-প্রকৃতি-প্রাপ্তিস্থান-উপকারিতা-অপ-কারিতা' প্রভৃতি একটা ছকও কেটে দেন। কিন্তু তাতে শিশুমনের সৃজনী শক্তিকে মোটেই অনুপ্রেরিত করা হয়না, বরংচ তাকে পুরাতন কথার পুনরুক্তি করার বিড়ম্বনায় ফেলা হয়।

তার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার কাছে প্রবন্ধরচনার অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক উপাদান। সে হয়তো রাস্তায় দুটি গাড়ির ধাক্কা দেখেছে, হয়তো পাশের বাড়ির ছেলের সংগে তার মারামারি হয়েছে, তার ছোটবোন ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে' গেছে, কিংবা হয়তো ক্লাসের বাগানে তার গাছগুলো সবচেয়ে বেশি সতেজ হয়ে উঠেছে, বা তার তৈরি ছবির বই স্কুলের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এইসব কথা যখন সে প্রচার করার জন্য উন্মুখ ঠিক সেই সময়ে গরুর দু'টি শিং বা ডেস্কের চারটি পায়ের বর্ণনা লেখা তার পক্ষে নিতান্ত নিরুৎসাহজনক। এইজন্য তার প্রথম প্রবন্ধ রচিত হওয়া উচিত চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে। প্রাত্যহিক খবর, ক্লাসের কাজের বিবরণ

প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এরূপ রচনার ভিত্তি কি করে' স্থাপিত হয় তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজের পরিকল্পনা, বিবরণী প্রভৃতির উপলক্ষ্যে চিত্তাকর্ষকভাবে প্রবন্ধরচনার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণিতেও বিষয়নির্বাচনে সমান সাবধানতার প্রয়োজন। সত্যবাদিতা, মহানুভবতা, জীবেদয়া, প্রভৃতি নির্বস্তু ভাব নিয়ে প্রবন্ধরচনা ডেস্ক, বেঞ্চ ইত্যাদি নিয়ে লেখার মতোই নীরস, উপরন্তু এসব সম্বন্ধে বালকদের ধারণা সাধারণত অস্পষ্ট থাকে। তার চেয়ে ভ্রমণেতিহাসের নানা কাহিনী ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের কথা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে দিলে তাদের আগ্রহ বেশি হয়।

যে-সব মামুলি বিষয় বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে, যদি নিতান্তই সেগুলি অবলম্বনে প্রবন্ধ, লেখাতে হয় তবে নোতুনভাবে লেখানো উচিত। যেমন নীচের ক্লাসের ছেলেপিলেকে জীবজন্তুর বিষয়ে সাধারণ প্রবন্ধ না লিখিয়ে তার পোষা কোনো জন্তু বা পাখির কথা লেখানো যায় অথবা ডেস্কের বর্ণনা না করিয়ে তার নিজের ডেস্কটার আত্মকাহিনী লিখতে বলা যায়। ওপরের শ্রেণিতেও গুণ নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার পরিবর্তে বিশেষ ঘটনার বর্ণনায় সেগুলি ফুটিয়ে তোলা যায়। সেগুলির সুযোগ্য উদাহরণসংগ্রহে প্রতিযোগিতার ভাব থাকলে জ্ঞান এবং উৎসাহ দুইই বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রস্তুতিতে রচনারও একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করতে হয়।

প্রথমত,—পরিচিত স্থলে বিষয়বস্তুর ভিত্তি স্থাপন। যেমন স্কুল থেকে ছাত্রদের কোনো কলকারখানা, ঐতিহাসিক স্থান বা চিড়িয়াখানা বা যাদুঘরে বেড়িয়ে আনার পর, অথবা স্থানীয় কোনো বিশেষ ঘটনা, যেমন কোনো সভা বা মেলার অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর সেই বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখানো যেতে পারে। শ্রেণিতে পঠিত অন্যান্য বিষয়ের

জ্ঞান অবলম্বন করে' প্রবন্ধ লেখানো যেতে পারে, যেমন ভূগোলে নদীর বিষয়ে পড়া হবার পর নদীর সম্বন্ধে বা ইতিহাসে কোনো মহাপুরুষের বিষয়ে পড়া হবার পর তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে প্রবন্ধ লেখানো যায়। এ-সব ক্ষেত্রে সাহিত্যের শিক্ষককে সচেষ্টভাবে অন্যান্য শ্রেণির পাঠের সংগে অনুবন্ধ স্থাপিত করতে হবে। আবার কোনো ঋতুর বিষয় নিয়ে রচনা লেখাতে হ'লে সেই ঋতুতে লেখাতে হবে।

দ্বিতীয়ত,—অন্য সকল প্রকার রচনার মতো প্রবন্ধরচনার পূর্বেও নির্দিষ্ট বিষয়ের অবলম্বনে বিস্তারিত মৌখিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। ছাত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুসজ্জিত করা এবং অবচেতন চিন্তাকে চেতনে উত্তীর্ণ করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য। ছেলেরা অনেক কিছু দেখে ও জানে কিন্তু খেয়াল করেনা, আর খেয়াল করলেও গুছিয়ে চিন্তা করেনা। এইজন্য প্রবন্ধরচনার পূর্বে শিক্ষককে ছাত্রের মনকে প্রস্তুত করে' নিতে হয় এবং এই কাজ তিনি প্রশ্নের দ্বারা করেন। তাঁকে এমন বিচক্ষণতার সংগে প্রশ্ন করতে হবে যে অবচেতনসত্তার জ্ঞান চেতনালোক জাগ্রত হবে এবং বিচ্ছিন্ন চিন্তা সজ্জিত হবে। তাঁকে প্রশ্নপরম্পরার দ্বারা প্রবন্ধের কাঠাম তৈরি করতে হয় এবং বোর্ডে লিখে ছাত্রদের ধারণাকে স্পষ্ট করতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক যে ষষ্ঠশ্রেণিতে রেলস্টেশনের সম্বন্ধে রচনা লেখানো হবে। প্রথমে শিক্ষক শ্রেণির ছাত্রদের স্থানীয় স্টেশনে নিয়ে যাবেন। কলিকাতার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের হাওড়া, শিয়ালদ এবং অন্য কোনো ছোট স্টেশন দেখিয়ে আনতে পারেন। এই বেড়ানোর উদ্দেশ্য কেবল আমোদ নয়, আনন্দের সংগে পুংখানুপুংখরূপ পর্যবেক্ষণ। অভাবপক্ষে ছবির বই দেখানো যেতে পারে, কিন্ত বাস্তবিক পর্যবেক্ষণের সমান মূল্যবান কিছুই নয়। তারপর ওই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে ক্লাসে আলোচনা হবে। স্টেশন, রেললাইন

অন্যান্য যন্ত্রপাতি, প্ল্যাটফর্ম, আপিস, গাড়ি ও যাত্রীদের আনাগোনা, কর্মচারী ও তাদের কাজ, রেলপথের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়াংশ-গুলিকে স্পষ্টভাবে আলোচনা করে' প্রবন্ধরূপে সজ্জিত করতে হবে। তেমনি "আমাদের গ্রাম" প্রবন্ধরচনার আগে ছাত্রেরা গ্রামের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে একবার ঘুরে ও "সমাজবন্ধুদের" পরিচয় নিয়ে আসতে পারে। আবার "ভারতের আমদানিরপ্তানির" পটভূমি-স্বরূপে কলিকাতার বন্দর দেখানো যায়।

প্রবন্ধরচনার ক্রমের তৃতীয় কথা এই যে আলোচনার অব্যবহিত-কাল পরেই সেটি লিখতে দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষক ছাত্রের কাছে তার যে সর্বোত্তম প্রয়াস, প্রকাশের ভাষা ও ভংগির যে মার্জিতরূপ আকাংক্ষা করেন তার বিবর্তন সময়সাপেক্ষ। এইজন্য আলোচনা ও লেখার মধ্যে কয়েকদিনের ব্যবধান রাখা শ্রেয়। উপযোগী বই, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির সন্ধান বলে' দিলে ছাত্রেরা এরমধ্যে সেগুলি পড়ে' নেবে এবং এই সময়ের মধ্যে ক্লাসের কোনো বিষয়ের পাঠে সম্পর্কিত প্রসংগের উত্থাপন হ'লে শিক্ষক তার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এইভাবে ছাত্রদের মনের ভাব পরিপক্ক হবে, বিষয়ের ধারণা সুগঠিত হবে এবং প্রবন্ধরচনার দিন তার সমগ্র জ্ঞান সুসজ্জিত ব্যূহবদ্ধ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু এত খেটে, এত সুন্দর করে' প্রবন্ধরচনার মূলে একটা প্রেরণা চাই। প্রবন্ধের বিষয় শুধু ছাত্রের নিজ অভিজ্ঞতার সংগে জড়িত হ'লেই চলবেনা, সেটা লেখার প্রয়োজন তাকে বোধ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থায় এরূপ প্রয়োজনবোধ সহজেই হ'য়ে থাকে। সাধারণভাবে শ্রেণির রচনার মধ্যেও আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে যাতে ছাত্র যেন তার শ্রমকে সার্থক বলে' মনে করে। এক্ষেত্রে আগ্রহ ও সহানুভূতি দিয়ে ছাত্রকে পুরস্কৃত করতে হবে। শিক্ষক

যদি সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি বিদ্যালয়ের বা শ্রেণির পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন, অথবা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের রচয়িতাকে বিষয়টিকে অন্যান্য ছাত্রদের কাছে উপকরণযোগে, চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করার সুযোগ দেন, তবে এরূপ মৌলিক কাজে তারা উৎসাহ পাবে।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা ও আলোচনারীতির জটিলতার তারতম্যানুষায়ী কোন কোন শ্রেণিতে কি কি ধরনের প্রবন্ধ লেখানো যায় তার একটি ধারা নির্দেশ করা সম্ভব। শিশু প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছোটখাট বিষয় নিয়ে অনুচ্ছেদরচনায় অভ্যস্ত হয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণিতে অনুচ্ছেদপরম্পরার রচনায় উত্তীর্ণ হয়। এই সময়কার রচনা গল্পের মতো সহজ, সরস ও বস্তুমূলক ; শ্রেণির কাজ, পোষা পশু-পাখির কথা ; বিদ্যালয়ে পালিত উৎসব ও খেলাধুলো, বাড়ির ঘটনা (যথা নিজের জন্মদিন), আর নানা আমোদপ্রমোদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে তারা গল্পচ্ছলে লিখতে পারে। এই ধরনের বিষয়বস্তুতে ঘটনাবলির একটা সুনির্দিষ্ট ক্রম থাকে বলে' এগুলি নিয়ে প্রবন্ধ লেখা সবচেয়ে সহজ।

ক্রমে বিষয় জটিল হ'তে থাকবে। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র হয়তো দীর্ঘতর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধ লিখবে, আর পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য এমন বিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কয়েকদিনের ঘটনার ক্রমানুযায়ী বিবৃতি অথবা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী ও স্থানসমূহের বর্ণনা, ঋতুবর্ণন প্রভৃতি কিছু জটিলতর কাজ থাকে। আবার হয়তো সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির ছাত্রেরা কোথাও ভ্রমণ করে' এসে তৎস্থানীয় ইতিহাস-ভূগোলের আলোচনা করবে এবং নবম-দশম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রেরা তার সংগে ভূতত্ত্বের জ্ঞানেরও পরিচয় দেবে।

জ্ঞান বা তত্ত্বমূলক প্রবন্ধরচনা বর্ণনামূলক রচনার চেয়ে কঠিন। এইজন্য সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির আগে এই প্রবন্ধরচনা সফল হয় না।

এতে আলোচনা, আহরণ ও সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, বিমানপোতসম্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনায় কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা না থাকলে বিষয়টি নীরস ও নিরর্থক হবে। এই বিষয়কে সম্পূর্ণ করে' তুলতে হ'লে বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং অতীত ও বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতের কিছু কিছু নির্দেশ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রই বিজ্ঞান পড়ে, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যের সংগে বিজ্ঞানের অনুবন্ধের অসুবিধা নেই। বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবম ও তদূর্ধ শ্রেণির ছাত্রদের নিজ নিজ বিষয় শাখার অবলম্বনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখানো যায়।

সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রবন্ধরচনার উচ্চতম বিকাশ। নিচের ক্লাসের উপকারিতা-অপকারিতাবিচারে সমালোচনবৃত্তির ব্যবহার থাকলেও পরিপূর্ণ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধরচনার ক্ষমতা বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণিগুলির আগে আশা করা যায়না। সমালোচনায় যে যুক্তি ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজন তা বালক কেন, পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও কঠিন। এইরূপ প্রবন্ধরচনার সময়ে ছাত্রের মন যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং বিভিন্ন মতের পাঠ ও আলোচনাদ্বারা তাদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে। যেমন, কোনো সাময়িক ঘটনার বর্ণনায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক ঘটনার বিভিন্ন বিবৃতির তুলনা নিরপেক্ষতার খুব ভাল প্রস্তুতি। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট অংশ কেটে নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া যায়। এতে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত, মতামত পরিপক্ক ও দৃষ্টি উদার হয়।

নির্বস্তুক ভাববিষয়েরও উভয়পক্ষদর্শন ছাত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যথা, ভদ্রতা ও বিনয়সম্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনার সময়ে গুণগুলির প্রশংসার সংগে আতিশয্যের দোষও বলতে হবে ; অথবা "অর্থমনর্থম্" এই প্রবন্ধে

পরিমিত অর্থের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে। এই ধরনের প্রবন্ধরচনার প্রস্তুতিস্বরূপ বিতর্কসভার অনুষ্ঠান ধারণা স্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

চিঠিলেখা প্রবন্ধের রূপভেদ। চিঠির প্রকৃতিভেদে এই রচনা ঘটনা বর্ণনা, জ্ঞান বা আলোচনামূলক হ'তে পারে। অনেক ছাত্র প্রবন্ধের সাহিত্যিকরূপ অপেক্ষা পত্রের বিশ্রব্ধতা সহজ মনে করে।

প্রবন্ধরচনার বিষয়ের যেমন মৌলিক ও চিত্তগ্রাহী হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি লিখবার ভংগিও সরস হওয়া চাই। সুলেখকের গুণে যে-কোনো বিষয়ই স্থায়ী সাহিত্যের আসনলাভ করতে পারে, প্রবন্ধও গল্পের মতো মনোরম হ'তে পারে। তাতেই প্রবন্ধরচনার বাস্তবিক উৎকর্ষ। গল্প-লেখার ক্রমবিকাশরূপে প্রবন্ধরচনার অভ্যাস করালে স্বভাবতই ছাত্রের প্রবন্ধে গল্পের সাবলীল ভংগি থাকে তাছাড়া শিক্ষককে সাহিত্যিক পট-ভূমিসর্জনেও তৎপর থাকতে হবে। প্রবন্ধের পাঠ যেন সাধারণ জ্ঞানের পাঠে পর্যবসিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এর উদাহরণ দেওয়া যায়। ষষ্ঠশ্রেণিতে "নদীর আত্মকথা" প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে শিক্ষক বিষয়টিকে চিত্র-মানচিত্রসহযোগে ভূগোলের পাঠে পর্যবসিত করতে পারেন, অথবা ভূগোলের উপকরণগুলিকে কাঠামের মতো ব্যবহার করে' আলোচনাটিকে সাহিত্যলোকে উত্তীর্ণ করতে পারেন। অনুরূপ-ভাবে শরৎকালবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকৃতিপাঠ হবে, না সাহিত্যরচনা হবে তা শিক্ষণের ওপরই নির্ভর করবে। কাব্যবহুল বাংলাসাহিত্যে প্রায় প্রত্যেক বিষয়েরই প্রত্যেক শ্রেণির উপযোগী উদ্ধৃতিসংগ্রহ শিক্ষকের পক্ষে কঠিন হবেনা; প্রবন্ধের প্রস্তুতিসূত্রে উক্তিসংগ্রহের ভার ছাত্রের ওপরও ন্যস্ত করা যায়। অপরপক্ষে দেখতে হবে প্রবন্ধ যেন কাব্যো-চ্ছ্বাসমাত্রে পরিণত না হয়। বস্তুত, ভাবের ঔদার্য ও জ্ঞানের গভীরতার সামঞ্জস্যময় সমন্বয় সাহিত্যরচনার আদর্শ।

অন্যান্য রচনার প্রসংগে লিখনশৈলীর বিষয়ে যা বলা হয়েছে প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য। এইজন্য সর্বপ্রথমে বিষয়ের আলোচনার ক্রম ও ধারাবাহিকতার রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, বিষয়ের অংশগুলি যেন যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত হয়, এক অংশের আলোচনা সম্পূর্ণ না করে' অন্য অংশ আরম্ভ না করা হয়, বিষয়ের অংশ থেকে অংশান্তরে যাবার সময়ে ভাষা যেন খাপছাড়া না হয়, নোতুন অনুচ্ছেদ আরম্ভ করার সময়ে পূর্বানুচ্ছেদের সংগে ভাবের যোগ ছিন্ন না হয় ইত্যাদি।

তারপর ভাষার সৌন্দর্য। প্রকাশভংগির সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিযুক্ততাই প্রবন্ধরচনার প্রথম প্রয়োজন, তারই দৃঢ়ভিত্তিতে রীতির সৌন্দর্য ও সরসতা আশ্রয় পাবে। এই রীতি ছাত্রের স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত রীতি হওয়া চাই। শিক্ষক বা সাহিত্যিকের প্রকাশভংগির প্রভাব তার ওপর নিশ্চয়ই পড়বে—কিন্তু মুখস্থকরা, কৃত্রিম, অনুকৃত রীতির চেষ্টা সে করবেনা।

ভাষা ও সাহিত্য

মনোগঠনের, জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়লাভের এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসাস্বাদ ও বিচারের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন ছাড়াও ভাষাশিক্ষার উপাদান সাহিত্য আর সাহিত্যের বাহন ভাষা। ভাষাবিশুদ্ধির নিয়মাবলি ব্যাকরণে নিবদ্ধ আর সাহিত্যের কারুকার্য, রীতিনীতির কথা পাওয়া যায় অলংকার ও ছন্দের শাস্ত্রে।

শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তার বাংলাশিক্ষা বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারশিক্ষা। এই শিক্ষা সে কথাবার্তা, খেলা ও কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে পায়। ভাষার এই ব্যাবহারিক শিক্ষার সংগে "পুস্তকহীন" শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং ভাষাশিক্ষার প্রথম স্তরে সাহিত্যের প্রয়োজন নেই এমন একটি অভিমতও গড়ে' উঠেছে। কিন্তু শিশুর কাছে ভাষার প্রয়োজন শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত যন্ত্রমাত্র বলে' নয়, তার সাহিত্যের তাগিদ আদিম ও প্রাথমিক রসানুভূতির প্রেরণায়। ভাষাশিক্ষার প্রথমাবস্থায় সাহিত্যবোধ হয়না বলে' মনে করাও ভুল, কেননা, ভাষার সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হ'লেও সাহিত্যের সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে বর্ণনা করেছেন যে তিনি অতি অল্পবয়সে সংস্কৃত কাব্যের অর্থ না বুঝেও পড়তে ভালবাসতেন এবং উপনয়নের সময়ে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্বনিতে অভিভূত হয়ে অশ্রুপাত করেছিলেন। সাহিত্যবোধ শিশুমনে অন্তর্নিহিত।

অল্পবয়সী ছেলেদের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত ছেলেভুলোনো ছড়া সাহিত্যমূল্যে সমৃদ্ধ। জীবনের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই শিশু ছড়ার আবৃত্তি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন যে যেদিন তিনি প্রথম পড়েছিলেন—"জল পড়ে, পাতা নড়ে" সেদিন সারাদিন ধরে ওই দুই সমিল ছত্রের মন্ত্র তাঁর মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে

ফিরেছিল। ছেলেভুলোনো ছড়ার উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আর "সহজপাঠ" বইগুলিতে গদ্যে পদ্যে শিশুমনের ধ্বনি ও রসের তৃষ্ণা মেটাবার প্রচুর আয়োজন রেখে গেছেন।

এইজন্য শিক্ষার প্রথম স্তরে ব্যবহারদ্বারা ভাষাশিক্ষা হ'লেও তার পাশাপাশি নিরংকুশ সাহিত্যপাঠ শিক্ষাকে সরস, সফল ও গভীর করবে এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। অথচ, আমাদের বিদ্যালয়ে সাহিত্যপাঠ অবহেলিত ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার সংকীর্ণ। সাহিত্যের ইতিহাস এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও পুরোনো সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে এই পাঠ নীরস নাম ও সনতারিখ কণ্ঠস্থ করার পর্যায়ে রয়ে গেছে।

বস্তুত সাহিত্যপাঠ সাহিত্যেরই পাঠ হওয়া চাই, ব্যাকরণ বা ভাষার ব্যবহারমাত্র নয়। শব্দার্থব্যাকরণকণ্টকিত পাঠ্যপাঠ সাহিত্যানুভবের পরিপন্থী একটা প্রক্রিয়া। এইজন্য সাহিত্যপুস্তক পড়াতে গিয়ে শিক্ষক ব্যাকরণের নিয়ম বা শব্দার্থের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেননা, অর্থবোধ ব্যাহত হ'লে নিতান্ত প্রয়োজনীয় আলোচনামাত্র করবেন। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যদি ভাষার ব্যবহারশিক্ষা ও বিশুদ্ধিলাভের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন না থাকে তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যের স্থান কোথায়? উত্তর হবে এই যে সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য-সাধনের উপ-উৎপাদনরূপে ভাষার বিশুদ্ধি ও ব্যাবহারিক উৎকর্ষ অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু সাহিত্যের শ্রেণির পাঠদান হবে তার সাহিত্যিক উদ্দেশ্যকে পুরোভাগে স্থাপিত করে'। তাই উঁচুদরের সাহিত্যের পরিচয়লাভে কেবল ভাষা-শিক্ষার উৎকর্ষ ঘটবেনা, সাহিত্যিক উৎকর্ষের ধারণা এবং আনন্দ ও আগ্রহের সঞ্চার হবে। বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারশিক্ষা আর সাহিত্য-প্রাণস্পৃষ্ট ভাষাশিক্ষার প্রভেদ হ'ল "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" ও "নীরসো তরুবরঃ পুরতো ভাতি"র মতো।

সাহিত্যপাঠ নিচের শ্রেণিতে বিশুদ্ধ আবেগজনিত আনন্দস্বরূপ আর ওপরের শ্রেণিতে অনুভব (appreciation) ও আলোচনার পর্যায়ে স্থাপিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহিত্যালোচনার মধ্যে সমালোচনার চেয়ে অনুভবের প্রাধান্য, অথবা অনুভব থেকে সমালোচনায় তার গতি। কেননা, বালক যখন তাব পঠিত সাহিত্যকে যাচিয়ে নিতে চায় তখন তাব অপরিণত বিচারশক্তি ও সাহিত্যবুদ্ধি দিয়ে মহৎ সাহিত্যের আলোচনা কঠিন হ'লেও রসানুভব সম্ভব।

অনুভব মানবমনের স্বাভাবিক আদিবৃত্তি। প্রথম আর্য যখন জলে-স্থলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে দেবতার সন্ধান পেয়েছিল তখন তারমধ্যে যুক্তিতর্ক, বিচার প্রভৃতির চেয়ে অনুভূতিব বোধই প্রধান ছিল ; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা তারপর। সাহিত্যের অর্থের আগে অনুভব শিশুর ওপর প্রভাব বিস্তাব করে। এইজন্য ছেলেভুলোনো ছড়ার বিষয়বস্তু চেতনার স্তবে অসংবদ্ধ হ'লেও শিশুর মনোরাজ্যে পবম বিস্ময়কব সত্যস্বরূপ। ওই অনুভূতির ধারা বেয়ে সাহিত্যানুভবের সোপানে সোপানে সে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পাদপীঠতলে উপনীত হবে।

সাহিত্যানুভব যুক্তিতর্কদ্বারা প্রামাণ্য নয়, শিক্ষকের গভীর অনুরক্তি প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালার মতো হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এইরূপ সঞ্চার সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে কঠিন, কিন্তু শিশুসাহিত্যবিষয়ে কঠিনতম ; কেননা এমন শিক্ষক দুর্লভ যিনি পূর্ণবয়সের পরিপক্বতাকে অতিক্রম করে' শিশুর মনোরাজ্যে সমান অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে অবতীর্ণ হ'তে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে অনুভবের জন্য অর্থবোধের প্রয়োজন প্রধান নয়, কেননা,—"জগতে না বুঝিয়া পাইবার রাস্তা সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড রাস্তা"। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝে পড়াকে তিনি "শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ" খতানোর মতো বলেছেন এবং সংসারের পাড়ার

হাটবাজারের সংগে তুলনা করেছেন। অনুভবকে তিনি সমুদ্রের তীরে বা পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে মানবমনের অপার মহিমাবোধের সংগে তুলনা করেছেন।

সাহিত্যোপভোগের ক্ষেত্রে রুচিবৈচিত্র্য দেখা যায়। ছোটবেলার রূপকথার গল্প থেকে আরম্ভ করে' পাঠরুচির বিভিন্নতা অনুযায়ী রহস্যোপন্যাস, প্রণয়কাহিনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দুঃসাহসিক অভিযান, সাময়িক গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রভৃতির বিচিত্রপথে প্রবাহিত হয়। কেবল গল্প, কবিতা ও নাটক নয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাতে প্রবন্ধ, ভ্রমণ, জীবনী, সমালোচনা ও নানা জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়ে সাহিত্যশিক্ষক তার ব্যবস্থা করবেন। পূর্ণাংগ সাহিত্য ভিন্ন যে পরিপূর্ণ চরিত্রের গঠন সম্ভব নয়, এই কথা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর "জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। আমাদের বালকদের অল্পবয়স থেকে সেই পূর্ণাবয়ব সাহিত্যের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার বাংলার শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সাহিত্যের সংগে যোগস্থাপনের তীর্থ। শিক্ষক সেখানে পূর্ণ সফলতালাভে ছাত্রদের সাহায্য করেন। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির আলাদা পুস্তক-সংগ্রহ থাকে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয় ছাত্রেরা। এতে বই-গুলির যত্ন করে' এবং সেগুলি সহজে হাতে পেয়ে তাদের দায়িত্বজ্ঞান এবং সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ ও ইচ্ছা বাড়ে। আজকালকার "খোলা-তাক" গ্রন্থাগারের রীতি পাঠের ইচ্ছা বাড়ায় ও চরিত্রগঠন করে।

শিক্ষককে শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে হবে এবং ছোটদের উপযোগী সাহিত্যের আধুনিকতম পরিণতির সংগে পরিচয় রেখে ক্রমাগত বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিদ্যা-লয়ের গ্রন্থাগার যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হ'লে পুস্তকসংগ্রহের অন্যান্য উপায়

অবলম্বন করতে হবে। ছাত্রীরা নিজেদের বই বদল করে' পড়তে পারবে অথবা চাঁদা এবং দান সংগ্রহ করে' ছোটখাট পুস্তকসংগ্রহ গড়ে' তুলবে। পাঠ্যবহির্ভূত পাঠের জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির সংগেও যোগাযোগ চাই। সাধারণ পাঠাগারের সংগে যোগের মধ্যে দিয়ে পাঠের অভ্যাসের সংগে সমাজবোধও জাগ্রত হবে।

ছাত্রদের পাঠের সহায়তা ও তত্ত্বাবধান শিক্ষককে করতে হবে। তিনি ছাত্রদের পড়া বইয়ের সমালোচনা লিখিয়ে সেগুলি শ্রেণিতে পড়িয়ে বা বিদ্যালয়পত্রিকায় প্রকাশিত করে' তাদের উৎসাহ দেবেন। এই সম্পর্কে অভিনয়, আবৃত্তি, তর্ক ও আলোচনাসভা প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান করা হবে। শ্রেণির ও স্বাধীনপাঠের নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে এ-সমস্ত কাজ সম্ভব না হ'লে বিদ্যালয়ের সাহিত্যসমিতিগুলির ওপরও অনেকাংশের ভার দেওয়া যায়।

ছাত্রদের সাহিত্যপাঠের উপযোগী মনোবৃত্তি গঠন করা শিক্ষকের দায়িত্ব। বিশেষত আজকাল বহুলপ্রচারিত রোমাঞ্চসাহিত্যের ও শিশুসাহিত্যনামে প্রচারিত খোকামির হাত এড়াবার মতো সাহিত্য-বোধ যেন এদের মধ্যে তিনি জাগাতে পারেন। ছেলেপিলেরা বাস্তবিক সাহিত্যের আস্বাদ পেলে ওই জোলো, খেলো, মোদো জিনিসের পেছনে যায়না। এই রুচি শিক্ষক সৃষ্টি করবেন।

সাহিত্যের ইতিহাসের সংগে পরিচয় সাহিত্যানুভবের অপর অংগ। নদীর মতো বহমান সাহিত্যের ধারার মধ্যে মানবহৃদয়ের সংগে তার নিগূঢ় যোগ সাধিত হয়। আজকাল বিদ্যালয়ের উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণির বাংলাভাষার পাঠ্যতালিকার মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস স্থান পেয়েছে বলে' শিক্ষক স্বচেষ্টায় অনেকাংশে এই অভাব পূর্ণ করতে পারবেন।

এরপর ব্যাকরণের কথা। ব্যাকরণ ভাষার মেরুদণ্ড হ'লেও

াষাশিক্ষার উপায় হ'তে পারেনা। সকল শিল্পেরই যেমন মূলীভূত জ্ঞান থাকে ব্যাকরণ তেমন সাহিত্যকলার মূলীভূত বিজ্ঞান। ্যাকরণের কাজ "অদ্রিতলে শিলা"র মতো ভাষার অন্তরালে থেকে াকে বিশুদ্ধ করে' সাহিত্যের উপযোগী করা।

উপযুক্তভাবে পরিবেশন করলে এই বিষয়টি ছেলেদের ভাল লাগে। ারা সজীব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তার বৌদ্ধিক যন্ত্ররূপের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই ়শ্লেষণলমূক আগ্রহ ভাষাজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক।

শিক্ষাপদ্ধতির ওপর ব্যাকরণশিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। ভাষার ্ভবের সময়ে মানুষ সচেতনভাবে নিয়ম তৈরি করে' কথা বলতে ারম্ভ করেনি, প্রাকৃতিক নিয়মে বিবর্তিত বিশেষত্বগুলিকে বিধিবদ্ধ ের' তার সূত্র গাঁথা হয়েছে। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে ভাষা ব্যাকরণের সেই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ে নিম্নতম শ্রেণি থেকে ব্যাকরণের পাঠ শুরু হয় না, কিন্তু বহার-বিশুদ্ধির শিক্ষা পাঠ ও রচনাশিক্ষার প্রথম থেকেই দিয়ে দিতে ়। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণিতে ধীরে ধীরে কার্যিকভাবে পাঠ্যসম্পর্কে াত্রেরা ব্যাকরণের সংগে পরিচিত হ'তে থাকে। একে ব্যাবহারিক াকরণজ্ঞান বলা যায়। দৈনন্দিন কথাবার্তা আর পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ই পাঠের উপজীব্য ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ এর উপকরণ। ই জ্ঞান তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পর্যবেক্ষণদ্বারা শিক্ষকের হায়তায় অর্জন করবে। সহজ ও প্রত্যক্ষের অবলম্বনে আরোহ-দ্ধতিতে তারা শিখবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সাধারণ পাঠ ও আলোচনার মধ্যে থকে শিক্ষক হয়তো পদের শ্রেণিবিভাগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। হাট ছেলেপিলেরা নিজেরাই লক্ষ্য করতে পারবে যে এদের মধ্যে

কতকগুলি নাম বোঝায়, কতকগুলি কাজ বোঝায়, কতকগুলি বোঝায়, কতকগুলি অন্যের বদলে বসে, কতকগুলি দুয়ের মধ্যে যো স্থাপন করে ইত্যাদি। এখনই এদের নাম জানবার দরকার নেই, কে খেলার মধ্যে দিয়ে এদের প্রকৃতি-গত বিশেষত্বগুলির কথা জে রাখবে। নিত্যব্যবহৃত কথাবার্তায় ও পাঠ্যপুস্তকে পঠিত শব্দসম্ভা বাক্যগঠন প্রভৃতির বিশ্লেষণ ও সেগুলিকে নিয়ে অভ্যাসমূলক কা মধ্যে দিয়ে এদের শিক্ষা চলবে। রচনাশিক্ষার প্রসংগে যে-সব প্রক্রিয় কথা বলা হয়েছে সেগুলিব ওপরই ব্যাকরণজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হ

ছেলেরা ছবি ও লেখা মিলিয়ে চিত্রকল্প (চার্ট) তৈরি কর পারে। যেমন একেকটা বড কাগজে বড বড অক্ষরে কতকগু কবে' বাক্য লিখলো, তারমধ্যে যে-যে শ্রেণির পদের দৃষ্টি আক করতে চাওয়া হচ্ছে সেগুলি কোনো বিশেষ রঙে লিখতে হবে এ ছবির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। শ্রেণির ছেলেদের নাম, কাজ, আসবাবপত্রের অবস্থান, পারস্পরিক সম্বন্ধসমূহ ইত্যা উদাহরণের সাহায্যে এই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে বা করতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন পদের বিভিন্ন চার্ট হবে আর বো লিখে আলোচনার সময়েও রঙিন খডির ব্যবহারদ্বারা উদাহরণগুলি উজ্জ্বল করা হবে।

শিশু যেমন বাক্যের গঠনের সঙ্গে পরিচিত হবে তেমনি সে নি বুঝতে পারবে যে শব্দের বিশেষ সমষ্টিতে অর্থবোধ হয় এবং তার বিশেষ বিশেষ শ্রেণির পদ ও প্রত্যয় থাকে। চিত্রকল্পে প্রদর্শি বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদ বিভিন্ন রঙে লিখলে শিশুর প্রত্যক্ষজ্ঞ উজ্জ্বলতর হবে। তারপর সে বাক্যরচনা ও সন্নিবেশের নানা বিশে লক্ষ্য করতে পারবে। এরজন্যও প্রত্যক্ষের অবলম্বনে ব্যাবহারি পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে।

প্রশ্নদ্বারা বাক্যবিশ্লেষণ করা যায়, যেমন "সুব্রত অমিতাভকে ইটা দিয়েছে" এই বাক্যটাকে নিয়ে কে, কি করেছে, কাকে করেছে, ক নিয়ে করেছে প্রভৃতি প্রশ্ন করা যেতে পারে। শ্রেণির ছেলে-গলেদের নাম আর কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করলে ধারণা স্পষ্ট ওয়ার দরুন ভুলের সম্ভাবনা কম হয়। এই স্তরে ব্যাকরণের সংজ্ঞা লার দরকার নেই।

ভাষার কার্যিক ও ব্যাবহারিক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কিছুদূর গ্রসর হ'লে সরাসরি ব্যাকরণের পাঠের সূত্রপাত হয়। এই কাজ াধারণত পঞ্চম শ্রেণি থেকে হয়ে থাকে। এখন থেকে ব্যাকরণের গান ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে পরিচালিত করা যেতে পারে, কিন্তু যাতে াত্রের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বহির্ভূত কোনো শিক্ষা না দেওয়া হয় সে বিষয়ে াবধান থাকতে হবে। জ্ঞান আয়ত্ত করা হবে আরোহপদ্ধতিতে। হলেদের সামনে উদাহরণের পর উদাহরণ তুলে ধরতে হবে শব্দের র শব্দ, বাক্যের পর বাক্য ভেঙে ভেঙে দেখাতে হবে, এলোমেলো ল্টোপাল্টা ভাষাকে সোজা করে' সাজাবার অভ্যাস করতে হবে। াঠ্যপুস্তক থেকে ব্যাকরণের উদাহরণগুলি সংগ্রহ করতে হবে' কিন্তু া সাহিত্যপাঠের ঘণ্টায় নয়। রচনার জন্য নির্দিষ্ট পাঠে যে নানা ক্রিয়ার দ্বারা ভাষার ব্যবহারের অভ্যাস চলে তার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক থকে উদ্ধৃত শব্দ বাক্যাদির উদাহরণ সংযুক্ত করে' ব্যাকরণের সঙ্গে নুবন্ধ সাধিত হবে। সমস্তই পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল নাম । সংজ্ঞাগুলি নোতুন। নামের অর্থ যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দিলে সেগুলি নে রাখতে ছেলেদের অসুবিধা হবেনা, তাছাড়া, প্রথম থেকে নাম নে রাখার জন্য জোর করার দরকার নেই, সে-কাজ ধীরে ধীরে, ভ্যাসের দ্বারা হবে।

এই সময়ের ব্যাকরণের আলোচনা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানিক স্তরে

উন্নীত হ'লেও ব্যাবহারিক শিক্ষার পর্যায়েই পড়ে। নিচের শ্রেণি মতো ব্যবহারজাত অভিজ্ঞতাকে আরোহপদ্ধতির দ্বারা আলোচনা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বিশেষ (উদাহরণ) থেকে সাধারণে (সূত্র উত্তীর্ণ হবে। এটাই জ্ঞানার্জনের মনোবিজ্ঞানসম্মত পথ ও মানু আবিষ্কার ও জ্ঞানলাভের উপায়।

এই পদ্ধতিতে উদাহরণগুলির পর্যবেক্ষণদ্বারা শিক্ষকের সাহা সংজ্ঞাগুলি মোটামুটিভাবে ছেলেরাই গড়বে, শিক্ষক সেগুলিকে মার্জি ও সংশোধিত করে' দেবেন। যেমন বিশেষ্যের পরিচয় কথায় ও পড় বারবার লাভ করে' ছাত্রেরা নিজেরাই একটা শাদাসিধে বিবরণ দি পারবে যে বস্তু, ব্যক্তি, গুণ ইত্যাদির নামকে বিশেষ্য বলা যায়, প শিক্ষকের সাহায্যে মার্জিত হ'য়ে সেটাই পূর্ণসংজ্ঞায় পরিণত হ সংজ্ঞাগঠনে ভুল হ'লে শিক্ষক উদাহরণ ও ব্যাবহারিক অভিজ্ঞত সাহায্যে কারণপ্রদর্শনসহ সংশোধন করবেন।

উঁচু ক্লাসেও এই পদ্ধতির অনুসরণ করে' শেখানো হ'লে ছ ব্যাকরণবিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পাবে। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত চিত্রকল্প, কালোপট ও উদাহরণের সাহায্যে ছাত্র অভিজ্ঞতার অবলম্বনে ব্যাকরণশিক্ষা সম্ভব। যে-কোনো বিষয়েই হো না-কেন, প্রচুর উদাহরণ সংগ্রহ করে' তারমধ্যে থেকে ছাত্রদের দি বিষয়টিকে আবিষ্কার করিয়ে নিতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে উদ্যোগিত ভাব জাগিয়ে তাদের ওপর উদাহরণসংগ্রহ, চিত্রকল্প প্রস্তুত করা, লেখা প্রভৃতির ভার দিলে ভবিষ্যতের গবেষণাকারীদের হাতেখড়ি যাবে। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের ব্যাকরণের জ্ঞান এতটা অগ্র হবে যে তারা স্বানুষ্ঠিতভাবে তার বৈজ্ঞানিক চর্চা করতে পারবে।

উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিশিষ্ট বাগ্‌বিধির কথা বলা যেতে পা শিক্ষকের ইংগিতে ছাত্রেরা তাদের পরিচিত বাগ্‌বিধির উদাহরণ সং

করবে। তারপর সাহিত্যাংশ থেকে উদ্ধৃত বা নিজেদের রচিত বাক্যের মধ্যে ওই উদাহরণগুলি দিয়ে তারা নিজেরাই চিত্রকল্প তৈরী করবে। এতে বাক্যের অন্যান্য অংশ কালো ও বাগ্‌বিধিটুকু রঙিন কালিতে লিখলে ওই অংশ তাদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলবে। বিশেষ বিধিগুলির অন্তর্নিহিত ভাব তারা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে অথবা সবাক বা অবাক হেঁয়ালিনাট্যের খেলায় ধাঁধার মতো পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার অভ্যাস হবে।

বস্তুত এই পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই কষ্ট করে' বহু উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং শিক্ষককে ধৈর্যের সঙ্গে ছাত্রের নিজের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে; এতে সময় বেশি লাগবে, কিন্তু শিক্ষা গভীর, স্পষ্ট ও নির্ভুল হবে এবং ভাষাসম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সাধনার মনোবৃত্তি গড়ে' উঠবে।

ব্যাকরণের শিক্ষা দেওয়ার সময়ে বাংলার প্রাকৃতপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বাংলাভাষা হুবহু সংস্কৃতের অনুগামী নয় বলে' একেবারে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের নিয়মানুযায়ী বাংলা ব্যাকরণ পড়ানো যেতে পারেনা। যেমন, বাংলা সন্ধির থেকে সংস্কৃত সন্ধির প্রধান পার্থক্য এই যে অন্য কোনো কারণ না থাকলে বাংলায় সন্নিহিতপদে সন্ধি হয় না; কিন্তু সংস্কৃতে নিত্যই হয়। তাছাড়া, কারক, বিভক্তি, সমাস প্রত্যয়, বাগ্বিধি প্রভৃতি যা-ই শেখানো যাক-না-কেন, কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও উদাহরণমালা দিলে চলবে না, খাঁটি বাংলা ও প্রাকৃত শব্দ থেকেও উদাহরণ দিয়ে সূত্রের সৃষ্টি করতে হবে। আজ-কাল সে প্রায় সব ব্যাকরণের বইয়েই এ দিকে অল্পবিস্তর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এটা সুখের কথা, কিন্তু এখনও প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন আছে।

ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক যে কণ্ঠস্থ করার বস্তু নয় সে-কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। ছাত্রদের পড়ার জন্য একটি বই নির্দিষ্ট না করে' দিয়ে,

শিক্ষক ও ছাত্রের সংগৃহীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অবলম্বনে হাতেলেখা বই তৈরি করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। শিক্ষক নিজে উচ্চমানের বই ব্যবহার করবেন এবং একটা বইয়ের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একাধিক বইয়ের সাহায্য নেবেন।

অনেকে বলেন ছাত্রদের ব্যাবহারিক জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর মানে ব্যাকরণ পড়ানো উচিত নয়। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ অবশ্যম্ভাবী এবং সমাধান বহু আলোচনা ও সময়সাপেক্ষ। যতদিন শিক্ষাকর্তৃপক্ষ অন্য কোনো মীমাংসা না করবেন ততদিন ব্যাকরণ পড়াতে হবে এবং উচ্চতম শ্রেণিতে কিছুটা বিধিবদ্ধ পুঁথিগত জ্ঞানদানের প্রয়োজন হবে।

এ-সম্পর্কে একথা মনে রাখা চাই যে বিদেশিভাষার ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহারের সংগে পরিচিত হওয়াই যথেষ্ট, মাতৃভাষায় সে-রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; বিশেষত যখন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের ফলে শিক্ষা-শেষের বয়স ১৬+ কি ১৭+ নির্ধারিত এবং এই শিক্ষাই অধিকাংশের সাধারণশিক্ষার শেষমাত্রা বলে' ধার্য করা হয়েছে তখন বিদ্যালয় ত্যাগের পূর্বে ছাত্রদের মাতৃভাষার কিছুটা গভীর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। অপরপক্ষে বর্তমানে বিদ্যালয়ের শেষ বহিঃপরীক্ষার জন্য যেরূপ সূত্র-নীতিকণ্টকিত বিরাট পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে তার পরিবর্তে সূত্রের চেয়ে প্রয়োগের প্রাধান্য দিয়ে নোতুন পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা যে উচিত তাতে সন্দেহ নেই।

কিছুদিন আগে বাংলার শিক্ষিকাদের একটি সম্মেলনে নিম্নলিখিত পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছিল :—

শ্রেণি	বিষয়
পঞ্চম-ষষ্ঠ :—	বাক্য, পদপ্রকরণ, বিভক্তি, কারক, সন্ধি, লিঙ্গ বচন ষত্ব-ণত্ববিধি।

সপ্তম-অষ্টম :—পদপ্রকরণ, বিভক্তি, কারক, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় ধাত্বর্থ ও ব্যবহার, বাচ্য, বাগ্‌বিধি।

নবম-দশম :— শব্দ ও ধাতুরূপ, সরল-জটিল যৌগিক বাক্য, বাচ্য, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, অলংকার, শব্দসম্ভার, পরিভাষা।

একাদশ :— সামগ্রিক পুনঃ পঠন।

ব্যাকরণের পৃথক আলোচনার ফলে ব্যাকরণকে সাহিত্য থেকে আলাদা জিনিস বলে' ছাত্রদের যেন ধারণা না হয়। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাব্যাপারে যেমন প্রত্যেক বিষয়ের অনুবন্ধসাধনকে শিক্ষা-নীতির আধুনিকতম আদর্শের অংগীভূত করা হয়েছে, তেমনি ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণের পারস্পরিক সম্বন্ধবিষয়ে সে-কথা আরো বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক ও রচনা বিভিন্ন ঘণ্টায় পড়ানো হ'লেও শিক্ষককে এদের সংযোগসূত্রের প্রতি সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ক্রমাগত পাঠ্য সাহিত্যাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে এদের অংগাংগিসম্বন্ধের কথা উদ্ঘাটিত করতে হবে।

সর্বশেষে, প্রশ্ন করা হয় যে এই সমস্ত বিষয়ের কতটা জ্ঞান শিক্ষকের থাকবে এবং ছাত্রদের তিনি কতটা দেবেন। আলোচনাক্রমে বলা হয়েছে কেমন করে' ভাষাবিশুদ্ধির অভ্যাস থেকে আরম্ভ করে' ব্যাবহারিক ব্যাকরণশিক্ষার মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণিতে ব্যবহারের পর্যায়েই কিছু পুঁথিগত জ্ঞান ছাত্রেরা অর্জন করবে। শিক্ষকের সম্বন্ধে বলা যায় যে ছাত্রদের চেয়ে তাঁর বেশি জ্ঞান থাকবে।

প্রথমত নিচের শ্রেণির কথা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাংলা ব্যাকরণের বেশ ভালো একটা সাধারণ-জ্ঞান লাভ হয়ে যায় বলে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াবার জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকই যথেষ্ট।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ পড়াবার জন্য সাধার স্নাতক পরীক্ষোত্তীর্ণ ও শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক উপযুক্ত কিন্তু উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণিগুলির শিক্ষকের জন্য আরেকটু অধিক জ্ঞা প্রয়োজনীয়। এইসব শ্রেণিতে বাংলা ব্যাকরণের সাধারণ অং ছাড়াও অলংকার পাঠ্য থাকে। অলংকার বি-এ পরীক্ষায় সাধার বাংলার পাঠ্যক্রমে থাকে না এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ বাংলা ব সম্মানসহ বাংলা পড়ার। তাছাড়া এই স্তরের ব্যাকরণে বাংলাভাষা শব্দসম্ভারের শ্রেণিবিভাগের বিষয়ে পড়তে হয়, এটা পড়াবার জ ভাষাতত্ত্বের যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা সাধারণ বাংলার পাঠ্যে নেই ছন্দের বিষয়েও কয়েকটি কথা বলা যায়। যদিও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমে ছন্দের বিষয়ে পড়ার বাধ্যতা নেই তবু কাব্যের সরবপাঠে সময়ে ছন্দের ব্যবহার অনিবার্য বলে' বিদ্যালয়ের অন্তত ওপরের শ্রেণি শিক্ষকদের এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই। শিক্ষক এই বিষ বিশেষ বা সম্মানসহ বাংলার পাঠে শিখে আসবেন, ছাত্রদের এই পুঁথিগত জ্ঞান তিনি শেখাবেননা কিন্তু পাঠের মধ্যে ছন্দের দোলা ফুটিয়ে তোলার মতো ব্যাবহারিক জ্ঞান দিয়ে কবিতা পড়ার সু-অভ্যাস গঠন করাবেন।

আরেকটা প্রশ্ন হ'ল এই যে বাংলা পড়ানোর জন্য সংস্কৃতের জ্ঞান আবশ্যক কিনা। যথেষ্ট গভীরভাবে স্কুলকলেজের বিভিন্ন স্তরে বাংলার জ্ঞান অর্জন করা হ'লে এ প্রয়োজন হবার কথা নয়, কিন্তু আজকের বাংলা পড়ানো ব্যাপক হ'লেও এত অগভীর ও মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল বলে অনেকের মনে এই ধারণা হওয়া সম্ভব। অপরপক্ষে যাঁর সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান আছে এমন শিক্ষক যখন বাংলা পড়াবেন তখন তিনি যেন বাংলাভাষার স্বপ্রকৃতি নষ্ট করে' তাকে সংস্কৃতের আওতায় নিয়ে না ফেলেন সে-বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

পাঠ্যক্রম

শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর সব দেশেরই সভ্যতার প্রথম দিকে ধর্মযাজকদের ধর্মসাধনের উপাদান, অভিজাত অলংকরণ ও সাধারণ্যের কর্মপ্রস্তুতির উপায়স্বরূপ আরম্ভ হয়ে যুগে যুগে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য গৃহীত হয়ে এসেছে। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের শিক্ষায় এর একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

তারপর যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের সংগে যেমন জীবনে তেমনি শিক্ষায়ও প্রয়োজনের দিকটা বড় হয়ে উঠতে থাকে। ভারতেও বৃটিশ কোম্পানির শাসনের শতবর্ষপূর্তির কাছাকাছি সময়ে রচিত উডের প্রস্তাবে গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্যদ্বারা দেশের সমৃদ্ধিসাধনের উদ্দেশ্যে "প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী" শিক্ষার কথা লেখা হয়েছে। এর পাশাপাশি ইউরোপীয় সংযমনমূলক শিক্ষাদর্শের প্রভাবে এই বিশ্বাস প্রচলিত হয় যে শিক্ষণীয় বিশেষ বিশেষ বিষয় মানবচরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক বিকশিত করে, যেমন অংকের শিক্ষা কেবল যে পরবর্তী জীবনের হিসেবরাখার কাজেরই সুবিধা করে তা নয়, এরদ্বারা মানুষের মনে নির্বস্তুক ধারণাভাবনার শক্তিও জন্মায়, ব্যাকরণ কেবল বিশুদ্ধ ভাষা-ব্যবহারের ক্ষমতা দেয় না, মনকেও শৃংখলাবদ্ধ করে।

ভারতে বৃটিশ আমলের ইংরেজিশিক্ষার মূলে প্রথমে এই প্রয়োজনের দিকটাই দেখা যায়। সমৃদ্ধ, শক্তিশালী শাসকসম্প্রদায়ের ভাষা শিখে চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে' ভারতবাসীরা, আগে যেমন আরবীফার্সী শিখতো তেমনি, ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেছিল। ক্রমশ পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত দেশনেতারা দেখলেন যে অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবনের ফলেই ইউরোপের এত উন্নতি হয়েছে, এবং সেইসব বিষয়েরও চর্চা করতে চাইলেন অনুরূপ

উন্নতির আশায়। শিক্ষা বেশ ছড়িয়ে যেতে যেতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে আরো নানা উদ্দেশ্য, প্রধানত শিক্ষার সংযমন ও মানসোৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্য উঁকি মারতে লাগলো, নূতন শিক্ষার অনুপ্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দিতে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নবজাগৃতি দেখা দিল। আবার যান্ত্রিক সভ্যতার জটিলতাবৃদ্ধির সংগে দেশে দেশে শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শহীনতা ও উন্মার্গগামিতার ভাব দেখা দেওয়াতে শিক্ষাচিন্তার ধারার মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল যে কেবল-মাত্র নানা বিষয়ের শিক্ষাদানের দ্বারাই একাধারে ব্যাবহারিক নৈপুণ্য ও চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়না। উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিক থেকেই সামাজিক অভিজ্ঞতামূলক কার্যকলাপকেও শিক্ষার বিষয়ীভূত করে' নেওয়ার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় ওই ভাবটাই ক্রমশ পুষ্টিলাভ করতে থাকে।

বর্তমান শিক্ষাচিন্তায় পাঠ্যক্রমপ্রস্তুতির বিষয়ে এই দুই মতবাদের প্রভাব স্পষ্ট। কেউ কেউ বিষয়ের এবং কেউ কেউ পদ্ধতির ওপর জোর দেন। শিক্ষা বিষয়প্রধান না বিষয়িপ্রধান এই আলোচনা অনেকটা "তৈলাধার কি পাত্র না পাত্রাধার কি তৈল"র মতো হ'লেও ক্রমশ অধিকসংখ্যক লোক শিক্ষার পদ্ধতির দিকে মন দিচ্ছেন এবং শিক্ষকশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে পদ্ধতিপ্রয়োগ, আদর্শসৃষ্টি, পরিদেশন প্রভৃতি বিষয়ের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজকের শিক্ষাসংস্কারের প্রচেষ্টায় যে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যে ওই দুই ধরনের মতবাদেরই প্রভাব দেখা যায়। এই পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি প্রথমত ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক এই দুই অংশে বিভাজ্য,—"ক", "খ" ও "গ" অংশে বাধ্যতামূলক ও "ঘ" অংশে ঐচ্ছিক বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে। "ঘ" অংশটি কলা, বিজ্ঞান,

বাণিজ্য, কৃষি, যন্ত্র, চারুশিল্প ও গৃহবিজ্ঞান এই সাতটি বৈকল্পিক শাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক শাখায় কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বেছে নিয়ে শিক্ষা করতে হয়। এই অংশের পাঠ বিদ্যালয়ের শেষ বহিঃপরীক্ষার বিষয়ীভূত। এর মধ্যে পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে বিষয়প্রাধান্যের আদর্শ গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা কিংবা কর্মের ক্ষেত্রে যে-যে বিষয়ের প্রয়োজন হবে তাদের ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনানুযায়ী নির্বাচিত সেই-সেই বিষয়ের শিক্ষা তারা এই শাখার মধ্যে অর্জন করে।

পাঠ্যক্রমের বাধ্যতামূলক অংশটি যথাক্রমে ভাষা, শিল্প ও কেন্দ্রগত বিষয় এই তিন ভাগে বিভাজ্য। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ বহিঃপরীক্ষায় গৃহীত হয়না, প্রথমটি হয়। ওই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগকে পাঠ্যক্রমের বিষয়িপ্রধান অংশ বলে গণ্য করা হয়। মুদালিয়র কমিটির মতে এই দুই অংশের অনুশীলনে সৌন্দর্যজ্ঞান বাড়বে, অবসরের অবলম্বন ও কায়িক শ্রমের মর্যাদাবোধ হবে এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের নাগরিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, উদ্যোগিতা, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতির দৃষ্টিভংগি ও অভ্যাস গঠিত হবে। এই অংশে অধ্যয়নের ভিত্তিতে তথ্যের আয়ত্তীকরণ অপেক্ষা অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ও জ্ঞান ও কর্মসাধনের নানাপ্রকার নৈপুণ্যের অভ্যাস প্রধান। কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবে পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি কর্ম ও সমাজসেবার ধারাবাহিক অভিজ্ঞতাদানের কথা আছে।

পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়াংশ ভাষা। বর্তমানে এই সম্পর্কে সরকারি ত্রিভাষানীতি গৃহীত হয়েছে এবং পশ্চিমবংগে কলাশাখার জন্য সংস্কৃত-ভাষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় ওই শাখার পাঠ্যক্রমে চারটি ভাষা বাধ্যতা-মূলক হয়েছে। এর মধ্যে কলাশাখায় ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত এবং অন্যান্য শাখায় ইংরেজি ও বাংলা শেষ বহিঃপরীক্ষার বিষয়ীভূত। হিন্দী-

ভাষা দুই বৎসর মাত্র পড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে' তার দ্বারা পাঠ্যক্রমকে ভারাক্রান্ত করেও কোনো স্থায়ী লাভ হচ্ছে না। এইগুলির মধ্যে বাংলার পাঠ্যক্রমই এই আলোচনার বিষয়।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মাতৃভাষার পাঠ্যক্রম একাধারে বিষয় ও বিষয়িপ্রধান। জীবনের সমস্ত প্রয়োজনসাধনের যন্ত্র, শিক্ষার বাহন ও পশ্চিমবংগের রাজ্যভাষারূপে বাংলাভাষা একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। আবার মাতৃভাষারূপে এ জীবনের সমস্ত বিকাশ, অভ্যাস ও সংস্কৃতির আধার। তাই শিক্ষক ছাত্রকে যেমন একদিকে ভাষার সমস্ত শাখা-প্রশাখার সংগে পরিচিত করে'ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারের অধিকারী করে' তুলবেন তেমনি অন্যদিকে মাতৃভাষাসম্পর্কিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সর্জনমূলক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তার মনের বিকাশ ও মতামতের গঠন করবেন, তাকে সুস্থ দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন নাগরিক ও সুমার্জিতচিত্ত মানুষ করে' তুলবেন। এই কারণেই মাতৃভাষার পাঠ্যক্রমের আলোচনায় বিষয়ের সংগে পদ্ধতির প্রশ্ন অংগাংগিভাবে যুক্ত।

পাঠ্যক্রমের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত এই দুটো দিক আছে, যেমন, প্রত্যেক শ্রেণিতে একেক বছরে যা-যা পডানো হয় সেটা সেই শ্রেণির পাঠ্যক্রম আর সেগুলির সমষ্টিতে বিদ্যালয়ের অধ্যয়নকালের মধ্যে যা-যা পডানো হয় সেটা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠ্যক্রম। ছাত্রেরা প্রথম শ্রেণি কিংবা তারও আগে থেকে আরম্ভ করে' বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করা পর্যন্ত যে শিক্ষা পায় সেই বৃহত্তর পাঠ্যক্রম তারা স্তরে স্তরে অনুসরণ করে।

বিষয়প্রধান ও বিষয়িপ্রধান উভয় দৃষ্টিভংগি থেকে গৃহীত শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের উৎকর্ষের বিচার করা হয়। অর্থাৎ বাংলাভাষায় গৃহীত পাঠ্যক্রম সুনির্দিষ্ট হয়েছে কিনা তার আলোচনা হবে এই বিষয়ের লেখাপড়ার প্রক্রিয়া ও বিষয়ের মধ্যে

মনোবিকাশ, চরিত্রগঠন ও ব্যাবহারিক প্রয়োজনসাধনের যথেষ্ট উপায় ও উপকরণ আছে কিনা তার বিশ্লেষণদ্বারা। যেমন, ছাত্রদের আত্মবিকাশ ও প্রকাশের জন্য কথাবার্তা, ছড়া ও কবিতার আবৃত্তি, অভিনয়াত্মক ও বিচারবিতর্কমূলক আলোচনা, সর্জন-বিশ্লেষণ-গবেষণামূলক রচনা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সমাবেশ হয়েছে কিনা এবং চিত্তোৎকর্ষ সাধন, জাতীয় ঐতিহ্যের অনুভূতি, দেশপ্রেমের জাগৃতি ও মনুষ্যত্ববোধের উদয়ের জন্য যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে ক্ষুদ্রস্বার্থের ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত করা যায় তার জন্য যথেষ্ট কর্মপ্রকল্প আর সাহিত্য পরিচয় ও অনুভবের ব্যবস্থা আছে কিনা তা বিচার্য।

ব্যাবহারিক দিক দিয়ে চিঠিপত্র, কথোপকথন, সংক্ষিপ্তসার, সম্প্রসারণ ও প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার অভ্যাস বিদ্যালয়জীবনের শিক্ষার মাধ্যমরূপে ও ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে অবশ্যব্যবহার্য যন্ত্ররূপে যথেষ্ট পরিমাণে ও উপযুক্ত ভাবে করানো হচ্ছে কিনা তাই হবে পাঠ্যক্রমের উপযোগিতার মাপকাঠি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, বিদ্যালয়ে ও ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে ভাষার সংক্ষেপ ও সম্প্রসারণমূলক ও প্রবন্ধ রচনামূলক কাজের বহু প্রয়োজন হবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ব্যাখ্যানের অভ্যাস কোনো কাজে লাগবে কিনা সন্দেহ, উপরন্তু ওই সব প্রক্রিয়া রসানুভবের পরিপন্থী বলে' অনেকে বাংলার পাঠ্যক্রমের নির্দেশের থেকে ওই কাজ বাদ দিতে চান। আবার, ব্যাকরণ যখন ভাষাশিক্ষার উপায়স্বরূপ নয় তখন ভাষার বিশুদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাবহারিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চমানের ব্যাকরণের সন্নিবেশের বিরোধী মত অনেকে ধারণ করেন। পুনশ্চ, অনেকে বলে ভবিষ্যতের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করে' অনুবাদকে বাংলার পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় অংশরূপে গণ্য করা উচিত আর অনেকে বলেন অত বিশেষিত সাহিত্যকৃতির স্থান বিদ্যালয়ে নেই।

এইরূপে নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েব পাঠ্য-ক্রম নির্ধাবিত ও সংশোধিত হয়ে এসেছে। এব অন্তর্গত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ লেখা, পডা, বচনা, ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির শিক্ষাব উদ্দেশ্য, উপায়, স্তববিভাগ (কোন কোন শ্রেণিতে কোন কোন অংশ পডানো উচিত) প্রভৃতি নিয়ে পূর্ব পূর্ব পবিচ্ছেদে আলোচনা কবা হয়েছে। এতে আধুনিক শিক্ষাচিন্তার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য কবা যায় যেমন নিচের শ্রেণিতে তথ্যমূলক ব্যাকরণ পাঠ্য করা হয়নি, বিদ্যা-লয়েব পাঠ্যক্রম থেকে অনুবাদকে বাদ দেওয়া হযেছে ইত্যাদি। অন্য দিকে অনেক দোষও দেখা যায়, যেমন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণেব আধিক্যেব দ্বাবা উপলব্ধির স্থান সংকীর্ণ কবা হয়েছে, সাহিত্যোপভোগমূলক পাঠ্যেব ও পঠিত সাহিত্যের সংগে সাহিত্যেব ইতিহাসের ধাবাব অনুবন্ধেব কোনো আয়োজন নেই।

পাঠ্যক্রমে দুইপ্রকাবেব সাহিত্যপুস্তক নির্ধারিত কবা হয়,—বিশেষিত ও দ্রুতপাঠ্য বা অবিশেষিত। এগুলিব পডানোব পদ্ধতি নিয়ে পাঠ্য ও পাঠ্যপ্রসংগে বিস্তাবিত আলোচনাসূত্রে দেখানো হয়েছে যে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি সাহিত্যবোধেব পরিপন্থী। যাঁব পবীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করেন তাঁবাই অনেকাংশে এই অবস্থার জন্য দায়ী, অর্থাৎ শেষ বহিঃপবীক্ষায় যদি পূর্বাপব উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কবতে হয় তবে ছাত্রদের তার জন্য প্রস্তুত করতে গিয়ে শিক্ষকেবা অবশ্যই সাহিত্যানুভূতির মূলে কুঠারাঘাত করতে বাধ্য হবেন। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এমন বহুপ্রকারের প্রশ্নের উদ্ভাবন করেছেন যার দ্বাব সাহিত্যবোধ ও পবিচয়ের পরীক্ষা একাধারে কবা সম্ভব। মধ্যশিক্ষা-পর্ষতের সেইসব পদ্ধতির ব্যবহাবে অপারগ হওয়ার কোনো কারণ নেই বস্তুত বাঙালি ছেলেপিলেদের বাংলাভাষার মান যে ক্রমাগত অবনমিত হয়ে চলেছে তার প্রতিকারেব উপায় প্রতিবৎসর অধিকতর ছাত্রবে

ফল করানোর মধ্যে নেই, উপায় আছে উপযুক্ত শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে পাঠ্যক্রমনির্ধারণ, প্রশ্নপত্ররচনা ও মূল্যায়নের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করানোয়। জাতীয় চরিত্রের আধারস্বরূপ মাতৃভাষার শিক্ষায় অশিক্ষিতপটুত্বের আধিপত্য জাতির পক্ষে বিপজ্জনক।

পাঠ্যপুস্তক ছাড়া নিচের শ্রেণিতে দ্রুতপাঠ্য ও ওপরের শ্রেণিতে অবিশেষিত পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাপ্রশ্নের ইংগিতে এদের পার্থক্য সূচিত হ'লেও পড়ানোর সময়ে শিক্ষকেরা সে পার্থক্য রক্ষা করে' চলেননা বলে' এগুলির সন্নিবেশের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পরিবর্তে পাঠ্যক্রম ভারাক্রান্ত হয় মাত্র। বিদ্যালয়ের শেষ বহিঃপরীক্ষায় এই বইগুলি থেকে যে প্রশ্ন আসে তার প্রকৃতি হ'ল অপূর্বপরিচিত সাহিত্যাংশের প্রশ্নের অনুরূপ, যথা, সারাংশ, ভাবার্থ, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি জাতীয়। এইসব নৈপুণ্য যদি ছাত্রেরা ষষ্ঠশ্রেণি থেকেই ক্রমবর্ধিত ভাবে আয়ত্ত করতে থাকে তবে দ্রুত ও অবিশেষিত পাঠ্যাংশ দ্রুতপাঠ পদ্ধতিতে পড়ানোয় অসুবিধা হবার কথা নয়। অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি ছাত্রদের ভাষাসাহিত্যের অধিকার ও বোধের উচ্চশিখরে আরূঢ় না করে' মুখস্থবিদ্যার নৈরাশ্যজনক উপত্যকায় আবদ্ধ করে' রেখে থাকে তবে দ্রুতপাঠের উদ্দেশ্য সাধিত হবেনা। তাছাড়া পাঠলব্ধ অধিকারের ক্ষেত্রান্তরে সঞ্চারণের মূল্যায়নের যে নানা আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার প্রয়োগদ্বারাও অবিশেষিতপাঠের পরীক্ষার উন্নয়ন সম্ভব। দ্রুতপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছাত্রদের বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আস্বাদ দেওয়া, ভূয়োপঠন ও দ্রুতপঠনের দ্বারা সারগ্রহণে অভ্যস্ত করা এবং শিক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের যন্ত্ররূপে ভাষার অধিকার বৃদ্ধি করা। শ্রেণিপাঠনা ও পরীক্ষণের কোনো কল্পিত বা বাস্তব প্রয়োজনে এইসব উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা অবাঞ্ছনীয়।

দ্রুতপাঠ্যসম্পর্কে আরো দুটি বিষয়ের চিন্তার প্রয়োজন। প্রথমত,—

সাহিত্যের ইতিহাস যখন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তখন বাংলা সাহিত্যের পরিণতির ধারার দিকে দৃষ্টি রেখে দ্রুতপাঠ্যপুস্তকের নির্বাচন করা উচিত। দ্বিতীয়ত,—উচ্চতর মাধ্যমিকের বহুশাখ পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রদের প্রয়োজনীয় শব্দসম্ভার ও বিষয়পটভূমি রচনার জন্য অবিশেষিত পাঠের বইগুলি ছাত্রদের অনুসৃত পাঠশাখার অনুযায়ী গোষ্ঠীতে ভাগ করে' দেওয়া উচিত। বাংলা সাহিত্যে এত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারু ও যন্ত্রশিল্প কৃষি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্নবিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচনে অসুবিধা হবার কথা নয়। উচ্চতর স্তরের রচনাশিক্ষার সময়ও শিক্ষকেরা যদি ছাত্রদের গৃহীত বিষয়শাখার বিভিন্ন প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে ও অবিশেষিত পাঠ্যের সংগে অনুবন্ধ স্থাপিত করে' প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখানোর কাজ করান তবে ভাষাসাহিত্যশিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমগ্র শিক্ষার ঐক্য স্থাপিত হ'তে পারে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সন্নিবিষ্ট নূতন বিষয় সাহিত্যের ইতিহাসসম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিদ্যালয়ে সাহিত্যের ইতিহাস পড়ানোর চেষ্টাকে অনেকে উচ্চাকাংক্ষার দুষ্প্রয়াসরূপে অবাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা যখন দেশের বহুস্তরের জীবনোপযোগী শেষ শিক্ষা হ'তে চলেছে তখন বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। সাহিত্যের ইতিহাস না পড়লে যে কেবল সাহিত্যপরিচয়ই অপূর্ণ থাকবে তা নয়, জাতির অধিকাংশের সংগে জাতীয় চিন্তাধারার তথা জাতীয় ঐতিহ্যের বোধের পথও রুদ্ধ হবে। বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির মধ্যে একদিকে যেমন বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা জড়জগৎ ও মানবসমাজের পরিচয় দেবে, অংক পরিমাপের মন্ত্র জোগাবে, তেমনি অন্যদিকে সাহিত্যের ইতিহাস জাতির মানসজগৎসম্বন্ধে চেতনা জাগাবে।

শিক্ষকেরা বলেন যে মাত্র কুড়িনম্বরের পরিসরে মানসজগতের দ্ঘাটন সম্ভবপর নয়, কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে এই নম্বর তার ক পত্রাংশের পরিমাপমাত্র নয়, সমস্ত বিদ্যালয়ের সাহিত্যানুশীলনের াক, যার পরিচয় ছড়িয়ে আছে পাঠ্য ও দ্রুতপাঠ্যপুস্তকের পাতায় াতায়, গ্রন্থাগারের তাকে তাকে।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যবর্জিত সাহিত্যের ইতিহাস পড়ানো যেমন সম্ভব, সাহিত্যানুবন্ধিত ইতিহাস তেমনি সহজ। উচ্চতর মাধ্যমিক দ্যালয়ের মাতৃভাষা বাংলার পাঠ্যক্রমে তিনবছরের পাঠে গদ্যে দ্যাসাগর ও পদ্যে মুকুন্দরাম থেকে আরম্ভ করে' আজকের কবি-হিত্যিক পর্যন্ত অনেকেরই রচনা আছে। সাহিত্যের ইতিহাস ড়াতে গিয়ে শিক্ষক এগুলিকেই ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নেবেন এবং থমে ও শেষে কিছু বাড়িয়ে, মাঝে মাঝে পাদপূরণ করে সাহিত্যের তিহাসের সম্পূর্ণ আকৃতি খাড়া করবেন।

এই সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণিতেই রা যায়। ষষ্ঠশ্রেণি থেকে পঠিত সাহিত্যাংশের রচয়িতাদের নাম ও রিচিতি নিয়ে রচনা ও চিত্রসংগ্রহ আলগাপাতার ফাইলে কালানু-মিক ভাবে সাজিয়ে রাখা যায়। পাশাপাশি সময়রেখা, সোপান বা ার চিত্রণে এই পরিণতির গতিপ্রকৃতি রূপায়িত করলে পাঠ্যবস্তুর তিহাসিক প্রেক্ষিত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এইভাবে অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত ত্যেক ছাত্রের একটি স্বরচিত সাহিত্যের ইতিহাস ও একটি বহিঃপাঠ্য কলিত স্বয়ংসঞ্চয়ন থাকলে নবম শ্রেণি থেকে বাংলার শিক্ষকের কাজ নেক সহজ হয়ে পড়বে।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষতের নির্ধারিত সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে ন অংশ আছে সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে যার পরিচয় পাওয়া যায়না। সব সাহিত্যসৃষ্টি ছাত্রসমাজের হাতের কাছে এনে দেবার উপায়

চাই। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মংগলকাব্য, শ্রীচৈতন্যজীবনী, পল্লীগা
প্রভৃতির সরল কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মতো সরল সংস্করণ প্রকাশি
হ'লে ছাত্রদের পক্ষে এদের আস্বাদের আনন্দলাভ সম্ভবপর হবে
বস্তুত পাঠ্যক্রমকে সার্থক করতে হ'লে ভাষার অভ্যাস ও বিজ্ঞানমূল
বিষয়গুলির পশ্চাতে চক্রাকারে বর্ধনশীল সাহিত্যপাঠের প্রয়োজ
তার প্রথম ক্ষুদ্র চক্র পাঠ্যপুস্তক, সেই কেন্দ্রে স্থাপিত বৃহত্তর চক্র দ্রু
পাঠ্যপুস্তক ও বৃহত্তম পরিবেষ্টক চক্র পাঠ্যবহির্ভূত সাহিত্যপাঠ।
পরস্পরগ্রথিত চক্র থেকে চক্রান্তরে উত্তীর্ণ করে' দেওয়া সুশিক্ষকে
কাজ এবং তাতেই পাঠ্যক্রমের উপযুক্ত প্রয়োগ।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যক্রমকে অতিরিক্ত ভারাক্র
বলে' মনে করা সত্ত্বেও একথা সত্য যে মাধ্যমিক শিক্ষায় উচ্চকো
ভাষাসাহিত্যালোচনার সুযোগের অভাব। অথচ বহুভাষী দে
ভারতবর্ষে ভাষাশিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়না। বৃটিশ আমলে
দ্বিভাষিস্থষ্টির প্রচেষ্টার অসাফল্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়
বর্তমানে গৃহীত ত্রিভাষানীতির অসাফল্যও অবশ্যম্ভাবী। ভাষাশিক্ষ
এই বিপর্যস্ত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পটভূমিতে ভাষাসমস্যার সমাধানে
জন্য যে বহুসংখ্যক ভাষাবিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে তাদের বী
বিদ্যালয়েই উপ্ত হওয়া চাই। উপরন্তু যারা ত্রিবার্ষিক স্নাতকশিক্ষ
কোনো ভাষায় সম্মানের জন্য প্রস্তুত হবে তাদের সাহিত্যিক প্রস্তু
দরকার। এই দুই কারণে বহুশাখ ব্যবস্থায় অন্যান্য শাখা ছাড়া
একটি পূর্ণ ভাষাশাখার সন্নিবেশ বাঞ্ছনীয়। অথচ মুদালিয়র কমিটি
এর উল্লেখ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে ভারতের কোনো রাজ্যেই তার রূ
দান হয়নি। পরবর্তী কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবিত বিদ্যাল
পাঠ্যক্রমে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে ভা
বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই।

পাঠক্রম

াক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাবিধির নিয়মানুযায়ী পাঠনের ক্রমনির্ধারণ করা :য় থাকে। পাঠ্যবিষয়ের প্রত্যেকটি অংশ সেই অনুসারে সজ্জিত রে' স্তরে স্তরে তার আলোচনা হয়। শিক্ষণ-শিক্ষালয় থেকে লব্ধ ৷ ক্রমগুলি শিক্ষকেরা সাধারণত বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহার করে' থাকেন র্তমানে সেগুলি অনেকাংশে কৃত্রিম ও কালবারিত হয়ে গেলেও এখন র্যন্ত বহুল প্রচলিত হওয়াতে এই পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ারই ভিত্তিতে স্থাপিত হ'ল।

জানা থেকে অজানায়, সরল থেকে কঠিনে, নিকট থেকে দূরে, ়শিষ্ট থেকে সাধারণে, বস্তু থেকে ভাবে যাওয়ার নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক াঠ পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক কোনো শিক্ষাবিদ াঠটীকারচনায় পূর্বজ্ঞানের পরিবর্তে অনুপ্রেরণার ব্যবহারের নির্দেশ ান কিন্তু জন্মাবধি লব্ধ "ছাপজট" ও পূর্বজ্ঞানের পটভূমি যে নূতন ানের ভিত্তি এবং পূর্বপরিচিতের পুনঃদর্শন যে একটি প্রধান অনুপ্রেরক ৷ নূতনের দিকে অগ্রগমনের প্রথম পদক্ষেপ, একথা অস্বীকার করা ায় না। এইজন্য পাঠক্রমের প্রথম অংশ ভূমিকা পূর্বজ্ঞান ও প্রেরণা াই দুয়ের ভিত্তিতে স্থাপিত। উপস্থিতপাঠ্য পূর্বপাঠের অনুবৃত্তি 'লে ভূমিকারূপে পূর্বপাঠের উল্লেখ হয়; যদি পূর্বাধীত বা পূর্বপরিচিত বষয়ের অনুরূপ বিষয় থাকে, তবে পূর্ববিষয়ের তুলনা হয়; সম্পূর্ণ নূতন বষয় হ'লে পরিচিত কোনো বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তির ওপর াকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমন নায়েগ্রা জলপ্রপাত পাঠ্যবিষয় 'লে ছবি দেখিয়ে ও ছাত্রদের পূর্বদৃষ্ট কোনো ভারতীয় জলপ্রপাতের াংগে তুলনা করে' ভূমিকা হ'তে পারে; দার্জিলিংয়ের বিষয়ে প্রবন্ধ

পড়াতে ছাত্রের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত পাহাড়ে দেশের সংগে তুলনা কর যায়। বস্তু, রূপকল্প বা ছবি দেখিয়ে, কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বা গল্প বলে' ভূমিকা করা যায়। শ্রেণির কোনো ছেলে যদি পাহাড় না দেখে থাকে তবে ছবি বা মডেল দেখানো ছাড়া ভূমিকার উপায় নেই ফুলের সম্বন্ধে পড়াতে ফুলের ব্যবহারে সুন্দর ভূমিকা হয়; দানশীলত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়াবার বা লেখাবার আগে দানের গল্প বল্লে ভাববিষ বাস্তবের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়; ঋতুসম্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনার ভূমিক ঋতুবিষয়ক কবিতাপাঠের দ্বারা করা যায়।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ভূমিকা যেন একটি নিস্প্রা প্রক্রিয়ায় পরিণত না হয়। যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মেথর পড়াবার সময়ে মায়ের সংগে তুলনা অসার্থক, উপরন্তু, মেথর সকলে কাছে এত পরিচিত যে অন্য কোনো উল্লেখদ্বারা তার বিষয়ে মুখবন্ধ করার দরকার নেই। প্রস্তুত বিষয় বা অভিজ্ঞতা ছাত্রদের পরিচিত হ'লে অনাবশ্যকভাবে বাইরের কথা না এনে সোজাসুজি বিষয়ে উপনীত হওয়া প্রকৃষ্ট পন্থা। যেমন রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষ" পড়াবার সময়ে কোনো কল্পিত শিশুর কল্পনাপ্রবণতার কাহিনী দিয়ে ভূমিকা না করে' প্রত্যেক শিশুর মধ্যে গোপনে যে বীরপুরুষটি অদম্য আকাংক্ষাসমূহ নিয়ে বাস করে তাকে টেনে বাইরে এনে দিলেই সে পরম উৎসাহিত হবে। কিংবা, এরোপ্লেনের বিষয়ে পড়াবার সময়ে আধুনিক শহুরে ছেলের কাছে পুষ্পকরথের উদাহরণ দেওয়ার সার্থকত নেই, বরংচ পুষ্পকরথের বিষয় পড়াতে গেলে এরোপ্লেনের তুলনা দরকার হবে।

সাহিত্যাংশ পড়াবার সময়ে প্রথমে কবি ও লেখকের জীবন রচনাশক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। এর মান শ্রেণিভে বিভিন্ন হবে আর, শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করলে, এর স্থা

উপস্থাপনের শেষে হওয়া উচিত। পরিচিতি প্রথমে থাকলে তা শিক্ষকের কাছে শোনা কথামাত্র থাকবে, কিন্তু পাঠের পরে স্থাপিত হ'লে বোধ ও অনুভবের ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। এই সংগে ছাত্রদের বিচারবুদ্ধির উদ্বোধন ও প্রয়োগ হবে ও শিক্ষকছাত্রের মিলিতবিচারে সাহিত্যালোচনা সার্থক হবে। পূর্বপরিচিত লেখকের রচনার ক্ষেত্রেও ভূমিকায় উল্লেখমাত্র করে' পুনরালোচনায় পূর্ব ও প্রস্তুতবিষয়ের সমাহারমূলক আলোচনায় সাহিত্যবোধ পুষ্ট হয়।

ভূমিকার পর উপস্থাপন, পাঠপ্রদান বা মূলবিষয়ের আলোচনা। কবিতা বা কাব্যধর্মী গদ্য পাঠ্য হ'লে উপস্থাপনের প্রথমে শিক্ষক আদর্শ-পাঠ দেবেন, যাতে ধ্বনির মধ্যে দিয়ে বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাব ছাত্রের মর্মস্পর্শ করে। সাধারণ গদ্যের পাঠে অনুচ্ছেদবিভাগানুযায়ী একেকটি অংশ পড়িয়ে পড়ানো যেতে পারে।

যাতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাহিত্যরসের হানি না ঘটে সে বিষয়ে শিক্ষক সাবধান হবেন। অধিকাংশ শিক্ষক শব্দার্থ-ব্যাখ্যা-সারাংশের বোঝার তলায় সাহিত্যের সুকুমার দেহকে পিষ্ট করেন। পুরোনো সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর একটি গল্পে ছিল যে চোর কেনারাম তার ভৃত্য বেচারামকে বিনাবেতনে তাড়িয়ে দেওয়ায় তাকে অসহায়ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখে দয়াপরবশ হয়ে এক দেবদূত একটি বেহালা উপহার দিলেন—ওই বেহালার বাজনা যে শুনবে সে নাচতে বাধ্য হবে। তারপর কেনারামকে একটা কাটাবনে চোরাই মাল লুকোতে দেখে সুযোগ বুঝে বেচারাম বেহালা বাজাতে আরম্ভ করলো এবং নাচতে নাচতে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে কেনারাম ভৃত্যের বেতন চুকিয়ে দিয়ে উদ্ধার পেলো; কিন্তু কেনা-রামের পক্ষে যেটা "যেমন কর্ম, তেমন ফল"—সেটা ছাত্রদের পক্ষে বিনাপাপে কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা।

পাঠপ্রদানের সময়ে শব্দার্থ-ব্যাখ্যা-ব্যাকরণাদির আলোচনার সংগে ভাবের আদানপ্রদান চলে। ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে ছোটছোট অংশ ভাগ করে' নেওয়ার পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই পদ্ধতি গদ্যের উপযোগী হ'লেও পদ্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যানুভবের পরিপন্থী। যুক্তিপ্রধান গদ্যের গতি স্বভাবতই ধাপে ধাপে; কিন্তু ভাবধ্বন্যালংকৃত কবিতাপাঠের জন্য সমগ্রদৃষ্টির প্রয়োজন। এই কারণে গদ্যের আংশিক আলোচনা হলেও পদ্য পড়াবার সময়ে শিক্ষক প্রথমে সমগ্র কবিতার একটি আদর্শপাঠ দেয়ার পর কতকগুলি রূপরসাশ্রয়ী সন্ধানী প্রশ্নের দ্বারা সামগ্রিক অনুভূতির যাচাই করে' নেবেন, তারপর স্তবকভাগ করে' ছাত্রদের দ্বারা পাঠ ও অনুভবাত্মক বিশ্লেষণ।

উদাহরণস্বরূপ "বৈরাগ্য" কবিতার আদর্শপাঠের পর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতে পারেন—"কবিতার প্রধান চরিত্র কে?"—"সে কি করতে যাচ্ছে?"—"কিসের জন্য সে গৃহত্যাগ করবে?"—"কে তাকে ভুলিয়ে ঘরের মধ্যে রেখেছে?" এই ধরনের পাঁচছ'টি প্রশ্নের পর তিনি সনেটটির অংশগুলি নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবেন।

বড় কবিতা পড়াবার সময়ে একদিন কেবল পাঠ ও অনুভবের পর পরের কয়েকদিনের পাঠে একেক অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন ষষ্ঠশ্রেণিতে "সামান্যক্ষতি" কবিতাটি পড়াবার সময়ে প্রথম দিনে কেবল শিক্ষকের আদর্শপাঠ ও ছাত্রদের সরবপাঠ হ'ল। সে-সময়ে কলকাতায় উদয়শংকরের "সামান্যক্ষতি" নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ থাকায় ভূমিকায় তার উল্লেখ করে' পাঠঘোষণাপ্রসংগে শিক্ষক জানিয়ে দিলেন যে তিনি পরে এই কবিতাটির অভিনয় করাতে চান বলে' তাঁর পাঠকালে ছাত্রেরা যেন দৃশ্য, চরিত্রাবলি এবং তাদের পোষাক ও মুখের ভাব প্রভৃতি বিষয়ের কথা চিন্তা করতে থাকে। পাঠের পর এগুলির বিষয়ে সামান্য ক'টি প্রশ্নের পর ছাত্রেরা স্তবকভাগ করে দ্রুতপাঠ করতে করতে

অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে থাকে। আবো বিশ্লেষণের পর ওই বিদ্যালয়ের রবীন্দ্রশতাব্দি উৎসবে যষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রেরা ওই কবিতার নাট্যরূপের অভিনয় করেছিল। অবশ্য কবিতা যদি এত দীর্ঘ হয় যে একটি ঘণ্টায় সরব পাঠও শেষ করা যায় না, তবে তাকে বিভক্ত করতেই হবে। সেরূপ ক্ষেত্রে কবিতাটি পড়ানো শেষ হয়ে গেলে সমস্তটির একসংগে অনুভবমূলক আলোচনা করানো চাই।

পাঠটীকা রচনা করার সময়ে বহু শিক্ষক গীতি কবিতার পর্যন্ত শব্দার্থ লিখে দেন। এই পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য নয়। ব্যাখ্যা অংশে শব্দার্থ বা ব্যাকরণের আলোচনা যতদূর সম্ভব বর্জন করে অনুভবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজনে শব্দার্থের আলোচনা হবে : ব্যাকরণ পুনরালোচনার আগে নয়, বরংচ একই পাঠের মধ্যে না করে' পরে রচনা বা ব্যাকরণের পাঠের সময়ে এর উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অনেকে ছাত্রদের দিয়ে কঠিন শব্দগুলি খুঁজে বের করান, আর অনেকে—"এখানে অমুক অর্থে কি শব্দের ব্যবহার হয়েছে বলতো!" বলে' অভিনব পন্থায় খিড়কির দোর দিয়ে শব্দার্থের শুষ্ক-মূর্তিকে এনে সাহিত্যের সিংহাসনে বসান। ছাত্রদের শব্দসম্ভার বাড়ানোর চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু তারজন্য তার বোধের হত্যা মহাপাপ। ব্যাকরণের আলোচনাকে সাহিত্যের পাঠে এড়িয়ে চলারও ওই একই কারণ।

শিক্ষকদের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠতে পারে—

১। শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের কঠিন কঠিন শব্দের এবং অংশসমূহের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হবেনাকি ?

২। ব্যাকরণে যা পড়েছে, পাঠ্যপুস্তকের ভাষালোচনায় সেগুলি উদাহৃত না করলে সেগুলির দিকে ছাত্রদের মনোযোগ কখন, কিভাবে আকৃষ্ট করা যাবে ?

৩। ভাষার উপজীব্য সাহিত্যের পাঠের সময়ে ভাষাবিষয়ক আলোচনা না হ'লে ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বাড়বে কি করে ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ছাত্রদের কঠিন শব্দের ও গদ্য-পদ্যাংশের অর্থ বুঝতে হবে বৈকি, কিন্তু শব্দার্থ ও ব্যাখ্যানের নীরস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নয়। কঠিন শব্দ ও অংশের অর্থবোধ সুশিক্ষক উপযুক্ত প্রশ্নের দ্বারাই অনেকাংশে সাধিত করতে পারেন। প্রশ্নগুলি এমনভাবে করা হবে যাতে শব্দার্থবোধের জন্য ছাত্রদের ভাবার্থবোধ ব্যাহত হচ্ছে কিনা তা শিক্ষক বুঝতে পারেন। যে যে ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ বলে' দেওয়া ভিন্ন অর্থবোধ হবে না, কেবল সেই সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক শব্দার্থ বলে' বা বিশ্লেষণ করে' বুঝিয়ে দেবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্রদের কৌতূহলের উদ্রেক করিয়ে অভিধান দেখতে প্রণোদিত করাই বাঞ্ছনীয়। অপরপক্ষে রচনা ও ব্যাকরণের শ্রেণিতে সাহিত্যপাঠলব্ধ উদাহরণ প্রচুরভাবে ব্যবহার করবেন ও এই শব্দগুলিকে নিয়ে বোধ ও ব্যবহারের অধিকারবৃদ্ধির জন্য নানা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করবেন। এইভাবে রসের রাজ্যে ভাষাবিজ্ঞানের অনধিকার প্রবেশ এড়িয়ে রচনা ও ব্যাকরণপাঠে পরিচিত শব্দের সন্দর্শনে ছাত্রদের উৎসাহবৃদ্ধি ও কাজ সহজ করা হবে।

অর্থবোধের কাজ প্রশ্নোত্তরদ্বারা সাধিত হ'লে কিছু অভ্যাসের প' ছাত্রেরা নোটবই বা শিক্ষকের দেওয়া টীকার সাহায্য না নিয়ে' সাহিত্যাংশ বুঝতে বা বুঝিয়ে দিতে পারবে।

তারপর সারাংশ। শিক্ষক যতই ভালো বাংলা লিখুন না কেন তাঁর কালোপটের সংক্ষিপ্তসার মূল সাহিত্যিকের রচনার চেয়ে নীর' এবং সহৃদয় আলোচনার শেষে রসাভাসজনক হ'তে বাধ্য। বোর্ডে' সাহায্য নিতে হ'লে পাঠদানকালে উপস্থাপনের সংগে সংগে চুম্বক ব

সূত্ররচনা তার প্রকৃষ্ট উপায় এবং গীতিকবিতা প্রভৃতি পড়ানোর সময়ে তাও বর্জন করলে ভালো।

শব্দার্থ ও ব্যাকরণের আলোচনা ছাড়াও আরো অনেক রকমের মূলভাববহির্ভূত অসাহিত্যিক কাজের দ্বারা শিক্ষকেরা সাহিত্যবোধকে বিক্ষিপ্ত করেন। যেমন, পাঠলব্ধ শব্দসম্ভার নিয়ে নানাপ্রকার শাব্দিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস,প্রতিশব্দ,বিভিন্ন বাগ্বিধি ও ব্যবহার, প্রাপ্ত উদাহরণের অনুরূপ নিয়মে শব্দগঠন ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলা হয় গাছ গুনতে সলে বন দেখা যায়না—সাহিত্যানুভবও সেইরূপ সমগ্রতাজাত,—অসাহিত্যিক খুঁটিনাটি তার হানি ঘটায়।

ব্যাখ্যার সময়ে শিক্ষককে ছাত্রদের খাটিয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর থাকতে হবে। ছাত্র যদি ভূমিকায় পাঠবস্তুর মোটামুটি সংকেত পায় তবে অর্থের অনেকটাই তার কাছ থেকে আদায় করে' নেওয়া সম্ভব হবে। বিষয় যদি কোনো পরিচিত পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়ে থাকে ছাত্র তার পূর্বজ্ঞান থেকে বুঝে নতে পারবে; গল্প বা কবিতা পাঠ্য হ'লে তাকে স্বীয় ভাষাবোধ ও সাহিত্যানুভূতির সাহায্যে মর্মগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে; কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ের পাঠনের সময়ে ছাত্রদের সহযোগিতার অভাব হ'তে পারে। কোনো কোনো শিক্ষক এরূপ ক্ষেত্রে তাদের নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হ'তে সাহায্য করার পরিবর্তে সব কথা বক্তৃতার আকারে বলে' দিতে চান। তাঁরা বলেন যে অপরিচিত বিষয়বস্তু ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা অসম্ভব।

অসম্ভব কিছু নয়,এরূপ বিষয়ের পড়াবার পদ্ধতি কেবল ভিন্ন। বিষয়ের দিক দিয়ে পাঠবস্তু সাধারণত তিনপ্রকারের হ'তে পারে। প্রথম,—যে বিষয় ছাত্রেরা জানে, কেবল শিক্ষকের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান সজ্জিত ও মার্জিত করে' নিতে হবে, তার পাঠ। উদাহরণস্বরূপ "বিমানপোত"—

এই বিষয়ের কোনো প্রবন্ধ। ছাত্রদের মধ্যে বিমানপোত দেখেনি ও বিমানযুদ্ধের কাহিনী শোনেনি এমন কেউ সম্ভবত থাকবে না, শিক্ষব তাদের অভিজ্ঞতার ওপর কিছু নূতন জ্ঞান দান করলে তারা সম্পূ বিষয়টি বুঝে আলোচনা করতে পারবে। পরিচ্ছন্নতা, দানশীলতা মাতৃস্নেহ প্রভৃতি সাধারণ গুণ এবং খেলাধূলার কথা এই শ্রেণি অন্তর্গত।

দ্বিতীয়,—অনুভবের দ্বারা যে-সব বিষয় হৃদয়ংগম করা যায় তা পাঠ,—যেমন, কবিতা বা গল্প। এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রের মনে বিষয়ব আপনি রেখাপাত করে, সেই প্রভাবকে উজ্জ্বল করে' চেতনার দ্বা পৌঁছে দেওয়া শিক্ষকের কাজ। সুনির্বাচিত প্রশ্ন চেতনাকে জাগ্র করে। কবিতার ক্ষেত্রে সুন্দর আদর্শপাঠের সহায়তায় অনুভব বহুদূ অগ্রসর হ'তে পারে।

তৃতীয়,—জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ। এই শ্রেণির পাঠে ছাত্রদে সহযোগিতালাভ কঠিনতম বলে' গণ্য হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কচালনার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ গ্রহনক্ষত্রের কথা, ম্যালেরিয় ও তার চিকিৎসার ইতিহাস, শারীরতত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহ নূতন নূতন আবিষ্কারের কাহিনী ইত্যাদি। এগুলি চিত্র, চিত্রকল্প রূপকল্প, নমুনা, পর্যবেক্ষণ (যেমন প্রাকৃতিক পাঠ বা নিজের দেশে কথা), পরীক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে এত চিত্তাকর্ষক ও উজ্জ্বলভা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা যায় যাতে তারা নিজেরাই বিষয়ের মূ কথাগুলি বুঝে নিতে পারে। এই ব্যাপারে বাংলার শিক্ষক উত্ত বিষয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতা নেবেন এবং উদাহরণকে উল্লেখমাত্রে পর্যবসিত হ'তে না দিয়ে অনুবন্ধের মধ্যে সার্থক করবেন।

জ্ঞানবিষয়ক পাঠে যাতে বাংলা পড়ানোর সাহিত্যিক উদ্দেশ্য দৃষ্টি বহির্ভূত না হয় সে বিষয়ে শিক্ষক সাবধান থাকবেন। এখানে তাঁ

পথ শাণিত ক্ষুরধারের মতো সংকীর্ণ। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির বিভিন্ন বিষয়ের অনুবন্ধের সমর্থন করে এবং সাহিত্যবোধের জন্যও বিস্তৃত পটভূমির প্রয়োজন, আবার অতিরিক্ত বাইরের বিষয়ের সংযোজনেও বাংলার পাঠ বিষয়ের পাঠে পর্যবসিত হতে পারে। তাই শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, প্রথমত, বাইরের জিনিষের পরিমাণ যেন এত বেশি না হয় যাতে পাঠ্যাংশের মূল বিষয়টি চাপা পড়ে আর দ্বিতীয়ত,—অনুবন্ধ-সাধনের পুরো কাজটি যেন একটি বাংলা সাহিত্যপাঠের শ্রেণিতে সমাপ্ত করার চেষ্টা না হয়। যেমন, ঐতিহাসিক কবিতা পড়াবার সময়ে শ্রেণিতে সমগ্র ঐতিহাসিক পটভূমির পুংখানুপুংখ আলোচনা না করে' শিক্ষক যদি এমন সময়ে কবিতাটি পড়ান যখন উল্লিখিত ইতিহাসটুকু সেই শ্রেণিতে পড়ানো হচ্ছে তাহ'লে উভয় বিষয়ের শিক্ষকের সহযোগিতায় সাহিত্য বা ইতিহাস কোনটিরই স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ না করে' সহজে পরিবেশসৃষ্টি হবে।

ব্যাকরণপাঠে সামান্য পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক পথ অনুসরণ করা যায়। আরোহপদ্ধতিতে ব্যাকরণ পড়ালে ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্বস্তরের অভিজ্ঞতাটুকু পূর্বজ্ঞানরূপে গ্রহণ করে' বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনুরূপ পথে শিক্ষা দেওয়া যায়। নিচে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হ'ল। প্রথম,—বিশেষ্যের পাঠ। প্রথমাবস্থায় শিশু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের সামান্য সাহাযো আবিষ্কার করবে যে, যে-সমস্ত শব্দ সে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে সেগুলির নানা শ্রেণিতে বিভাজ্য। তারপর শিক্ষকসহায়িত পর্যবেক্ষণে তার পক্ষে এও লক্ষ্য করা দুষ্কর হবেনা যে এর মধ্যে কতকগুলি শব্দের দ্বারা "নাম" বোঝায়। বিশেষ্য এই শব্দটি যখন সে শিখবে তখন বিশেষ্যের সমস্ত বিবরণ পূর্বজ্ঞানরূপে তার সাহায্য করবে, নামটি মাত্র নোতুন। বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগশিক্ষাও অনুরূপভাবে করানো যাবে।

ব্যাকরণের অধিকাংশ অভিধার অর্থ থাকার দরুণ সেগুলি পর্যন্ত ছাত্রকে অন্ধভাবে মুখস্থ করতে হবেনা।

দ্বিতীয়,—সন্ধি। পরিচিত উদাহরণের সহায়তায় শব্দগুলির বিশ্লেষণ করে' বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন রঙে লিখে ছাত্রদের সামনে স্থাপিত করলে তারা পর্যবেক্ষণদ্বারা অংকের মতো সহজে অ, আ + অ, আ = আ থেকে আরম্ভ করে' কঠিন কঠিন সন্ধির সূত্র আবিষ্কার ও সংজ্ঞারচনা করে' নিতে পারবে। পবিচিত উদাহরণেব ব্যবহার হ'লে প্রথম বিশ্লেষণের কাজটিও তারাই করে' নেবে।

তৃতীয়, সমাস,—ধরা যাক সপ্তম শ্রেণিতে বহুব্রীহির পাঠ। ভূমিকায় ছাত্রদের সমাসসম্বন্ধীয় পূর্বজ্ঞানের উত্থাপন করে' শিক্ষক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণগুলি তাদের সামনে উপস্থাপিত করবেন। সুনিপুণ ভাবে নির্বাচিত উদাহরণগুলি বোর্ডের বাঁ-দিকে স্তম্ভাকারে লিখে দেবেন। কতকগুলি ছবির (বীণাপাণি, পীতাম্বর, দশানন ইত্যাদি) সাহায্যে অর্থের ধারণা স্পষ্ট করা হবে। ব্যাসবাক্য করার আগে সমস্তপদের উদাহরণ থেকে ছাত্রেরা বহুব্রীহি সমাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে। বহুব্রীহি সমাস অন্যপদার্থপ্রধান, বিশেষ্যে-বিশেষ্যে এবং বিশেষণে-বিশেষ্যে হয় এবং কোন পদ পূর্বে ও কোন পদ পরে বসে তা তারা বলতে পারবে। এই স্তরে সাধারণ সংজ্ঞা ও প্রকার-ভেদসম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম মুখে মুখে আলোচনা করে' আলোচনাজাত সূত্রগুলি অপর এক বোর্ডে বা ওই বোর্ডের চিহ্নিত অংশে লেখা হবে। বোর্ডের স্থানাভাবে শিক্ষক আগে থেকে বড় করে' লিখে এনে যথাযথ সময়ে ক্রমান্বয়ে টাঙিয়ে দেবেন। তারপর প্রথম বোর্ডেব দ্বিতীয় স্তম্ভে ব্যাসবাক্যগুলি করা হবে। প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণের প্রথমটির পর অন্যগুলির ব্যসবাক্য ছাত্রেরা নিজেরাই করতে পারবে। ব্যাসবাক্য দেখে বহুব্রীহিসম্বন্ধীয় জ্ঞান আরো বিশিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হবে এবং

সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, অলুক প্রভৃতি শব্দেরও অর্থবোধ হবে। এই প্রকারের পাঠে বোর্ডের কাজের পরিকল্পনায় চয়ননৈপুণ্য চাই, অর্থাৎ প্রথম স্তম্ভে উদাহরণগুলি তোলার সময়েই শিক্ষক বহুব্রীহির প্রকারভেদ অনুযায়ী একেক প্রকারের উদাহরণ পরপর সজ্জিত করবেন। এতে একটি সহজ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান বিধিবদ্ধ হবে ও বারবার বোর্ড মুছতে হবেনা।

উপস্থাপনের পর পুনরালোচনা। এরদ্বারা ছাত্র অধীত বিষয়ের সূত্রগুলি গুছিয়ে নেবার সুযোগ পায়, দ্বিতীয়বার আলোচনায় বিষয় স্পষ্টতর হয় এবং প্রথমবার যদি কোনো বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকে, সেগুলি পরিলক্ষিত হয়। পাঠের এই পুনরাবৃত্তি যেন রসাভাসের কারণ না হয় সে বিষয়ে শিক্ষক সাবধান থাকবেন। জাগ্রত রসানুভব ভিন্ন সাহিত্যের পাঠ চিত্তাকর্ষক হ'তে পারেনা এবং এককথা বারবার বল্লে বা এককাজ বারবার করালে ছাত্রদের মনে বিরক্তি ও অবসাদের উদ্রেক হয়।

সাধারণত নানাপ্রকার অভ্যাসমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষকের স্থূল-হস্তাবলেপ প্রেরণার উৎসমুখে বাধার সৃষ্টি করে। শিক্ষকেরা কি-ভাবে একই প্রক্রিয়া বারবার করেন তার উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথমে আদর্শপাঠ দিলেন, তারপর ছাত্রদের মনে মনে পড়তে বল্লেন, তারপর কয়েকজনে জোরেজোরে পড়লো, তারপর স্তবকবিভাগ করে' বিশ্লেষণের সময়ে শিক্ষক বা ছাত্রগণকর্তৃক আবার পড়া হ'ল, শেষে, প্রয়োগে, কবিতাটি বারবার আবৃত্তি করে' মুখস্থ করা হ'ল। এইভাবে পড়ানো যে কেবল বিরক্তিজনক তা নয়, এককাজ বারবার করানো মনোবিকাশের পরিপন্থীও বটে। ক'বার পড়ানো যথেষ্ট হয় সেই প্রসংগে প্রস্তাব করা যায়,—শিক্ষক আদর্শপাঠ নিশ্চয় দেবেন, তারপর বিশ্লেষণের আগে একবার ছাত্রেরা মনেমনে পড়ে' নিলে ভালই হয় এবং স্তবকবিভাগ

করে' আলোচনার সময়ে একেকটি স্তবক একেকজন ছাত্র পড়বে। তারচেয়ে বেশি একঘণ্টায় বাঞ্ছনীয় নয় আর আবৃত্তির অভ্যাসের কাল ও ক্ষেত্র আলাদা থাকাই ভালো।

পুনরাবৃত্তি আরেক রকমে হ'তে পারে, যথা, শ্রেণিতে হয়তো একটি গল্প পড়ানো হচ্ছে, উপস্থাপনের সময়ে সেটি প্রশ্নোত্তর দ্বারা আলোচিত হ'ল, পুনরালোচনার আখ্যানভাগের সমস্ত বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন করা হ'ল এবং প্রয়োগে আবার শিক্ষক ছাত্রদের পালাপালা করে' গল্পটি বলতে বল্লেন। এতে বারবার পুনরুক্তির ফলে ছাত্রদের বিরক্তি জন্মালো এবং বিভিন্ন দিকে চিৎপ্রয়োগের অভাবে মনোবিকাশের কোনো সহায়তা হ'লনা। এক্ষেত্রে যদি শিক্ষক উপস্থাপনের সময়ে গল্পের আখ্যানভাগের ওপর জোর দিয়ে আলোচনা করে' পুনরালোচনায় চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করে' শেষে প্রয়োগে তুলনা বা সংশ্লেষমূলক কাজ দেন তাহ'লে পুনরুক্তিদোষ এড়িয়ে আনন্দের মধ্যে পাঠ হবে।

শিক্ষকের দীর্ঘ ব্যাখ্যানও ছাত্রদের বিরক্তির আরেকটি কারণ। সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির নাশকারক বক্তৃতা এক অতি নীরস প্রক্রিয়া।

সাহিত্য পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রদের মনে অনুভবের প্রেরণা জাগিয়ে তাদের সাহিত্যালোচনায় স্বয়ংপ্রযুক্ত করা। পাঠনের পদ্ধতি পুনরাবৃত্তিশীল হ'লে বা স্বাধীন প্রেরণার পথে প্রধাবিত ছাত্রমনকে কৃত্রিম পাঠটীকার রাশ টেনে বাধাগ্রস্ত করলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবেনা। মনে রাখতে হবে যে আধুনিক শিক্ষক শাসক বা নির্দেশক নন,—সহায়ক, পথপ্রদর্শক ও প্রিয়সখা ললিতে কলাবিধৌ,—কোনো-ক্রমেই তাঁরা ছাত্রের স্বয়ংসাধনার পথে বাধা ঘটাবেননা।

কবিতা পড়ানোর একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য" কবিতা নবম শ্রেণিতে পড়িয়ে পুনরালোচনায় ভারতের

াদর্শসম্বন্ধে আলোচনা করে' গৃহস্থাশ্রমের রূপ ও গৃহিযোগীর আদর্শ টিয়ে তোলা যায়। তুলনায় অন্যান্য কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, যমন, "দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ—", "গৃহীরে শিখালে তুমি াাগযুক্তচিতে—", "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়—" ত্যাদি। এইভাবে প্রত্যেক কবিতা পড়ার সময়ে ছাত্ররা সম- ক্তিসংকলনের দ্বারা ধীরে ধীরে একটি স্বয়ংসঞ্চয়ন প্রস্তুত করলে াহিত্যিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যবোধ দৃঢ় হবে।

পাঠক্রমের সর্বশেষ অংশ অধীত বিষয়ের প্রয়োগ। এই অংশে বাধের পরিমাপ এবং সংশয় ও ভ্রমের নিরসন করা যায়। এখানে নে' রাখা ভাল যে কোনো সাহিত্যবিষয়ের "আয়ত্তীকরণ" সম্ভব বা াঞ্ছনীয় নয় এবং তার পরীক্ষাও শিক্ষক করিবেন না। প্রয়োগের কাজ দওয়ার ব্যাপারে তাঁকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। রচনা ও াবন্ধের প্রসংগে আগে বলা হয়েছে যে দীর্ঘ ও পুংখানুপুংখ আলো- নার ভিত্তি ছাড়া লেখার কাজ দেওয়া উচিত নয়। তদনুসারে বলা যায় য একটি সম্পূর্ণ পাঠের পর আলোচনা করে' লিখতে দেওয়া একঘণ্টা ময়ের মধ্যে কঠিন—প্রায় অসম্ভব। এইজন্য পাঠের শেষে যত কম লখতে দেওয়া হয় তত ভাল এবং লিখতে দিলে উপস্থাপনের আলো- নার ভিত্তিতে লেখানো যায় এমন কাজ দেওয়া উচিত। যেমন, একটা াল্প পড়িয়ে প্রয়োগের সময়ে প্রধান চরিত্রগুলির নাম লিখতে বলা হ'ল, মথবা রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন" পড়িয়ে গুপ্তধনের অনুসন্ধানকারীদের ারস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করানো হ'ল। আজকাল বিষয়মুখী প্রশ্নের প্রচলন হয়েছে। ব্যাকরণাদি যে সমস্ত বিষয়ের আয়ত্তীকরণ ও তথ্য- জ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রধান তার পক্ষে এগুলি বিশেষ উপযোগী হ'লেও াসবোধ ও সংশ্লেষণবিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিমাপমূলক বিষয়মুখী প্রশ্নও করা যায়।

লেখা ভিন্ন অন্যভাবেও পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োগ চলে। শিক্ষকের যত্ন বুদ্ধি ও মৌলিকতার ওপর এর সাফল্য নির্ভর করে। কয়েকটি সার্থ প্রয়োগের উদাহরণ নিচে দেওয়া হ'ল।

তৃতীয় শ্রেণিতে চিত্রপরম্পরার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরু পড়ানো হ'ল। "শিশুভারতী"তে যেমন প্রত্যেক স্তবকের জন্য একেক ছবি আছে শিক্ষক তার মতো বড় বড় ছবি এঁকেছিলেন। প্রয়োগে বিষয় ছিল কবিতা থেকে অংশ উদ্ধৃত করে' ছবিগুলির নামকরণ। এতে পারম্পর্যানুসারে ছবিগুলির নাম করতে গিয়ে কাহিনীর পুনরালোচ হ'ল, উপরন্তু কবিতা থেকে ছবির উপযোগী উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে ছাত্র সাহিত্যবোধের পরিচয় দিল।

চতুর্থ শ্রেণিতে "ভাতের জন্মকথা"র ওপর নির্ভর করে' চিত্রে সাহায্যে ধানের চাষ ও চালের উৎপাদনসম্বন্ধে পড়ানো হয়েছিল প্রয়োগের সময়ে ছাত্রদের চিত্রগুলিকে পারম্পর্যানুসারে সাজি দিতে বলা হ'ল। ধানচাষের সমগ্র কাহিনীটি তারা অনুসরণ কর পেরেছে কিনা সাহিত্যরসের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া গেল।

অষ্টম শ্রেণিতে গ্রাম্যজীবনের বর্ণনামূলক কবিতা পড়িয়ে প্রয়োগে সময়ে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচ করা হয়েছিল। এতে গ্রামের বর্ণনার সংগে ছাত্রদের উভয়দেশদর্শ দ্বারা বিচারক্ষমতা বর্ধিত হ'ল।

নবম শ্রেণিতে দীনেশচন্দ্র সেনের "দশরথ" পড়িয়ে প্রয়োগে রা বনবাস সম্বন্ধে কার কতটা দায়িত্ব সেই নিয়ে আলোচনা হ'ল। এ বিষয়বস্তুর পুনরালোচনা ও পক্ষপাতহীন মনোভাবের গঠন দুইই হ' কেননা, দশরথের দায়িত্বটুকুর বহু অংশীদার রয়েছে বলে' আলোচনায় কেবল দুটি দিক দর্শন করা সম্ভব হয়নি।

দশম শ্রেণিতে ওয়াজেদ আলির "ভারতবর্ষ"-পড়িয়ে প্রয়ো

সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা হ'ল। ওই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যের চিত্র আছে মাত্র, পাশ্চাত্ত্যের সংগে তুলনায় সেই চিত্র পূর্ণতা লাভ করলো এবং ছাত্রদের মনে বিশ্বমানবতার ভাব উদ্বোধিত হ'ল।

পুনরালোচনা দীর্ঘ বা দুই অংশে বিভাজ্য হ'লে পৃথক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়না। উপরিউক্ত প্রয়োগের উদাহরণগুলির অধিকাংশ এই শ্রেণিভুক্ত। তর্ক ও আলোচনার জন্য প্রথমে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সমস্ত বিষয়টি তৈরি করে' নিয়ে তারপর কাজ করালে পুনরালোচনা ও প্রয়োগ একত্রে হয়। অনেকে এই সংযুক্ত প্রক্রিয়াকে অভিযোজন আখ্যা দেন।

বোর্ডের কাজ পাঠক্রমের অন্তর্গত। ছবি, চার্ট ইত্যাদি থাকলেও শিক্ষক যা পড়াবেন তার টীকা বোর্ডে করলে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে ছাত্রদের সামনে প্রতিভাত হয়। বোর্ডের কাজ সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়—সংক্ষিপ্তসার ও শব্দার্থ। ব্যাকরণের পাঠে বোর্ডের কাজ দুই অংশে হয়,—উদাহরণ এবং সূত্র ও সংজ্ঞা। এইজন্য ক্লাসে দুটো বোর্ড থাকা ভাল। শিক্ষক কিন্তু মনে রাখবেন সাহিত্যপাঠের সময়ে শব্দার্থ ও ব্যাকরণের আলোচনা যেমন যতদূর সম্ভব কম করা হবে তেমনি বোর্ডেও ওই বিষয়সম্পর্কিত লেখা যতদূর সম্ভব বর্জনীয়। সংক্ষিপ্তসার যেন সারাংশের মতো না হয়ে চুম্বকের মতো হয়। উচ্চশ্রেণিতে এই সংকেতের পূর্ণ বাক্যরূপ না নিলেও চলবে। সার্থক বোর্ডের কাজের একটি উদাহরণ দিই, চতুর্থ শ্রেণিতে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের "সুখদুঃখ" পড়াবার সময়ে বোর্ডে "সুখ" ও "দুঃখ" এই দুই স্তম্ভ করে' একদিকে সুখের ও একদিকে দুঃখের লক্ষণ ও কারণ সংকেতদ্বারা দেখিয়েছিলেন।

অনেক শিক্ষক উপস্থাপনের শেষে পাঠ্যাংশের সারমর্ম রচনা করেন,

কিন্তু বোর্ডের কাজ পুনরালোচনা প্রকৃতিক নয় পাঠপ্রদানসহায়করূপে চার্ট, ছবি প্রভৃতি দৃশ্যোপকরণের গোত্রীয়। এইজন্য বোর্ডের কাজ উপস্থাপনের সংগে চলে। এই সময়ে যেমন যে বিষয়ের উত্থাপন আলোচনা হবে শিক্ষক তখন তার সংকেত বোর্ডে তুলে দেবেন।

বোর্ডে ছবি আঁকার ক্ষমতা শিক্ষকের মস্ত সহায়। বিশেষ করে নিচের শ্রেণিতে ছড়ার সংগে ছবি আঁকা চমৎকার হয়। যেমন একা নোড়ে আর তার তালগাছ, হট্টিমাটিমাটিম আর তার ডিম, শিক্ষক যদি রঙিন খড়ি দিয়ে বোর্ডে এঁকে দেন তবে তা সংগে আনা ছবি দেখানো চেয়ে চিত্তাকর্ষক হয়। রবীন্দ্রনাথের "নৌকাযাত্রা" (মধুমাঝির ওই যে নৌকাখানি"—)পড়াতে প্রথমে নৌকা, তারপর ঘাট, তারপর তার যাত্রা, পরে পরে এঁকে দেখানো যায়। তবে ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের ছবির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচারের ক্ষমতা থাকায় শিক্ষকের চিত্রাংকন ক্ষমতা উঁচুদরের না হ'লে সে-কাজ নিরাপদ নয়। উচ্চশ্রেণিতে শিক্ষক তৎপরতার সংগে নক্সা, মানচিত্রাদি আঁকতে পারলে ছাত্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন। অবশ্য সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রকৃতি পরিচয় প্রভৃতির পাঠে এই গুণের বেশি প্রয়োজন হয়।

বোর্ডের কাজ ভিন্ন পড়াবার অন্যান্য উপকরণ বা সরঞ্জামের ব্যবহার হয়। বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করবার জন্য যে-সব চিত্র, মানচিত্র, নক্সা, চিত্রকল্প, রূপকল্প, নমুনা, নিরীক্ষা (experiment প্রভৃতির যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলি এই শ্রেণিভুক্ত। এইসব উপকরণের উপযোগিতা থাকার দরকার। যেমন, যে ক্লাসের ছাত্রেরা ভূগোলে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি তাদের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রে ম্যালেরিয়ার জন্মস্থানের নির্দেশ অনুপযোগী অথবা ঘোড়ার বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাতে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি ঘোড়া এনে উপস্থিত করা হাস্যকর। ছবি যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে ওপরের

।সে না দেখানো ভালো। নিচের ক্লাসে ছড়া, গল্প, যাই পড়ানো াক-না-কেন, ছবি দেখানো একটি মহা আনন্দজনক ব্যাপার।

উপকরণ যেমন প্রয়োজনীয়, উপকরণের বাহুল্য তেমনি পাঠ্যবিষয় েকে ছাত্রের মন বিক্ষিপ্ত করে। বিশেষত বাংলার শিক্ষককে দৃষ্টি াখতে হবে যাতে উপকরণবাহুল্যে সাহিত্যানুভব চাপা পড়ে' না যায়।

সমউক্তিসংকলন পাঠক্রমের আরেক অংগ। সম-উক্তিতে সাহিত্যিক নুসংগদ্বারা ছাত্রের মনে পাঠ্যবিষয় সরস ও উজ্জ্বল হয়, সাহিত্যানুভবে াহায্য করে। তবে সম-উক্তিতে যেন সত্যকার সাদৃশ্য থাকে এবং তিরিক্ত বেশি সম-উক্তি না দেয়াই ভালো, কেননা, তাতে ছাত্রদের ন বিভ্রান্ত ও মূলবিষয় থেকে বিকৃষ্ট হ'তে পারে। ছাত্রদের দ্বারা য়ংসঞ্চয়নের সংগে সমউক্তিসংকলন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক অভ্যাস।

প্রশ্ন করা বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপরিহার্য অংগ। শিক্ষক যদি ক্তৃতার আকারে পাঠ্যবস্তুর ব্যাখ্যা করেন তবে ছাত্রদের ধৈর্যচ্যুতি বে। বালস্বভাব এই যে দেহমন দিয়ে সে সবদা এগিয়ে গিয়ে আলোচ্য বিষয়টিকে আক্রমণ করতে চায়; ধীরভাবে বসে' ভাবগ্রহণ বার জন্য সে তৈরি হয়নি। কাজেই পাঠক্রম এমনভাবে তৈরি করতে বে যাতে ছাত্র নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় শিখতে পারে। তাছাড়া নোতুন পাঠ ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের ওপর স্থাপিত করতে হয় এবং তার মনে যা অসজ্জিত তাকে সজ্জিত করে', যা অবচেতনে বিরাজিত তাকে চেতনায় এনে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত পাঠ। এজন্য পাঠের প্রত্যেক স্তরে প্রশ্নের প্রয়োজন। ভূমিকায় সন্ধানী ও অনুপ্রেরক প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষক ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের পরিমাপ করবেন এবং ওই জ্ঞানের কতটা চেতনায়, কতটা অবচেতনে, কতটা সজ্জিত, কতটা বিক্ষিপ্ত তা অনুমান করে' নিয়ে, সেগুলিকে জাগ্রত ও শ্রেণিবদ্ধ করে', ছাত্রদের নোতুন পাঠগ্রহণে উন্মুখ করবেন। তারপর উপস্থাপনে পঠমান বস্তুর বিষয়ে

প্রশ্ন করে' পাঠবোধের পরিমাপ করে' গভীরতরভাবে বোঝার দিবে অগ্রসর হবেন এবং বিচারমূলক প্রশ্নের দ্বারা যুক্তি ও অনুমানের প্রয়োগে বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষিত করে' আত্মনীন করতে সাহায্য করবেন। পুনরালোচনা ও প্রয়োগের প্রশ্নে লব্ধ অনুভব ও অর্জিত জ্ঞানের পরিমার্জন ও পরিমাপ হবে।

প্রশ্নে করে' উত্তর আদায় করা সূক্ষ্ম কাজ। অনেক সময়ে ছাত্রেরা সহজ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেনা, তখন উত্তরটি না বলে' দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নের দ্বারা উত্তর আদায়ের চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্তব্য। হয়ত ছাত্র প্রশ্নটি বুঝতে পারেনি, সে-ক্ষেত্রে প্রশ্নের ভংগির পরিবর্তন দরকার। উদাহরণস্বরূপ,—"গরু আমাদের কি কি উপকার করে?"—এই প্রশ্নের উত্তর যদি নিচের ক্লাসের ছাত্রেরা দিতে না পারে, তবে "গরুর কোন কোন জিনিস আমাদের কাজে লাগে?"—জিজ্ঞাসা করা যায় এবং তা-ও বলতে যা পারলে গরুর প্রত্যেক অংশ নিয়ে পৃথক প্রশ্ন করতে হবে। ছাত্র প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই দিতে না পারলে অনেক সময়ে বইয়ের যে অংশে সেটি নিহিত আছে সেই অংশটি আরেকবার পড়ালে উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

উত্তরপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য অনেক শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যার মধ্যে উত্তরটি নিহিত থাকে (leading or suggestive questions); এরূপ প্রশ্নের একটি লক্ষণ যে "হ্যাঁ" বা "না" বলে' এর উত্তর দেওয়া যায়, যথা,—"গরু আমাদের খুব উপকার করে, না?"—এর উত্তরে ছাত্রেরা নিশ্চয়ই "হ্যাঁ" বলবে। উত্তর সহজলভ্য হ'লেও এরূপ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নই নয়।

প্রশ্ন যাতে অবিশেষিত বা অস্পষ্ট না হয় সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, কোনো কবিতার একটি স্তবক পড়িয়ে "এখানে কবি কি বলতে চেয়েছেন?"—জিজ্ঞাসা করা অনুচিত; কারণ ছাত্র

ওই অংশের শব্দান্তর (paraphrase) করতে গিয়ে সাহিত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অপরপক্ষে—"এই কবিতাটি কেমন লাগলো?"—বা—"এর কোন অংশ তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?"—জাতীয় প্রশ্ন ছাত্রের সদ্যোদ্বুদ্ধ সাহিত্যবোধের পক্ষে অতিরিক্ত অস্পষ্ট।

যেমন সাধারণভাবমূলক প্রশ্নদ্বারা প্রকৃত সাহিত্যবোধ হয়না, তেমনি, শাব্দিক অর্থবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন করাও রসবোধের পরিপন্থী, যথা, দশম শ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য" কবিতা পড়াতে 'এই ছত্রের অর্থ কি?"—"এই অংশে স্ত্রী অর্থে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে?"—"কোন শব্দে ভগবানের নাম বোঝাচ্ছে?" প্রভৃতি প্রশ্ন অবাঞ্ছনীয়।

বাস্তব ও বিশিষ্টবোধের ওপর প্রশ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যথা, পঞ্চম শ্রেণিতে "বীরপুরুষ" পড়িয়ে প্রথম স্তবকের বিশ্লেষণের সময়ে জিজ্ঞাসা করা যায়—"আমি কে?"—"সে কোথায় যাচ্ছে?"—"কাকে নিয়ে যাচ্ছে?"—কিসে চড়ে' যাচ্ছে?"—"কোথা দিয়ে যাচ্ছে?" ইত্যাদি।

ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্র যাতে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সমান সুযোগ পায় সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণিতে এমন দুয়েকটি বুদ্ধিমান ছাত্র দেখা যায় যারা সব প্রশ্নের উত্তর সর্বাগ্রে ধরতে পারে। শিক্ষক যদি সাধারণভাবে প্রশ্ন করেন তবে বুদ্ধিমানেরাই উপকৃত হয় এবং অপরেরা পাঠানুসরণে অসুবিধা বোধ করে। এইজন্য শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের পর নাম করে' উত্তরদাতা নির্দিষ্ট করে' দেবেন। বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন ছাত্রেরা যাতে প্রশ্ন ও পাঠের সমান অংশ পায় তার-জন্য এই ব্যবস্থা। প্রশ্ন করার পদ্ধতি এই যে শিক্ষক প্রশ্নটি প্রথমে সাধারণভাবে শ্রেণির সম্মুখে স্থাপিত করবেন ও অব্যবহিত পরে উত্তর-দায়কের নাম করে দেবেন। এতে প্রশ্ন-করা ও নাম-ডাকার মধ্যবর্তী

সময়ে সকলকে উত্তরটা ভেবে রাখতে হয়, কারণ শিক্ষক কার নাম ডাকবেন তা তারা জানে না ; এতে প্রশ্নের উত্তর একজনকে দিতে হ'লেও সকলকে চিন্তা করতে হয়। ঠিক এই কারণেই শিক্ষক ক্লাসের ছেলেদের বসা বা রোলনম্বর অনুসারে প্রশ্ন করবেন না, এলোমেলো-ভাবে জিজ্ঞাসা করবেন।

শিক্ষক কেবল সকলকে সমভাবে প্রশ্ন বণ্টন করবেন না, প্রত্যেককে তার বুদ্ধির উপযোগী প্রশ্ন দেবেন ; কঠিনতম প্রশ্নগুলি বুদ্ধিমান ছেলেদের দেবেন এবং অল্পবুদ্ধিদের জন্য সহজগুলি রাখবেন। অনুপযোগী প্রশ্নে সকলেরই ক্ষতি হয়। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি খাটাবার যথেষ্ট সুযোগ না পাওয়া আর বুদ্ধিহীনের অতিরিক্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে ব্যর্থমনোরথ হওয়া দুইই হানিকর।

যেমন উপকরণপ্রসংগে, তেমনি প্রশ্ন ব্যাপারেও যাতে প্রশ্নবাহুল্যে পাঠের সাহিত্যিকতার হানি না ঘটে সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। প্রশ্নের সংগে শিক্ষকের ভাষণের সামঞ্জস্যময় সংমিশ্রণ না হ'লে, পাঠটি হয় প্রশ্নমালায় পরিণত হয়ে সংহতি হারাবে, নয়তো শিক্ষকের বক্তৃতার আধিক্যে শ্রেণিকে নিশ্চেষ্ট ও আগ্রহহীন করে ফেলবে ; *সুশিক্ষক মধ্যপথে অগ্রসর হবেন।*

পাঠক্রমে ছাত্রদের বয়স, পূর্বজ্ঞান এবং পাঠের উদ্দেশ্যের উল্লেখ করার নিয়ম আছে। বয়সের নির্দেশ পাঠের মাননির্ণয়ের জন্য। একই বিষয় বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণি থেকে আরম্ভ করে' বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট থাকতে পারে ; কাজেই ছাত্রদের বয়সের তারতম্যানুযায়ী পাঠনরীতির ভিন্নতার দ্বারা বিষয়বস্তুর উপযোগিতাসম্পাদন করতে হয়।

নূতন পাঠ পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে পাঠটীকার প্রথমে পূর্বজ্ঞানের উল্লেখ প্রয়োজনীয়। ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়সম্পৃক্ত যা-কিছু

জ্ঞান, বোধ ও অভিজ্ঞতা আছে তৎসমুদয়ের মধ্যে কেবল প্রস্তুত পাঠে ব্যবহৃত অংশটুকুর উল্লেখ করতে হয়।

পাঠের উদ্দেশ্য নানাপ্রকার হ'তে পারে। একটি কবিতা হয়তো নিচের শ্রেণিতে অনুভবদ্বারা পড়ালে যথেষ্ট আবার উচ্চশ্রেণিতে সেটিকে সাহিত্য ও কবিজীবনের ধারার সংগে সংশ্লিষ্ট করে দেখাতে না পারলে পাঠের উদ্দেশ্য সফল হবেনা। তাছাড়া যে কবিতা, প্রবন্ধ বা গল্প পাঠ্য থাকবে তার বিশেষ গুণাগুণের অনুসারে উদ্দেশ্যের উপযোগিতা নির্ণিত হয়। যেমন "ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল" নামক প্রবন্ধপাঠের উদ্দেশ্য "সাহিত্যানুরাগবর্ধন" বা নিছক হাস্যরসাত্মক কবিতা পড়ানোর উদ্দেশ্য "নৈতিক উন্নতি" হওয়া উচিত নয়।

বিশেষ অংশের বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া সাধারণভাবে কতকগুলো উদ্দেশ্য ধরে' নেওয়া হয়; যেমন, ব্যাকরণশিক্ষার উদ্দেশ্য ভাষাব্যবহারের বিশুদ্ধি বাড়ানো ও ভাষাসম্বন্ধে ঔৎসুক্যের ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগির সৃষ্টি; কবিতার উদ্দেশ্য রসাস্বাদন; প্রবন্ধে মনীষীরা সুচিন্তিত মতাবলি লিপিবদ্ধ করেন বলে' প্রবন্ধপাঠের উদ্দেশ্য ছাত্রদের চিন্তাধারা পুষ্ট করা এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে বিবিধ জ্ঞান ও তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার ক্ষমতা জন্মানো।

আজকাল নোতুন নোতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবনে ওপরে বর্ণিত ক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলাশিক্ষায় সেগুলির যথেষ্ট প্রচলন হয়নি।

যে-সব বিদ্যালয়ে খেলা ও কাজের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেখানে গৃহীত প্রকল্পকে রূপায়িত করার প্রসংগে অন্যান্য বিষয়ের সংগে ভাষার ব্যাবহারিক শিক্ষা হয়ে থাকে। যেমন, ছাত্রেরা হয়তো একটি দোকান খুলেছে; দোকানের নাম, জিনিসের লেবেল, বিজ্ঞাপনাদি পাঠ করে', নিজের হাতে সুন্দর করে' লিখে,

খাতায় জমাখরচের হিসেব করে' এবং ক্রেতাবিক্রেতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তারা বাংলাভাষা বলা, পড়া ও লেখার ব্যাবহারিক জ্ঞানলাভ করে। এই ধরনের কাজ একদিনে সম্পূর্ণ হয়না, একে বিদ্যালয়ের স্থায়ী অংগরূপে গ্রহণ করলে তবেই এর উদ্দেশ্য সফল হয়। সম্পূর্ণ কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় না হ'লেও অন্তত প্রত্যহ, অথবা সপ্তাহে ক'দিন; এরজন্য পৃথক ঘণ্টা নির্দিষ্ট রাখা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি দোকান যদি বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে লেখাপড়ার সুবিধা ভিন্ন অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। সাধারণত ছেলেরা খাতা-পেন্সিল-বই থেকে আরম্ভ করে' চকোলেট-লজঞ্জুস-চীনেবাদাম প্রভৃতি যে-সব জিনিস বাইরে কিনতে অভ্যস্ত, বিদ্যালয়ের ভেতরই যদি সেগুলি পাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাতে তাদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে, হিসাব শেখা হয় এবং তারা কিভাবে টাকাপয়সা খরচ করছে না-করছে সেদিকে শিক্ষকেরা দৃষ্টি রাখতে পারেন। এই দোকান সমবায়পদ্ধতিতে গঠিত হ'লে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক কর্মপন্থার অভ্যাস হবে।

এক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে স্থানীয় কলেরা মহামারীর সময়ে বীজাণুমুক্ত টিফিনের ব্যবস্থা করার জন্য ছেলেদের দিয়ে একটি ছোট দোকান প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ক্রমে ওই দোকান টিফিন ছাড়াও অন্যান্য নানা জিনিস বিক্রয় করতে থাকে এবং লাভের অংশে ছেলেদের দিয়ে পাশাপাশি একটি ব্যাংকও খোলা হয়। একটি ছোট ঘরে বড়দের ব্যাংকের অনুরূপ আসবাব, উপকরণাদি দিয়ে ব্যাংক বসে এবং ব্যাংকপরিচালনের নিয়মানুযায়ী ছেলেরাই তার পরিচালনা করে। শিল্পকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে বই বাঁধাই, খাতাসেলাই, ছাপাখানা প্রভৃতি যন্ত্রশিল্প এবং বাগানের কাজ দোকান ও ব্যাংকের সংগে সহযোগিতায় পরিচালিত হ'তে পারে। বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানত প্রকল্পের মধ্যে দিয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

এইভাবে ডাকঘর ও রেলস্টেশনের খেলা, বাগান করা, সুতো কাটা, শিল্পকর্ম ক্লাসের পুস্তকসংগ্রহের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি নানা কাজে আনন্দের সংগে কর্মশীলতার মধ্যে দিয়ে বিবিধ প্রকারের নৈপুণ্যের সংগে মাতৃভাষার ব্যবহার শিক্ষা হয়। এতে বিদ্যালয়ের অধীত বিষয়গুলির পরস্পরের এবং সকলের মাতৃভাষার সংগে অনুবন্ধ স্থাপিত হয় এবং ঘর, বাড়ির ও বিদ্যালয়ের একটি সামঞ্জস্যময় পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়।

ওপরের শ্রেণির ছাত্রেরা বিদ্যালয়সভার গঠন, সাহিত্য, খেলাধুলা বা অভিনয়ের সমিতির অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ের পত্রিকার প্রকাশন, গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা আলোচনাসভা ও উৎসবাদির আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ্যে এবং স্কাউট, এন-সি-সি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজের সংগে সংযোগে এই শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করে। তাছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে কোনো দেশহিতকর কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কাজ অর্থে চাঁদা তোলা বা একদিন স্বেচ্ছাসেবক হওয়া নয়; শিক্ষাবিস্তার, আতুরের সেবা প্রভৃতি কোনো স্থায়ী গঠন-মূলক কাজ।

যে-কোনো প্রকল্পে সহযোগিভাবে অংশগ্রহণের সময়ে যাতে শ্রেণির প্রত্যেক ছাত্র তার বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের উপযোগী অংশ পায় সে-দিকে শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন। যারা ভাল ছবি আঁকতে পারে আঁকবে, যারা লিখতে পারে তারা লিখবে, সুবক্তা বক্তৃতা দেবে, বুদ্ধিমানেরা জ্ঞানসংগ্রহ ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করবে, অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধি যাদের তারা কায়িক দিকে অংশগ্রহণ করবে।

প্রকল্পমূলক শিক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রদের ব্যাবহারিক শিক্ষা ও কর্মতৎপরতার সহায়ক, তেমনি অন্যদিকে জ্ঞানানুসন্ধানেরও উদ্বোধক। ছাত্রের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত হ'লে সে নোতুন নোতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য

উন্মুখ হয়, সাহিত্যের আস্বাদ পেলে নূতনতর স্বাদগ্রহণ করতে চায়। এই সব আকাংক্ষা বিদ্যালয়ের ঘণ্টাহিসেবে ওজনকরা পাঠের দ্বারা মেটেনা, তাই ছাত্রদের বুদ্ধি ও প্রেরণা অনুযায়ী স্বাধীন পাঠপদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। আমেরিকার "ডল্টন" প্রকল্প এই প্রচেষ্টার রূপভেদ এবং অন্যান্য রূপেও এর ব্যবহার হয়। ছাত্রদের নিয়মিত ঘণ্টায় ঘণ্টায় শিক্ষা দেওয়া হয় না, বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে বিষয়কক্ষ-অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ ও পুস্তকাদি সমন্বিত ঘর থাকে এবং সেই ঘরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা শিক্ষায় সাহায্য করার জন্য উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেক ছাত্র নিজ রুচি, নৈপুণ্য ও বুদ্ধি অনুসারে সপ্তাহ বা মাসের করণীয় পাঠ চিহ্নিত করে' নেয় এবং স্বাধীন উপযাচনায় শিক্ষকদের সাহায্যে এবং পুস্তক ও উপকরণাদির ব্যবহারে শিক্ষালাভ করে। এতে স্বচেষ্টায় জ্ঞানার্জন করে' ছাত্রেরা জ্ঞানের মূল্য বুঝতে শেখে ও তাদের দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়। জ্ঞানের উপকরণ ও আধার তাদের সম্মুখে থাকাতে জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি পায়, রসরূপের সাগরে ডুব দিয়ে ব্রহ্মাস্বাদ ঘটে। পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না থাকায় এদের মুখস্থ করে' পরীক্ষা পাশ করার মনোবৃত্তি জন্মায় না।

এই পদ্ধতি সুপরিচালিত না হ'লে অতিমাত্রিক ব্যক্তিগত কাজের ফলে ছাত্রগণের সামাজিক বৃত্তির পরিণতি ব্যাহত হয়ে' তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে' পড়তে পারে। এইজন্য দিনে অন্তত একবার একত্রে পাঠগ্রহণ এবং সহযোগিতামূলক আলোচনা বা গবেষণার কাজের ব্যবস্থার দ্বারা এই দোষের নিবারণ করা হয়। সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি ও ব্যক্তিতন্ত্র পাঠপদ্ধতির সামঞ্জস্যময় সংমিশ্রণই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-ব্যবস্থা বলে' গৃহীত হয়ে' থাকে।

অতিমাত্রিক পালবদ্ধতা ও ব্যক্তিতান্ত্রিকতার উভয়সংকট এড়াবার জন্য আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে "কর্মশালা"র পরিকল্পনা হয়েছে তাতে

ছাত্রদের গোষ্ঠিবদ্ধভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। তাদের স্বয়ংসাধনার ওপর নির্ভরশীল স্বাধীন ভাষা ও সাহিত্যচর্চার জন্য পাঠ্যক্রমটিকে কতকগুলি ছোট ছোট স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত করে' ছাত্র-শিক্ষকের সমবেত পরিকল্পনায় এককেটি পাঠ বা কর্মপ্রকল্প গৃহীত হয়। প্রত্যেক প্রকল্পের বিষয়ীভূত অংশটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে'ও ছাত্রদের রুচি ও ক্ষমতানুযায়ী অনুরূপসংখ্যক দলে ভাগ করে' প্রত্যেক দলে এককে ভাগের কাজ করতে দেওয়া হয়। ছাত্রেরা সমবেত চেষ্টায় নিজ নিজ দলের কাজ সম্পূর্ণ করে' উপকরণসহকারে সমগ্র শ্রেণির সম্মুখে উপস্থাপিত করে। তারপর প্রত্যেক দল অপরাপরের প্রস্তাবিত বিষয়াংশগুলিও স্বচেষ্টায় শিখে নেয়।

এইসব নূতন নূতন পদ্ধতির উৎকর্ষ স্বীকৃত হ'লেও প্রচলিত রীতির বিদ্যালয়ে, বিশেষত উচ্চাধিকারীর দ্বারা উপস্থাপিত পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থার অধীনে সহসা কোনো আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। এইজন্য ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দ্বারা নূতন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনেক বিদ্যালয়েরই নিচের ক্লাসে নার্সারি, মন্তেসরি, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতির অনুরূপ খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আজকাল অভিনয়, আলোচনা, বিতর্ক, দেয়ালপত্রী, সাহিত্যপত্রিকা, সাহিত্যসমিতি প্রভৃতি পাঠ্যসহায়ক কার্যকলাপও অনেক বিদ্যালয়েই অবশ্যগ্রহণীয় বলে' মনে করা হয়। উপরন্তু বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ নোতুন নোতুন পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্যদানে উদ্যত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আশা করা যায় যে পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হ'লে শিক্ষার উন্নতিমূলক আরো অনেক আদর্শই বিদ্যালয়গুলিতে গৃহীত হবে।

পাঠটীকা

পাঠদান একটি সজীব প্রক্রিয়া, এর টীকারচনা করা জীবনকে খাঁচায় পোরার মতো। তবু নানা কাজে বিব্রত শিক্ষকদের সুবিধার জন্য নিচের প্রস্তাবগুলি দেওয়া হ'ল, শিক্ষকেরা নিজ প্রতিভার আলোতে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে ব্যবহার করবেন, লক্ষ্য করবেন এখানে দেওয়া বিভিন্ন পাঠটীকার রচনায়ও এই বৈচিত্র্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির যে আদর্শ পাঠটীকা দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটিই বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষকশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় যাচাই করা। একই বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠটীকা দেওয়া হয়নি, কেননা মান অনুযায়ী পরিবর্তিত করে' নিচের ক্লাসের পড়া 'ওপরের ক্লাসে এবং ওপরের ক্লাসের পড়া নিচের ক্লাসে ব্যবহার করা চলবে। এক শ্রেণিতেও অনুরূপ বিষয়ের একাধিক পাঠ দেওয়া হয়নি কেননা একটি আদর্শ নিয়ে বিভিন্ন পাঠটীকা রচনা করা যাবে।

বিভিন্ন বিষয়শাখার পাঠের মধ্যে দেওয়া হয়েছে—গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ, প্রবন্ধরচনা ও সাহিত্যের ইতিহাস। গদ্যপাঠের ক্ষেত্রে বিষয়বৈচিত্র্যের কথাও চিন্তা করা হয়েছে, যেমন সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস, বিজ্ঞান, ইত্যাদি। একটি বিষয় নিয়ে পরপর একাধিক দিন পড়াবার ধারাবাহিক ক্রমও দেখানো হয়েছে।

শিক্ষকশিক্ষণমহাবিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পাঠটীকায় কতকগুলি শীর্ষ দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে, সেগুলি নিচে যথাক্রমে দেওয়া হ'ল এরপর প্রত্যেক পাঠটীকায় প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া এগুলির পুনরুল্লেখ

করা হবে না। কিন্তু শিক্ষক নিজের রচিত প্রত্যেক পাঠটীকায় ওই শীর্ষগুলির পূর্ণ উল্লেখ করবেন। শীর্ষগুলি এইরূপ :—

বিদ্যালয় — বিষয়—

শ্রেণি— বিশেষ বিষয়—

ছাত্রসংখ্যা—

গড়বয়স—

সময়—

তারিখ—

শিক্ষকের নাম—

ষষ্ঠ শ্রেণি

(১)

ছাত্র সংখ্যা—৪০ বিষয়—বাংলা কবিতা।

গড় বয়স—১১ + বিশেষ বিষয়—রাজার রাজা

সময়—৪০ মিঃ রমণীমোহন ঘোষ।

উদ্দেশ্য :—ছাত্রদের উপস্থিত কবিতার অর্থ ও রসবোধ করানো।

—বাংলা কাব্যসাহিত্যের সংগে পরিচিত করিয়ে তাদের কাব্যপাঠে আগ্রহান্বিত করা।

—কবিতাটির উচ্চভাবে তাদের অনুপ্রাণিত করা।

উপকরণ :—শ্রেণিকক্ষের সাধারণ, পাঠ্যপুস্তক, সম-উক্তি-সংকলন।

পূর্বজ্ঞান :—ছাত্রেরা অনুরূপমানের বাংলা কবিতা পড়ে' অর্থ ও রসগ্রহণ করতে পারে, কথা ও কাহিনীর কিছু কিছু কবিতা পড়েছে।

আয়োজন :—ছাত্রদের মন পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং পাঠের ভিত্তিস্থাপনের জন্য শিক্ষক প্রশ্নোত্তরদ্বারা আলোচনা করবেন :—

—লোকে ভগবানের কাছে কিসের কিসের জন্য প্রার্থনা করতে পারে?

—কোন কোন প্রার্থনা তোমার ভালো মনে হয়?

—ধনসম্পদের জন্যই কেবল প্রার্থনা করা ভালো নয় কেন?

—তুমি যদি কোনো মস্ত বড ধনী বা রাজাকে ভগবানের কাছে টাকাপয়সা চাইতে শোনো তো কি মনে হবে?

পাঠঘোষণা:—আজকে এক রাজার এক প্রার্থনার বিষয়ে কবিতা পড়ে শোনাবো।

উপস্থাপন:—শিক্ষক সমগ্র কবিতাটি পড়ে' শোনাবেন। তারপর বইয়ের পাতা নির্দেশ করে কবিতা ও লেখকের নাম পড়ে' বলতে বলবেন এবং বোর্ডে তুলে দেবেন—**রাজার রাজা রমণীমোহন ঘোষ।**

কবিতাটি ছাত্রদের একবার নীরবে পড়িয়ে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

পদ্ধতি	বিষয়
রাজার রাজা কে?	ভগবান রাজার রাজা
ভগবানকে কেন রাজার রাজা বলা হয়?	রাজা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সেই রাজাও যাঁকে নমস্কার করে, যাঁর কাছে আবেদন জানায়, সেই ভগবান রাজার রাজা।
এই কবিতায় কে কে ধন চাইছিল?	এই কবিতায় এক রাজা এবং এক সন্ন্যাসী ধন চাইছিল।
রাজা কার কাছে চাইছিল? সন্ন্যাসী কার কাছে চাইছিল?	রাজা ধন চাইছিল ভগবানের কাছে আর সন্ন্যাসী রাজার কাছে ধন চাইতে এসেছিল।

পদ্ধতি	বিষয়
শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী কার কাছে চাইবে ঠিক করল? কেন?	রাজার প্রার্থনা শুনে সন্ন্যাসী ঠিক করল সেও ভগবানের কাছে ধন ভিক্ষা করবে।

এবার কবিতাটিকে কয়েক অংশে ভাগ করে' একেক অংশ ছাত্রদের দিয়ে সরব পাঠের পর বিশ্লেষণ হবে। সংগে সংগে বোর্ডে শব্দার্থ ও সারাংশ লেখা হবে।

প্রথম অংশ—"নরপতি যবে······করুণা করে'।"

নরপতি কে? সে কোথায় কি করছিল?	এক রাজা ভজনাগারে দেবতার বন্দনা করছিল।
তখন কে এল? কিসের আশায় সে দাঁড়িয়ে রইল?	এই সময়ে এক সন্ন্যাসী এসে রাজার দর্শনলাভের ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে রইল।
দর্শন-আশা কি?	দর্শন—আশ=দেখার ইচ্ছা
আশার বদলে আশ কেন?	কবিতায় আশা=আশ।
রাজার মনে দেবতার প্রতি কতটা ভক্তি হয়েছিল? তাঁর গভীর ভক্তি তাঁর গলার স্বরে কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল? কিসে ভেজা গলার স্বর? চোখের জল কেন?	দেবতার প্রতি রাজার গভীর ভক্তি প্রকাশ পেল যখন সে উপাসনা শেষ করে' চোখের জলে ভেজা স্বরে প্রার্থনা করতে লাগল। তার চোখে জল এলো কারণ মনের গভীর ভাবে মানুষের চোখে জল আসে, যেমন ভক্তি-অশ্রু, আনন্দাশ্রু।
শব্দার্থ—	ভকতি—ভক্তির কবিতার রূপ। সিক্ত—ভেজা।
নরপতি কি চাইল?	রাজা ধনসম্পদ আর বিভবের জন্য প্রার্থনা করল।

পদ্ধতি	বিষয়
শব্দার্থ—	বিভব—বিভব মানেও ধনসম্পদ। যেমন আমরা টাকাপয়সা বলি।
রাজার তো অনেক ধনসম্পদ থাকে, তবু সে আরো চাইল কেন?	রাজা ধনী হয়েও আরো ধন চাইল, কেননা মানুষের আশা কখনও মেটেনা।
শিক্ষিকা বলবেন—	চলিত ভাষায় একটা প্রবাদ আছে— "যার ছেলে যত পায়— তার ছেলে তত চায়।"
তোমরা 'দুই বিঘা জমিতে' পড়েছ—	"এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, যার আছে ভূরি ভূরি।"
'প্রতিনিধি' কবিতায় পড়েছ—	"এ কেবল দিনেরাত্রে জল ঢেলে ফুটাপাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবারে।"
শব্দার্থ—	উপাসনা, বন্দনা = পূজা।

দ্বিতীয় অংশ'—'বাহিরে আসিতে ·····পুরাইবে অভিলাষ।"

পদ্ধতি	বিষয়
রাজা মন্দিরের বাইরে এসে কাকে দেখল? তার শরীর কিরূপ? সে কি করছিল?	মন্দিরের বাইরে এসে রাজা এক সন্ন্যাসীকে দেখল। তার দেহে ছাই মাখা, সে তার দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে।
ভস্মভূষিত কায় মানে কি?	সংসারী লোকে নিজেদের দেহ গহনা বা ভূষণ দিয়ে সাজায় বা ভূষিত করে, কিন্তু সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী বলে' অন্য লোক যা ফেলে দেয় সেই ভস্ম মেখেই সাজে।

পদ্ধতি	বিষয়
	ভস্মভূষিত-কায়—ছাই দিয়ে সাজানো দেহ।
সন্ন্যাসীর চলে' যাওয়াটা কেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল ?	রাজার কাছে লোকে কিছু চাইতে আসে, সন্ন্যাসী কিন্তু কিছু না চেয়েই চলে' যাচ্ছিল।
রাজা কিসের জন্য তাকে ডাকল ?	রাজা তাকে ডেকে বল্ল সন্ন্যাসী কি চায় জানালে তার অভিলাষ পূর্ণ করবে।
শব্দার্থ—	অভিলাষ = ইচ্ছা।
রাজপুরীতে কাদের আশা পূর্ণ হয় ?	সাধু-সজ্জন আর ভিক্ষুক কেউ এসে কিছু চাইলে তাকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হয় না।
সন্ন্যাসী কোন দলে পড়ল ?	সন্ন্যাসী সাধু সজ্জনের মধ্যে গণ্য বলে' সে নিশ্চয়ই বিফল-আশ হবেন না।
শব্দার্থ—	
'আশ' শব্দের জন্য দর্শন-আশের সংগে তুলনা করা হবে।	বিফল আশ-যার আশা বিফল হয়েছে

তৃতীয় অংশ—সন্ন্যাসী কহে · আমার মতো।

পদ্ধতি	বিষয়
সন্ন্যাসী কিসের আশায় রাজ-ভবনে এসেছিল ?	আশ্রয়হীন অনাথ আতুরদের এক এক আশ্রম করার জন্য সে নগরে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল।
শব্দার্থ—	রাজভবন = রাজার ভবন বা বাড়ি।
রাজভবন কি ? এখন রাজ-ভবন কাকে বলে ?	আমরা এখন রাজ্যপালের বাড়িকে রাজভবন বলি।

পদ্ধতি	বিষয়
সন্ন্যাসী রাজাকে কি বলে সম্বোধন করেছে ?	রাজাধিরাজ = রাজ + অধিরাজ রাজাদের মধ্যে যে বড়। তুলনীয় মহারাজ
মহীপতি মানে কিসের পতি ?	মহী = পৃথিবী মহীপতি = পৃথিবীর রাজা তুলনীয় লোকেদের রাজা = নৃপতি, নরপতি।
রাজাকে সব রাজার রাজা বলে' ধন্য বলাটা কতটা সত্য ? কি করে একথা অনুমান করলে ?	রাজাকে রাজাধিরাজ বলে' ধন্য বলা যেন অনেকটা বিদ্রূপের ছলে হয়েছে। সন্ন্যাসীর ওই সম্বোধন যদি আন্তরিক হ'ত তাহ'লে সে ভিক্ষা না চেয়ে ফিরে যেতে চাইত না।
সে আর কোন কথায় রাজার দীনতার বিষয় উল্লেখ করেছে ?	..."বিশাল রাজ্য আছে যার পদানত, মাগিছেন ধন সেই মহীপতি, ভিখারী আমারি মত।"
শিক্ষক আগের উদ্ধৃত উক্তির কথা মনে করিয়ে দেবেন।	"সবই যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত, তাঁরও নাই বাসনার শেষ!"

চতুর্থ অংশ—কে পুরাবে...তাঁহারি কাছে।

পদ্ধতি	বিষয়
সন্ন্যাসীর প্রার্থনা যে রাজার কাছে পূর্ণ হবেনা তা কোন কথায় সে বলেছে ?	"কে পুরাবে তবে আকাংক্ষা মোর ? জিজ্ঞাসা করে' সন্ন্যাসী বুঝিয়েছে যে তার আকাংক্ষা রাজা পূর্ণ করতে পারবে না।
কার কাছে ভিক্ষা চাইবে ?	নৃপতি যাঁর কাছে ভিখারী তাঁর কাছেই সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাইবে।

পদ্ধতি	বিষয়
তিনি কে? কবিতার শিরোনাম কি?	তিনিই রাজার রাজা, ভগবান।

অভিযোজন—

শিক্ষক ছাত্রদের কাছে সংক্ষিপ্ত উত্তর নেবেন। কোনো উত্তর বড় হ'লে কয়েকজন ছাত্র ভাগ করে উত্তর দেবে।

—রাজা আর সন্ন্যাসীর প্রার্থনার মধ্যে মিল কি? পার্থক্য কি?

—রাজা আর সন্ন্যাসী যে ভাবে জীবন কাটান তাতে কার টাকা ভালো কাজে বেশি খরচ হবে?

—সন্ন্যাসী ও রাজার বেশভূষার তফাৎ কি?

—আদর্শ প্রার্থনা কাকে বলে ব'লে তোমাদের মনে হয়?

গৃহকাজ—কথা ও কাহিনী থেকে 'দুই বিঘা জমি', 'প্রতিনিধি' আর 'নগরলক্ষ্মী' কবিতা পড়বে।

বোর্ডের কাজ—(উপস্থাপনের ধাপে ধাপে এই কাজ হবে।)

রাজার রাজা—রমণীমোহন ঘোষ **তারিখ—**

শব্দার্থ	সারাংশ
যাচ্ঞা—যা চাওয়া হয়। ভস্মভূষণ ছাই যার গহনার মতো। অনাথ—যার কেউ নেই। আতুর—যে অসুস্থ বা কাতর। (আর্ত) অনুরূপ শব্দ :— দর্শন-আশ, বিফল আশ	রাজা ভজনাগারে উপাসনা শেষে ধন সম্পদ ভিক্ষা করল ও বাইরে এসে দেখল দরজা থেকে এক সন্ন্যাসী ফিরে যাচ্ছে। রাজা তার যাচ্ঞা জানতে চাইল ও আশ্বাস দিল যে তার অভিলাষ পূর্ণ করবে। সন্ন্যাসী অনাথ, আতুর, আশ্রয়হীনের

শব্দার্থ	সারাংশ
যাচিল, যাচ্ঞা	এক আশ্রম প্রতিষ্ঠার অর্থের আশায়
রাজপুরী, রাজভবন	রাজভবনে এসেছিল কিন্তু স্বয়ং
প্রতিশব্দ :—	রাজাকে ভিক্ষা করতে দেখে বুঝল
বন্দনা, উপাসনা।	যে তার আকাংক্ষা পূর্ণ হবে না।
মহীপতি, নরপতি, নৃপতি	রাজার রাজা ভগবানের কাছেই সে
রাজাধিরাজ, রাজার রাজা।।	চাইবে তার অভাব পূরণের জন্য।

(২) **বিষয়—ব্যাকরণ।**

—বিশেষ বিষয়—লিংগ—স্ত্রীপ্রত্যয়।

উদ্দেশ্য—বাংলা ভাষার লিংগের ব্যবহার ও স্ত্রীপ্রত্যয় শেখানো। বিশুদ্ধভাবে বাংলাভাষার ব্যবহারের ভিত্তি স্থাপন করা। বাংলা ভাষার আলোচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি গড়ে' তোলা।

উপকরণ—শ্রেণি কক্ষের সাধারণ, ছবি, চার্ট।

পূর্বজ্ঞান—ছাত্রেরা এই শ্রেণিতে উদ্দেশ্য, বিধেয় ও পদপরিচয় সম্বন্ধে এবং পঞ্চম শ্রেণিতে লিংগের বিষয় পড়েছে। তারা বাংলায় লিংগের ব্যবহার পড়ে বুঝতে এবং নিজের লেখায় করতে পারে।

আয়োজন:—

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন--তোমরা পঞ্চমশ্রেণির ব্যাকরণে ক'টি লিংগের বিষয় পড়েছ ?

এবার একটি চার্ট টাঙাবেন তাতে তিনটি স্তম্ভে পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব এই তিন লিংগবাচক জীব ও জিনিষের ছবি আছে। জিজ্ঞাসা করবেন—এই চার্টের ছবিগুলিতে কোন কোন লিংগ দেখতে পাচ্ছ ?

পাঠঘোষণা :—

আজকে আমরা লিংগ সম্বন্ধে আরেকটু ভালো করে' আলোচনা করব—এই কথা বলে' বোর্ডে লিখবেন—"লিংগ"।

উপস্থাপনা :—

পদ্ধতি	বিষয়		
	পুংলিংগ	**স্ত্রীলিংগ**	**ক্লীবলিংগ**
শিক্ষক বোর্ডে তিনটি স্তম্ভ এঁকে স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব—এই তিন শীর্ষ লিখে দিয়ে ছাত্রদের ২১টি ছবির নাম যথাযথ ভাবে লিখে দিতে বলবেন।	পিতা	মাতা	জামা
	পুত্র	কন্যা	ধুতি
	চাষী	চাষানী	শাড়ি
	বালক	বালিকা	প্যান্ট
একেক ছাত্র শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে একেকটি শব্দের লিংগ বলবে ও লিখবে—	রাজা	রানি	জুতো
	ষাঁড়	গরু	বোর্ড

এরপর সূত্র নিষ্কাশিত হবে ও বোর্ডে লেখা হবে—

পুংলিংগ বলতে কি বুঝলাম ?	যে সকল শব্দদ্বারা পুরুষজাতীয় জীব বোঝায় তাকে পুংলিংগ বলে।
স্ত্রীলিংগ বলতে কি বুঝলাম ?	যে সকল শব্দদ্বারা স্ত্রীজাতীয় জীব বোঝায় তাকে স্ত্রীলিংগ বলে।
ক্লীবলিংগ বলতে কি বুঝলাম ?	যে সকল শব্দদ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ কিছু না বুঝিয়ে কোনো বস্তু বোঝায় তাকে ক্লীবলিংগ বলে।
লিংগ কাকে বলে ?	যে শব্দের দ্বারা আমরা কোনো জীব বা বস্তু স্ত্রী, পুরুষ না স্ত্রী বা পুরুষ নয় বুঝতে পারি তাকে লিংগ বলে।

পদ্ধতি	বিষয়
শিক্ষক বোর্ডে একটা চার্ট টাঙিয়ে দেবেন তার বাঁদিকের স্তম্ভে কতকগুলি পুংলিংগ পদ লেখা। তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে পদগুলির স্ত্রীলিংগের রূপ বসিয়ে ডানদিকের স্তম্ভে পাশাপাশি লিখে দেবেন। কাজটি পূর্ণ হ'লে যা হবে ডানদিকে দেখানো হল।	**পুংলিংগ** — **স্ত্রীলিংগ** ব্রাহ্মণ — ব্রাহ্মণী কুমার — কুমারী সুন্দর — সুন্দরী দেব — দেবী রাক্ষস — রাক্ষসী
শিক্ষক বলে' দেবেন ও বোর্ডে লিখবেন—	যে পরিবর্তনের দ্বারা পুংলিংগ পদকে স্ত্রীলিংগ পদে পরিণত করা যায় তাকে স্ত্রীপ্রত্যয় বলে।
প্রশ্নদ্বারা সূত্র নিষ্কাশিত হবে। এই চার্টের পদগুলিকে কিভাবে স্ত্রীলিংগে পরিণত করলে ?	পুংলিংগ পদের সংগে ঈ-কার যোগের দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়।
সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে। এরপর আরেকটি চার্ট টাঙিয়ে অনরূপ ভাবে আরেকটি সূত্র নিষ্কাশিত হবে।	**পুংলিংগ** — **স্ত্রীলিংগ** বৃদ্ধ — বৃদ্ধা শিষ্য — শিষ্যা মহাশয় — মহাশয়া সভ্য — সভ্যা শ্রীযুক্ত — শ্রীযুক্তা পুংলিংগ পদের সংগে আ-কার যোগের দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়।

পদ্ধতি	বিষয়	
অনুরূপভাবে আরেকটি—	**পুংলিংগ**	**স্ত্রীলিংগ**
	বালক	বালিকা
	গ্রাহক	গ্রাহিকা
	পাঠক	পাঠিকা
	লেখক	লেখিকা
	সেবক	সেবিকা
	পুংলিংগ পদের সংগে ই-আ যোগের দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়	
অনুরূপভাবে আরেকটি—	**পুংলিংগ**	**স্ত্রীলিংগ**
	জেলে	জেলেনী
	চাষা	চাষানী
	ধোপা	ধোপানী
	প্যাঁচা	প্যাঁচানী
	শেয়াল	শেয়ালনী
	পুংলিঙ্গ পদের সংগে নী যোগের দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়।	
আরেকটি—	**পুংলিংগ**	**স্ত্রীলিংগ**
	বাঘ	বাঘিনী
	পাগল	পাগলিনী
	গোয়ালা	গোয়ালিনী
	পুংলিংগ পদের সংগে ইনী যোগের দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়।	

পদ্ধতি	**বিষয়**	
আরেকটি—	**পুংলিংগ**	**স্ত্রীলিংগ**
	চৌধুরী	চৌধুরাণী
	ঠাকুর	ঠাকুরাণী
	চাকর	চাকরাণী
	মেথর	মেথরাণী
	পুংলিংগ পদের সংগে আণী যোগের দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়।	
আরেকটি—	**পুংলিংগ**	**স্ত্রীলিংগ**
	শ্রীমান	শ্রীমতী
	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
	ভক্তিমান	ভক্তিমতী
	পুংলিংগ পদের শেষে মান থাকলে মতী-তে পরিবর্তিত করে' স্ত্রীলিংগ করা যায়।	
আরেকটি—	**পুংলিংগ**	**স্ত্রীলিংগ**
	ভাগ্যবান	ভাগ্যবতী
	রূপবান	রূপবতী
	বলবান	বলবতী
	ফলবান	ফলবতী
	পুংলিংগ পদের শেষে বান থাকলে বতী-তে পরিবর্তন করে' স্ত্রীলিংগ করা যায়।	

পদ্ধতি	বিষয়	
আরেকটি—	**পুংলিংগ**	**স্ত্রীলিংগ**
	স্বামী	স্ত্রী
	ছেলে	মেয়ে
	রাজা	রানি
	পুত্র	কন্যা
	অনেক পুংলিংগ পদের স্ত্রীবাচক আলাদা পদ দিয়ে স্ত্রীলিংগ করা যায়।	

অভিযোজন ঃ—

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন—

লিংগ কাকে বলে? কটা লিংগ আছে? পুংলিংগ থেকে স্ত্রীলিংগে পরিবর্তন করার নিয়মকে কি বলে? আজ তোমরা কটা নিয়ম শিখলে?

সময় থাকলে ছাত্রদের দুইদলে ভাগ করে' প্রতিযোগিতা করানো হবে। পালা করে' একদল অন্যদলকে একটি করে' পুংলিংগ শব্দ দেবে, অন্য দলের ছাত্রেরা স্ত্রীপ্রত্যয় করে' সূত্র বলবে। যে দল বেশি পারবে তার জয় ঘোষিত হবে।

গৃহকাজ ঃ—

ছাত্রেরা যতগুলি পারে পুংলিংগ শব্দ নিয়ে স্ত্রীপ্রত্যয় করে' আনবে। এতেও প্রতিযোগিতা থাকবে।

বোর্ডের কাজ ঃ—(উদাহরণগুলি চার্টে থাকবে বলে' বোর্ডে কেবল সূত্র তোলা হবে, দুটি বোর্ডে কাজ হবে।)

লিংগ

প্রথম বোর্ড

যে সকল শব্দ দ্বারা পুরুষজাতীয় জীব বোঝায় তাকে পুংলিংগ বলে।

যে সকল শব্দদ্বাবা স্ত্রীজাতীয় জীব বোঝায় তাকে স্ত্রীলিংগ বলে।

যে সকল শব্দদ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ না বুঝিয়ে কোনো বস্তু বোঝায় তাকে ক্লীবলিংগ বলে।

যে পরিবর্তনের দ্বারা পুংলিংগ পদকে স্ত্রীলিংগ পদে পরিণত করা যায় তাকে **স্ত্রীপ্রত্যয়** বলে।

দ্বিতীয় বোর্ড

পুংলিংগ পদের সংগে ঈ— কাব যোগেব দ্বাবা স্ত্রীলিংগে পরিবর্তিত ক । যায।

" " " আ— " " " " " " "

" " " ই-আ— " " " " " " "

" " " নী— " " " " " " "

" " " ইনী— " " " " " " "

" " " আণী— " " " " " " "

পুংলিংগ পদেব শেষে মান থাকলে মত্‌-তে পবিবর্তিত কবে স্ত্রীলিংগ কবা যায।

" " " বান " বতী " " " " " "

" " স্ত্রীবাচক আলাদা পদ দিযে— " " "

সপ্তম শ্রেণি

(৩)

গড় বয়স—১২+। বিষয়—বাংলা কবিতা

ছাত্রসংখ্যা—৪০। বিশেষ বিষয়—নগরলক্ষ্মী।

সময়—৪০ মিনিট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্দেশ্য :—ছাত্রদের উপস্থিত কবিতার অর্থ ও রসবোধ করানো
—বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সংগে পরিচিত করিয়ে তাদের সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত করা।
—তাদের কবিতাটির ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

উপকরণ—শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও পাঠ্যপুস্তক।

পূর্বজ্ঞান—ছাত্রেরা অনুরূপমানের কবিতা পড়ে' অর্থবোধ রসগ্রহণ করতে পারে। ষষ্ঠশ্রেণিতে কথা ও কাহিনী পড়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বহু কবিতা পড়েছে ও মুখস্থ করেছে। ইতিহাসে বুদ্ধদেবের বিষয় পড়েছে।

আয়োজন—পাঠের ভিত্তিস্থাপন, পরিবেশরচনা ও ছাত্রদের আগ্রহসৃষ্টির জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন :—

বুদ্ধদেব কে ছিলেন ?

ইতিহাস ছাড়া সাহিত্যে বুদ্ধদেবের বিষয়ে কোন গল্প বা কবিতা পড়েছ ?

বুদ্ধচরিত্রের কোন বিশেষত্ব তোমাদের সবচেয়ে ভালো লাগে ?

তাঁর কোনো একটা বাণী বল।

পাঠঘোষণা—শিক্ষক বলবেন বুদ্ধদেবের দয়া ও তাঁর ইচ্ছা তাঁর শিষ্যেরা কিভাবে পালন করেছিলেন এই বিষয়ে একটা কবিতা পড়ব।

উপস্থাপন—শিক্ষক প্রথমে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন, তারপর ছাত্রদের বইখুলে কবিতা ও কবির নাম পডতে বলবেন ও বোর্ডে লিখবেন—**নগরলক্ষ্মী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**।

ছাত্রদের একবার নীরবপাঠ করতে দিয়ে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন—

পদ্ধতি	বিষয়
কোথাকার, কোন ঘটনা নিয়ে কবিতাটি রচিত হয়েছে ?	শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষের সময়ের কথা নিয়ে কবিতাটি লেখা হয়েছে এবং
এই সময়ে বুদ্ধদেব কি করছেন ?	বুদ্ধদেব এই সময়ে ক্ষুধিতদের অন্নদান করতে চাইছেন।

এরপর ছাত্রেরা একে একে কবিতাটির একটি করে' স্তবক সরবে পড়বে এবং প্রশ্নোত্তর দ্বারা সেটির বিশ্লেষণ হবে। প্রয়োজনমতো শব্দার্থের আলোচনা হবে এবং সারাংশ ও কঠিন শব্দের অর্থ বোর্ডে লেখা হবে।

পদ্ধতি	বিষয়
প্রথম স্তবক—দুর্ভিক্ষ······বল কেবা।	
ক্ষুধিতদের অন্নদানের জন্য বুদ্ধ কাদের, কি জিজ্ঞাসা করলেন ?	বুদ্ধ তাঁর প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মধ্যে কে এই সেবার কাজ নিতে পারবে।
প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তা বুঝলে কি করে' ?	'জনে জনে' বলাতে বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধ একে একে সকল জনকেই জিজ্ঞাসা করছিলেন।
বোর্ডে লেখা হবে—	সারাংশ—শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষেব সময়ে বুদ্ধ তাঁর ভক্তদের ক্ষুধিতের অন্নদানসেবা নিতে বল্লেন।
দ্বিতীয় স্তবক—শুনি তাহা······নাই স্বামী।	
প্রথমে তিনি কাকে জিজ্ঞাসা করলেন ?	প্রথমে তিনি রত্নাকর শেঠকে জিজ্ঞাসা করলেন।

পদ্ধতি	বিষয়
রত্নাকর কি করতেন ? কি করে' তা বুঝলে ?	'শেঠ' পদবী থেকে বোঝা যায় যে রত্নাকর বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।
তাঁর এই কাজের ক্ষমতা নেই কেন ?	শ্রাবস্তীপুরী খুব বিশাল এবং এখানে সকলেই ক্ষুধিত : তাই রত্নাকর বল্লেন যে এত বেশি লোককে খাওয়াবার ক্ষমতা তাঁর নেই।
বুদ্ধদেবকে তিনি কি বলে' সম্বোধন করলেন ? কেন ?	বুদ্ধদেবকে তিনি 'স্বামী' বল্লেন, কারণ স্বামী শব্দের এক অর্থ প্রভু।
শিক্ষক উদাহরণ দেবেন—	যেমন— ভূস্বামী = জমিদার 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই' (দুই বিঘা জমি)
বোর্ডে লেখা হবে—	রত্নাকর শেঠ

তৃতীয় স্তবক—কহিল সামন্ত····· কোথা আজ ?

পদ্ধতি	বিষয়
এবার বুদ্ধদেব কাকে জিজ্ঞাসা করলেন ?	তারপর বুদ্ধদেব জয়সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন।
তাঁর পেশা কি ?	তিনি একজন সামন্ত বা সেনাপতি।
তিনি কেন পারবেন না ? তিনি কি করতে পারেন ? এখানে সে কাজ চলবে না কেন ?	তিনি যোদ্ধা, তাঁর বুক চিরে রক্ত দিতে রাজি, কিন্তু দুর্ভিক্ষ শত্রু হ'লেও মানুষ নয় যে তার সংগে যুদ্ধ করে' তাকে হারানো যায়।
তিনি তো অন্নদান করতে পারতেন,তা কেন পারবেন না ?	তিনিও দুর্ভিক্ষপীড়িত, তাঁর ঘরে অন্ন নেই।

পদ্ধতি	বিষয়
জয়সেন বুদ্ধদেবকে কি বলে সম্বোধন করেছেন ?	'প্রভু' বলে' বিনীত সম্বোধনে জয়সেন কথাগুলি বল্লেন।
বোর্ডে লেখা হবে—	সামন্ত জয়সেন।

চতুর্থ স্তবক—নিঃশ্বাসিয়া⋯ দীনহীন।

পদ্ধতি	বিষয়
এবার কে কথা বল্লেন ?	এরপর ধর্মপাল কথা বল্লেন।
কথা ছাড়াও আর কিসে তার মনের ভাব প্রকাশ পেল ? ভাবটা কি ?	তিনি দুঃখের সংগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলি বল্লেন।
তাঁর মুখের কোন কথায় তাঁর দুঃখ বেশি প্রকাশ পেয়েছে ?	তিনি বল্লেন তাঁর 'দগ্ধভাল' অর্থাৎ 'পোড়াকপাল'।
কেন এই দুঃখ ?	প্রথমত, বুদ্ধদেবের কথা রাখতে পারলেন না এই দুঃখ। তাছাড়া তাঁর সোনার খেতগুলি শুকিয়ে গেছে।
অজন্মা কি ? কি কারণে শস্য জন্মায়নি ? যখন এমন ঘটে তখন দেশে কি হয় ?	বৃষ্টির অভাবে তাঁর খেতের চারা অংকুরেই শুকিয়ে গেছে—গাছ জন্মায়নি, দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে।
অজন্মাকে কিসের সংগে তুলনা করা হয়েছে ? কেন ?	তিনি অজন্মাকে প্রেতের সংগে তুলনা করেছেন, কারণ, প্রেত যেমন মানুষের রক্ত শুষে খায়। অজন্মা তেমনি খেতের সমস্ত রস শুষে নিয়েছে।
কি হলে ক্ষেতে রস আসে ? অজন্মার কারণ কি ?	বৃষ্টি হ'লে খেতে জল জমে, শস্য রস পায়, বৃষ্টি হয়নি বলে' রস শুকিয়ে গেছে, অজন্মা হয়েছে।

পদ্ধতি	বিষয়
তাঁর উক্তি থেকে তাঁর পেশা কি ছিল বলে বোঝা যায় ?	ধর্মপাল কৃষক ছিলেন।
বোর্ডে লেখা হবে—	ধর্মপাল।

পঞ্চম স্তবক—রহে সবে······রহে ফুটি।

পদ্ধতি	বিষয়
আর কে কে উত্তর দিলেন ? শিষ্যেরা তখন কি করলেন ?	আর কেউ উত্তর দিলেন না, সকলে মুখে মুখে চেয়ে রইলেন।
নগরীর অবস্থা কি রকম ? সে দৃশ্যে বুদ্ধের চোখের ভাব কি রকম ?	বুদ্ধদেব ব্যথিত নগরীর দিকে করুণ চোখে চেয়ে রইলেন।
তাঁর সেই দৃষ্টিকে কিসের সংগে তুলনা করা হয়েছে ?	বুদ্ধের এই করুণ চোখকে কবি সন্ধ্যা-তারার সংগে তুলনা করেছেন।
বোর্ডে লেখা হবে :—	এঁরা কেউ এই ভার নিতে পারলেন না। বুদ্ধ করুণ চোখে নগরীর দিকে চেয়ে রইলেন।

ষষ্ঠ স্তবক—তখন উঠিল······লইলাম ভার।

পদ্ধতি	বিষয়
তখন কে উঠলেন ? কি ভাবে ? তিনি কার মেয়ে ? কি নাম ?	তখন অনাথপিণ্ডদের মেয়ে সুপ্রিয়া অত্যন্ত লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে উঠলেন।
অনাথপিণ্ডদ কে ? তাঁর কথা কোথায় পড়েছ ?	অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতায় তাঁর কথা আছে।
সুপ্রিয়ার মুখচোখের ভাব একে একে বল—	রক্তভাল, লাজনম্রশির, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা

পদ্ধতি	বিষয়
এইশব্দগুলি নিয়ে প্রশ্ন করে' অর্থনিষ্কাশন হবে।	এত লোকের মাঝখানে উঠে দাঁড়াতে লাজুক মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠলো, লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে গেল আর নগরীর দুঃখে তিনি চোখের জলে ভিজে যেতে লাগলেন।
তিনি কি করলেন? কি বল্লেন? (প্রয়োজন হ'লে চরণরেণু শব্দের অর্থ লেখা হবে) তাঁর গলার স্বর কেমন? তাঁর ব্যবহার কেমন? কোন কথায় তাঁর বিনয় প্রকাশ পেয়েছে?	তিনি বুদ্ধের পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লেন যে তিনি সেইদিন থেকে নগরীতে অন্ন বিলাবার ভার নিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর মতো মিষ্টি, তাঁর ব্যবহার বিনয়ে ভরা। বিনয় করে' তিনি নিজেকে 'ভিক্ষুণীর অধম' বলে বর্ণনা করলেন।
'ভিক্ষুণী' মানে কি?	বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে 'ভিক্ষু' বলে আর সন্ন্যাসিনীকে—'ভিক্ষুণী'। ভিক্ষু অনাথপিণ্ডদের মেয়ে সুপ্রিয়া নিজে ভিক্ষুণী।
যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের প্রতি সুপ্রিয়ার কেমন মনোভাব? 'অন্নহারা' শব্দটি 'সর্বহারা' 'গৃহহারা' প্রভৃতির সংগে তুলনা করে' বুঝিয়ে দেবেন।	দুর্ভিক্ষপীড়িতদের তিনি নিজের সন্তানের মতো মনে করেছেন।
বোর্ডে লেখা হবে—	সকলে যখন মুখে মুখে চেয়ে আছে তখন অনাথপিণ্ডদসুতা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া নগরীতে অন্ন বিলাবার ভার নিলেন।

পদ্ধতি	বিষয়

সপ্তম অষ্টম স্তবক—বিস্ময় মানিল······হইবে বিজয়া।

পদ্ধতি	বিষয়
সবাই সুপ্রিয়ার কথা শুনে অবাক হ'ল কেন ? ভিক্ষুরা কত ধনী হয় ?	ভিক্ষুর মেয়ে ভিক্ষুণী—এবা সর্বত্যাগী, কোনো টাকাপয়সা এদের থাকে না, কি করে' এরা এত লোককে খাওয়াবে এই কথা ভেবে সবাই অবাক হ'ল।
এত বিনয়ের সংগে সুপ্রিয়া কথা বলা সত্ত্বেও লোকে কি ভাবলো ? কেন ?	ওরা ভাবলো সুপ্রিয়া বাইরে বিনয় দেখালেও আসলে অহংকৃত, কারণ এত বড বড লোকে যা পারেনি সেখানে ও এগিয়ে গেল।
প্রবাদবাক্যের তুলনা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হবে—	"হাতিঘোড়া হ'ল তল, গাধা বলে কত জল।" "Fools rush in when angels fear to tread"
কিরকম কাজের ভার সুপ্রিয়া নিল ?	সুপ্রিয়া অত্যন্ত কঠিন ও ভারি কাজের ভার নিল।
তুলনা করে' বুঝিয়ে দেওয়া হবে	—"গুরু কাছে লব গুরু দুখ।" (প্রতিনিধি।)
সকলে ওকে কি জিজ্ঞাসা করলো ?	সবাই জিজ্ঞাসা করলো তার কি আছে যা দিয়ে সে এত লোককে খাওয়াবে ?
সুপ্রিয়া কি করলো ?	সুপ্রিয়া তার স্বাভাবিক বিনয়ের সংগে সবাইকে নমস্কার করলো।

পদ্ধতি	বিষয়
কিরূপ স্বভাবের পরিচয় দিল? তার কি আছে? কেন?	সে বল্ল তার শুধু ভিক্ষাপাত্রটি আছে কেননা সে একটি "দীনহীন মেয়ে" সে সবার চেয়ে "অক্ষম"।
তবে সে দুর্ভিক্ষত্রাণেব উপযুক্ত অর্থভাণ্ডার কোথায় পাবে?	সে বল্ল তার ভাণ্ডার উপস্থিত সকলে ক'ছে ভবে' আছে।
ভিক্ষাপাত্রের উল্লেখের সংগে তার কি যোগ? কি দিয়ে সে পৃথিবীর মানুষকে বাঁচাবে?	ভিক্ষাপাত্রের কথা বলার পর এই কথার মানে হ'ল যে সে সকলে কাছে অন্ন ভিক্ষা করবে আর সেই ভিক্ষার অন্নে দুর্ভিক্ষপীড়িতদে বাঁচাবে।
সুপ্রিয়ার বাবা অনাথপিণ্ডদের ভিক্ষার কথা কোন কবিতায় পড়েছ?	'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতায় অনাথপিণ্ডদে ভিক্ষার কথা আছে।
আজকালকার দুর্ভিক্ষত্রাণের পদ্ধতির সংগে সুপ্রিয়ার এই কাজের কি মিল দেখতে পাও? শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন—	আজকাল আমরা চাঁদা তুলে দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুরবস্থার থেকে লোকদে বাঁচাই। সুপ্রিয়ার ভিক্ষাকে এ চাঁদাতোলার সংগে তুলনা করা যায় যত বড় বড লোক নিজের অক্ষমতা কথা বল্ল তারা একা সমস্তটা কা করার কথা ভাবছিল। গণতন্ত্রে যুগে মিলেমিশে কাজ করা হয এইদিক দিয়ে সুপ্রিয়ার কাজে গণতান্ত্রিক বলা যায়।

পদ্ধতি	বিষয়
ভিক্ষাপাত্র অক্ষয় হবে কেন ?	ক্রমাগত ভিক্ষা করবেন বলে' সুপ্রিয়ার ভিক্ষাপাত্র কখনই খালি হবে না। তুলনীয়—অক্ষয়তূণ।
কার জয় হবে ?	প্রভুর বা বুদ্ধদেবের আজ্ঞা এইভাবে জয়ী হবে।
শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন—	আজ্ঞা স্ত্রীলিংগপদ বলে তার বিশেষণে বিজয়—বিজয়া হ'ল।
কবিতার নাম নগরলক্ষ্মী কেন হয়েছে ?	লক্ষ্মীর মতো নগরের অভাব মেটাবার জন্য সুপ্রিয়াকে নগরলক্ষ্মী বলা হয়েছে এবং তাঁর নামে কবিতার নামকরণ হয়েছে। তুলনীয়—ভাগ্যলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, রাজ-লক্ষ্মী ইঃ।

অভিযোজন :—

ছাত্রেরা কবিতাটির নাট্যরূপ দেবে। বুদ্ধদেব, সুপ্রিয়া ও বিভিন্ন নাগরিককের অংশগুলি বিভিন্ন ছাত্র নেবে আর সাধারণ অংশগুলি (যেগুলি কারো উক্তি নয়) পড়বার জন্য একদল বালক থাকবে। এই বালকের দল সাধারণ অংশগুলি সমস্বরে আবৃত্তি করতে থাকবে এবং ব্যক্তিবিশেষের উক্তিস্থলে থামবে। তখন যার উক্তি সে বলবে। যারা অভিনয়ে সক্রিয় অংশ নিলনা দর্শক ও সমালোচকের ভূমিকা নেবে।

বাড়ির কাজ :—

ছাত্রেরা কবিতাটি মুখস্থ করবে ও কথা ও কাহিনীর যে কবিতা-গুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পড়বে।

বোর্ডের কাজ ঃ—(উপস্থাপনের সময়ে যা হয়েছে ?)

শব্দার্থ	**সারাংশ**
স্বামী-প্রভু, তুলনীয়—ভূস্বামী। অজন্মা—যখন শস্য জন্মায় না। চরণরেনু—পদধুলি রেণু = গুঁড়ো।	শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষের সময়ে বুদ্ধ-দেব তাঁর ভক্তদের "ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা" নিতে বল্লেন। রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন।
সুপ্রিয়ার বর্ণনা— ভিক্ষুণীর অধম, ভিক্ষুকন্যা। অনাথপিণ্ডদসুতা। রক্তভাল, লাজনম্রশির, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা।	ধর্মপাল এবা কেউ ভাব নিতে পাবলেন না। সকলে মুখে মুখে চেয়ে আছে তখন অনাথপিণ্ডদসুতা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া এই ভাব নিলেন।

(শব্দটীকা ও সারাংশেব জন্য পৃথক বোর্ড ব্যবহাব কবলে ভালো হয়।)

(৪)

গড় বয়স—১২ +
ছাত্রসংখ্যা—৪০
সময় ৪০ মিনিট।

বিষয়—বাংলা গদ্য। (বিজ্ঞান বিষয়ক।)

বিশেষ বিষয়—উদ্ভিদের জীবনকথা—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

(তিনদিনে সমাপ্য।)

পাঠধারা—১। মৃত্তিকার······মরিয়া যায়।

২। অনুবীক্ষণ······বাঁচিয়া আছি।

৩। কোনও, কোনও······মরিয়া যায়।

প্রথম পাঠ—মৃত্তিকার……মরিয়া যায়।

উদ্দেশ্য—উপস্থিত প্রবন্ধটি পাঠ করে' অর্থবোধ ও ভাবগ্রহণ করানো।
বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠাভ্যাস করানো।
—বাংলা গদ্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

উপকরণ—শ্রেণিকক্ষের সাধারণ, রঙিন চক ও পাঠ্যপুস্তক।

পূর্বজ্ঞান—ছাত্রেরা অনুরূপমানের গদ্য প্রবন্ধ পড়ে' অর্থ ও ভাবগ্রহণ করতে পারে। প্রবন্ধটির উপস্থাপ্য বিষয়ের জ্ঞান তারা বিজ্ঞানের ক্লাসে পেয়েছে।

আয়োজন—পাঠের উপযোগী ভিত্তিস্থাপন ও ছাত্রদের আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন—

বীজ থেকে কি করে' গাছ হয়?

এ বিষয়ে কোনো পরীক্ষা করে' থাকলে তার বর্ণনা কর এবং কি জানতে পেরেছ বল।

পাঠঘোষণা—শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠার নির্দেশ করে' ছাত্রদের বই খুলে প্রবন্ধ ও লেখকের নাম পড়তে বলবেন ও বোর্ডে লিখে দেবেন।

উপস্থাপন—ছাত্রেরা পালা করে' পাঠ্যবস্তুর একেক অংশ পড়বে এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় পঠিত অংশ বিশ্লেষণ করা হবে। সংগে সংগে বোর্ডের কাজ চলবে।

পদ্ধতি	**বিষয়**
(ক) মৃত্তিকার নীচে……দেখিতেছি।	
গাছ পেতে হ'লে আমরা কি করি?	গাছ পেতে হ'লে আমরা বীজ নিয়ে মাটির নিচে পুঁতে দিই।
একটা বীজ কতদিন মাটির নিচে থাকতে পারে?	একটা বীজ—মাসের পর মাস—সারা শীত ও বসন্তকাল মাটির নিচে থাকে

পদ্ধতি	বিষয়
কখন সে মাটির নিচ থেকে মুখ তোলে ?	বর্ষার দুই-এক-পশলা বৃষ্টির পর সে মাটির নিচ থেকে মুখ তোলে।
গাছের এই মুখতোলার কারণটি-কে লেখক কবিত্বপূর্ণ ভাষায় কি ভাবে বর্ণনা করেছেন ?	লেখক ভাবছেন কে যেন একটি ছোট শিশুকে ডেকে বলছে—"আর ঘুমিও না। ওপরে উঠে এসো, সূর্যের আলো দেখবে।"
সেই ডাক শুনে কি হ'ল ?	বীজের ঢাকা খসে' পড়লো, দুটো কোমল পাতার মধ্য থেকে অংকুর বেরোলো।
আলোচনার সংগে সংগে শিক্ষক রঙিন খড়ি দিয়ে বোর্ডে বীজের মাটির নিচে বাস ও বর্ষার জল পেয়ে অংকুরোদ্গম দেখাবেন। আকাশে একটি সূর্যও আঁকবেন।	বৃষ্টির জল পেয়ে বীজ অংকুরিত হয়ে সূর্যকে দেখতে পেল।
বোর্ডে লেখা হবে—	

(খ) গাছের অংকুর······উঠিয়াছে।

পদ্ধতি	বিষয়
অংকুরের মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দেখে লেখকের কি মনে হয়েছে ?	লেখকের মনে হচ্ছে যে এরা ঘুম ভেঙে মাথা তুলেই পাতার ঢাকনার মধ্য থেকে আশ্চর্যের সংগে নোতুন দেশ দেখছে।
অংকুরের কটি অংশ ? কোন অংশটির কি নাম বল আর দেখিয়ে দাও।	যে অংশটি মাটির নিচে প্রবেশ করে তাকে মূল আর যে অংশ ওপরের দিকে বাড়তে থাকে তাকে কাণ্ড বলে।

পদ্ধতি	বিষয়
মনে কর একটা গাছশুদ্ধ টবকে উল্টো করে' ঝুলিয়ে রাখা হ'ল, তাহলে কোন অংশ কোনদিকে যাবে ?	একটা গাছশুদ্ধ টবকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হ'লে মূল আর কাণ্ড মুখ ঘুরিয়ে যে-যার নির্দিষ্ট দিকে যাবে।
শয়তার বিষয়ে কি বলা হয়েছে ?	মূলোজাতীয় ফল কেটে ঝুলিয়ে রাখলে তার পাতা ও ফুলগুলি যে নিচের দিকে থাকে তাকে শয়তা বলে।

(গ) আমরা যেরূপ……মরিয়া যায়।

গাছ আমাদের মতো করে' খেতে পারেনা কেন ?	গাছ শিশুর মতো, তার দাঁত নেই, তাই সে আমাদের মতো আহার করতে পারেনা।
গাছ কি রকম করে' খায় ?	সে জলীয় দ্রব্য বা বাতাস থেকে আহার সংগ্রহ করে। মূলদ্বারা মাটি থেকে জল শোষণ করে।
মাটির মধ্যেকার খনিজ পদার্থ সে কি করে' খায় ?	চিনিতে জল ঢাললে যেমন গলে' যায়, তেমনি মাটিতে জল ঢাললে তার খনিজ পদার্থ গলে' যায়।
গাছের গোড়ায় জল না দিলে কি হবে ?	গাছের গোড়ায় জল না দিলে তার আহার বন্ধ হয়ে যাবে, সে মরে' যাবে।

অভিযোজন :—

মাটির নিচের বীজ থেকে অংকুরিত হয়ে গাছের বাইরে আসাকে লেখক কিসের সংগে তুলনা করেছেন ?

মাটির তলায় সে কি করছিল ?
কি হবার পর বাইরে এলো ?
বাইরে এসে সে কি দেখলো ?
এখন সে বেঁচে থাকবে কি করে ?
আমাদের সংগে তার খাওয়ার তফাৎ কি ?
এ বিষয়ে শিশুর সংগে তার সাদৃশ্য কি ?
কি কি উপায়ে সে খায় ?
কি হ'লে সে মরে' যায় ?

গৃহকাজ :—

বৃষ্টির জলে, সূর্যের আলোয় বীজের অংকুরোদ্গমের একটি ছবি (উদ্ভিদবিদ্যার নক্সা নয়) ছাত্রেরা এঁকে আনবে, শয়তা করবে এবং গাছের টব উল্টে দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করবে।

বোর্ডের কাজ :—

শব্দার্থ	**সারাংশ**
ছবি মৃত্তিকা = মাটি	মাটির নিচে বীজ পুঁতলে অনেকদিন সেখানে থাকে। শেষে বর্ষার বৃষ্টি পেয়ে, অংকুরিত হয়ে বাইরে এসে সূর্যকে দেখতে পায়। অংকুরের দুই অংশ—মূল ও কাণ্ড। মূল নিচের দিকে ও কাণ্ড ওপরের দিকে যায়।

(আরেকটি বোর্ডে ছবি আঁকা হবে)

দ্বিতীয় পাঠ—অণুবীক্ষণ……বাঁচিয়া আছি।

শীর্ষগুলি প্রথম পাঠের মতো হবে, কেবল পূর্বজ্ঞানের সংগে অতিরিক্ত লেখা হবে যে ছাত্রেরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ পড়েছে।

আয়োজন ঃ—

আগের দিনের পরীক্ষাগুলি ছাত্রেরা আরম্ভ করেছে কিনা এবং কে কি করেছে তার হিসেব নিয়ে ক্লাসের কাজ আরম্ভ হবে।

পাঠঘোষণা ঃ—

শিক্ষক ছাত্রদের বইয়ের নির্দিষ্ট পাতা খুলতে বলে' বোর্ডে প্রবন্ধ ও লেখকের নাম তুলে দেবেন—

উদ্ভিদের জীবন—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

উপস্থাপন ঃ—

পাঠ্যবস্তুটির অংশবিভাগ করে' পড়া হবে, প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্লেষণ হবে এবং বোর্ডের কাজ চলবে।

পদ্ধতি	বিষয়
	(ক) অণুবীক্ষণ······রস প্রবেশ করে।
অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কি দেখা যায়?	অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে গাছের ডাল বা মূল পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তার মধ্যে হাজার হাজার নল আছে।
এগুলির দ্বারা কি হয়?	এইসব নলের দ্বারা মাটি থেকে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।
অণুবীক্ষণ কিসের যন্ত্র?	অণুবীক্ষণ দিয়ে 'অণু' বা খুব ছোট জিনিষকে বড় দেখায়।
বোর্ডে লেখা হবে—	**গাছের ডাল ও মূলের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে, এগুলির দ্বারা মাটি থেকে তার শরীরে রস প্রবেশ করে।**

পদ্ধতি	বিষয়
	(খ) এ ছাড়া····· গাছকে বর্ধিত করে।
মূল ছাড়া আব কি দিয়ে গাছ আহার করে ?	গাছের পাতা বাতাস থেকে আহাব সংগ্রহ করে।
এই আহারের যন্ত্র কি ?	পাতাব মধ্যে ছোট ছোট ঠোঁট আছে।
তার দ্বারা সে কিভাবে আহার করে ?	খাবার দরকারে ঠোঁটগুলি খুলে যায় আর তাই দিয়ে বাতাস সংগ্রহ করে।
প্রাণীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ে বাতাসের কি পরিবর্তন হয় ?	প্রাণীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে অংগারক বেরোয় বলে' তা বাতাসকে বিষাক্ত করে।
এ অবস্থায় কি দুর্ঘটনা হতে পারে ?	এরূপ বেশিক্ষণ চল্লে জীবজন্তু বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করে' মারা যেতে পারে।
তা হয়না কেন ?	কি গাছ নিজ শরীরে অংগারক টেনে নিয়ে সেই দোষ নষ্ট করে।
তারা কি করে' একাজ করে ?	গাছের পাতায় যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন সূর্যের তেজে পাতা দিয়ে গাছের শরীরে অংগারক প্রবেশ করে।
বোর্ডে লেখা হবে—	প্রাণীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে অংগারক বেরোয়, গাছ তার পাতা দিয়ে তা টেনে নেয়।
গাছেরা আলো চায় কেন ?	আলো না হ'লে গাছ বাঁচতে পারে না।
এরজন্য তারা কি করে ?	তাই গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা কি করে' একটু আলো পাওয়া যায়।

পদ্ধতি	বিষয়
টবে গাছ রাখলে কি হয়?	ঘরের মধ্যে টবে গাছ রাখলে সে অন্ধকারের দিক থেকে আলোর দিকে যায়।
বনে গেলে কি দেখা যায়?	বনের মধ্যে গাছগুলি আলোর সন্ধানে উঁচু হতে থাকে।
লতা ছায়ায় থাকলে কি করে?	লতা ছায়ায় থাকলে আলোর দিকে লম্বা হয়ে বাড়ে।
এ থেকে কি বোঝা যায়?	এসব থেকে বোঝা যায় যে আলোই জীবনের মূল।
গাছ যে সূর্যের তেজ ধরে' রাখে তা কি করে' বুঝতে পারি?	কাঠে আগুন লাগালে যে আলো ও তাপ বেরোয় সেটাই সূর্যের তেজ।
এই আলো ধরার ফাঁদ কি?	গাছের পাতা এই আলো ধরার ফাঁদ।
লেখক যে বলেছেন আমরাও আলো আহার করি তা কি করে' হয়?	আমরা সূর্যালোকে পুষ্ট শস্য খাই—এইভাবে সূর্যালোক আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।
বোর্ডে লেখা হবে—	গাছ আলো আহার করে: তাই কাঠে আগুন লাগলে আলো ও তাপ বেরোয় আর আমরা শস্যের সংগে সূর্যালোক খাই।

অভিযোজন :—

বাতাসে আমরা কি দিই আর বাতাস থেকে আমরা কি নিই?

" গাছেরা " দেয় " " " তারা " নেয়?

গাছেরা কি দিয়ে অংগারক খায়?

এতে বাতাস পরিষ্কার হয় কি করে?

গাছেরা যে আলো চায় তা কি করে' জানতে পারি?

" " " খায় " " " " "

আমরা যে আলো খাই একথা কি করে' বোঝা যায়?

গৃহকাজ :—

"আমরা, গাছেবা ও আলোবাতাস"—এই নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করে' আনবে। প্রথমদিনেব পরীক্ষাটি কতদূব অগ্রসব হচ্ছে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।

বোর্ডের কাজ :—

শব্দার্থ

অণুবীক্ষণ যন্ত্র—
যে যন্ত্রের সাহায্যে খুব ছোট জিনিষ বড করে' দেখা যায়।

অংগারক—মানুষের পক্ষে বিষাক্ত গ্যাস।

ইংরেজি নাম—
কার্বন ডায়োক্সাইড।

সারাংশ

গাছের ডাল ও মূলের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে, এগুলির দ্বারা মাটি থেকে তার শবীরে রস প্রবেশ করে।

প্রাণীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে অংগারক বেরোয় গাছ তার পাতা দিয়ে তা টেনে নেয়।

গাছ আলো আহার করে, তাই কাঠে আগুন লাগলে আলো ও তাপ বেরোয় ও আমরা শস্যের সংগে সূর্যালোক খাই।

তৃতীয় পাঠ কোনও......মরিয়া যায়।

শীর্ষগুলি দ্বিতীয় পাঠের মতো হবে।

আয়োজন :—

ছাত্রদের বর্তমান পাঠে আগ্রহী করার জন্য এবং পূর্বপাঠের সংগে সংযোগসাধনের জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন :—

—গাছের মূল ও কাণ্ড কোন কোন দিকে যায় সে সম্বন্ধে পরীক্ষায় কে কে কি কি দেখেছ ?

—বাতাসের ব্যবহারে গাছের সংগে আমাদের কি আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে ?

—গাছের কাছ থেকে কি করে' আমরা আলো পাই ?

—গাছ মরে গিয়েও কি করে' আমাদের উপকার করে ?

পাঠঘোষণা :—

ছাত্রদের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় বই খুলতে বলে' 'শক্ষক বোর্ডে লিখবেন —উদ্ভিদের জীবন—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

উপস্থাপন :—

ছাত্রেরা পাঠ্যবস্তুর একেক অংশ পড়বে,প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্লেষণ ও সেই সংগে বোর্ডের কাজ অগ্রসর হবে।

পদ্ধতি	বিষয়
(ক) কোনও·········ফুল হইল।	
গাছের সন্তান কারা ?	বীজেরা গাছের সন্তান।
এদের তারা কি দিয়ে রক্ষা করে ?	এদের রক্ষা করার জন্য তারা ফুলের ঘর তৈরি করে।
গাছের ফুল ফুটলে কি হয় ? বোর্ডে লেখা হবে—	গাছ ফুলের ঘর তৈরি করে' তাদের সন্তান বীজদের রক্ষা করে।

পদ্ধতি	বিষয়
	(খ) গাছে গাছে……সুগন্ধ বিস্তার করে।
গাছে গাছে ফুল ফুটলে গাছ কি করে?	আমাদের আনন্দ হ'লে আমরা যেমন দশজনকে নিমন্ত্রণ করি গাছও তেমনি ফুল দিয়ে দশজনকে নিমন্ত্রণ করে।
বন্ধুরা যাতে চিনতে পারে তাই গাছ কি করে?	বন্ধুরা যাতে চিনতে পারে তাই গাছ ফুলের নিশান তুলে দেয়।
গাছের বন্ধু কারা?	প্রজাপতি আর মৌমাছিদের সংগে গাছের বন্ধুতা।
যে-সব পতংগ দিনের আলোয় আসতে পারেনা তাদের জন্য গাছ কি করে?	যে সব পতংগ দিনের আলোয় আসতে পারেনা তারা যাতে গন্ধ শুঁকে পথ চিনতে পারে তাই গাছেরা দিকে দিকে ফুলের গন্ধ বিস্তার করে।
বোর্ডে লেখা হবে—	ফুলের রং ও সুগন্ধ দিয়ে গাছ মৌমাছি ও প্রজাপতিদের নিমন্ত্রণ করে। তারা ফুলের সংগে ফুলের পরাগমিলন সাধন করে।
	(গ) গাছে গাছে……থাকিতে পারে না।
প্রজাপতি ও মৌমাছি গাছের বন্ধু কেন?	প্রজাপতি ও মৌমাছি ফুলের মধুপান করতে এসে গাছের উপকার করে।
কি উপকার করে?	তারা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে
কি ভাবে?	যাবার সময়ে এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে দিয়ে পরাগমিলন সাধন করে।
বীজ কি ভাবে লালিত পালিত হয়?	গাছের শরীরের রস দিয়ে বীজ লালিত পালিত হয়।

পদ্ধতি	বিষয়
গাছ যখন সতেজ থাকে তখন হাওয়া এসে কি করে ?	গাছ যখন সতেজ থাকে তখন হাওয়া এসে পাতা ঝরিয়ে দিয়ে পাতার সংগে খেলা করে।
ফল বড় হয়ে গেলে কি করে ?	ফল ধরলে পর গাছ আর শরীরের ভার বহন করতে পারে না, বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগলে থরথর করে' কাঁপতে থাকে। তার ডাল ভেঙে পড়ে।
গাছ সন্তানের জন্য কিভাবে জীবন দান করে ?	ফলকে পুষ্ট করে' দিয়ে গাছ নিজে মরে' যায়।
বোর্ডে লেখা হবে :—	বীজকে গাছ নিজের শরীরের রস দিয়ে পালন করে। ফল পূর্ণতা পেলে গাছ মরে যায়।

অভিযোজন :—

এই প্রবন্ধের নাম উদ্ভিদের জীবন কেন দেওয়া হয়েছে ?

আমরা গাছের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি কি কাজ দেখতে পেলাম ?

গাছের যে জীবন আছে তা আমরা কি কি লক্ষণ দেখে বুঝতে পারি ?

যিনি এই প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি কে ?

তাঁকে আচার্য এই নামে অভিহিত করা হয়েছে কেন ?

পৃথিবীর মধ্যে তিনি কি কীর্তি রেখে গেছেন ?

এতবড় বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধ পড়ে' বুঝতে তোমাদের কষ্ট হলনা কেন ?

এই প্রবন্ধের কোথায় কোথায় লেখকের কবিত্বশক্তি লক্ষ্য করেছ বল।

গৃহকাজ ঃ—ছাত্রেরা তাদের পরীক্ষাগুলি শেষ পর্যন্ত দেখবে।

তাদের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা কাগজ দেওয়া হবে সেটা তারা খাতায় লিখে নেবে।

বোর্ডের কাজ :—

শব্দার্থ	সারাংশ
প্রয়োজনমত।	গাছ ফুলেব ঘর তৈরি করে' তাদেব সন্তান বীজদের রক্ষা করে। ফুলেব রং ও সুগন্ধ দিয়ে গাছ মৌমাছি ও প্রজাপতিদের নিমন্ত্রণ করে। তাবা ফুলের সংগে ফুলেব পরাগমিলন সাধন করে। বীজকে গাছ নিজের শরীবে রস দিযে পালন করে। ফল পূর্ণতা পেলে গাছ মবে' যায়।

বিষয়—বাংলা গদ্য। (ইতিহাস বিষযক।)

(৫)

গড় বয়স—১২ +।
ছাত্র সংখ্যা—৪০।
সময়—৪০ মিনিট।

বিশেষ বিষয়—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
বজনীকান্ত গুপ্ত।
(দুই দিনে পাঠ সমাপ্য।)
পাঠক্রম—১। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ……নিবিষ্ট থাকিতেন।
২। নালন্দার……হইয়াছে।

প্রথম পাঠ—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ…… নিবিষ্ট থাকিতেন।

উদ্দেশ্য ঃ—

—উপস্থিত প্রবন্ধটির পাঠ এবং অর্থ ও ভাবগ্রহণ।

—বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা প্রবন্ধপাঠের দ্বারা বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ের আলোচনার ক্ষমতা বাড়ানো।

—প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি গৌরবময় অধ্যায়ের আলোচনা দ্বারা জাতীয় ঐতিহ্যবোধ জাগানো।

পূর্বজ্ঞান :—ছাত্রেরা অনুরূপমানের বাংলা প্রবন্ধ পড়ে' অর্থ ও ভাব গ্রহণে অভ্যস্ত। তারা ইতিহাসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পড়েছে।

আয়োজন :—পাঠেব ভিত্তিস্থাপন এবং ছাত্রদের চিত্তাকর্ষণের জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন—

তোমরা প্রাচীন ভারতীয় কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রের কথা জান?

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযে কারা পডাশুনো করতেন?

এমন কোনো বিদেশী পরিব্রাজকের নাম করতে পার যিনি নালন্দায় এসেছিলেন?

পাঠঘোষণা :—শিক্ষক ছাত্রদের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় বই খুলতে বলে' প্রবন্ধ ও লেখকের নাম বোর্ডে লিখে দেবেন—

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—রজনীকান্ত গুপ্ত।

উপস্থাপনা :—ছাত্রেরা পর্যায়ক্রমে প্রবন্ধের একেক অংশ পডবে, শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক আলোচনায় সেই অংশের বিশ্লেষণ হবে ও সংগে সংগে বোর্ডের কাজ চলবে।

পদ্ধতি	**বিষয়**
(ক) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দি······পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।	
বর্তমান ভারতে যে-সব ত্রুটি দেখা যায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে তার কোন কোন-গুলি অনুপস্থিত ছিল?	খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে বর্তমানকালের ন্যায় মলিন বেশ ছিল না, দীনহীনতার আবেশ ছিলনা, শোকের উচ্ছ্বাস, নৈরাশ্যের আর্তনাদ, মহামারীর করাল ছায়া ছিল না।

পদ্ধতি	বিষয়
এখন দেশে যে যে ত্রুটি আছে তার কিছু উদাহরণ ছাত্রদের দিতে বলে' শিক্ষক বলবেন—সপ্তম শতাব্দিতে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল ?	প্রবন্ধ লেখার সময়ে এ-দেশ বৃটিশের অধীন ছিল বলে দেশের আরো বেশি দুর্দশা ছিল।
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ছাত্রদের ইতিহাসের জ্ঞান ব্যবহার করতে বলা হবে।	এই সময়ে ভারত প্রফুল্ল। স্বাধীনতার বলে বলীয়ান, ধনসম্পদের মহিমায় মহিমান্বিত ছিল, এই সময়ে আর্য কীর্তি পূর্ণতা পেয়েছিল।
এই আর্যকীর্তিতে কি কি ছিল ? অর্থবোধের পর শিক্ষক ছাত্রদের ঐতিহাসিক জ্ঞান থেকে ষড়দর্শন, কাব্য, জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করবেন, কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা হবে না।	তখন দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, সুন্দর ফুলের মতো যার প্রকাশ সেই মনোহর কবিতাবলীর রচনা হয়েছে, জ্যোতিষ, গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যার গৌরব বেড়েছে।
কার সুশাসনে ভারতের সম্পদ এত বেড়েছিল ?	মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের সুশাসনে ভারত এত সম্পদশালী হয়েছিল।
কার বীরত্বকীর্তি প্রসিদ্ধ ?	মহারাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্ব-খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।
নালন্দায় তখন কার পূজা হ'ত ? ভারতী কিসের ও কোন দেবী ? কোন কাজকে ভারতীর পূজা বলা হয়েছে ?	নালন্দায় তখন ভারতী বা বাগ্‌দেবীর পূজা হ'ত—অর্থাৎ বিদ্যার চর্চা হ'ত। বিদ্যাচর্চাকেই জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর পূজার সংগে তুলনা করা হয়েছে।

(খ) নালন্দায়······প্রসিদ্ধ ছিল।

পদ্ধতি	বিষয়
এখানে কারা থাকতেন ও কি করতেন ?	বৌদ্ধদের আঠারোটি বিভিন্ন দলের দশহাজার শ্রমণ এই স্থানে থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যাব আলোচনা করতেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্দৃশ্য ও অট্টালিকা বর্ণনা কর।	বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশ বৃক্ষবাটিকায় পরিশোভিত ছিল, অর্থাৎ বাগান-বাড়িতে সাজানো ছিল। (বৃক্ষবাটিকা =বাগানবাড়ি) এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেবাব জন্য একশোটি ঘর ছিল।
শিক্ষক বলবেন—	একশোটা শ্রেণিকক্ষ যাতে আছে এতবড় একটা বিশ্ববিদ্যালয কল্পনা কর।
	তাছাড়া শাস্ত্রজ্ঞদের মেলামেশার জন্য মধ্যস্থানে অনেকগুলি ঘর ছিল।
কোন মহারাজা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক কিছু দিয়েছিলেন ? কি কি ?	মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতেন।
কিভাবে এখানকার আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ ও ধর্মভাবে আবিষ্ট থাকতো ?	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নগরের বাহিরে অবস্থিত ছিল বলে' জনকোলাহল শান্তিভংগ করতে পারতোনা, সাংসারিক প্রলোভন পবিত্রতা নষ্ট

পদ্ধতি	বিষয়
	করতে পারতোনা, শিক্ষার্থিগণ এখানে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকতো।
আজকাল এই ধরণের ব্যবস্থা করে' বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিরক্ষা সম্ভব কি?	ছাত্রেরা সংক্ষেপে মতামত প্রকাশ করবে।

অভিযোজন :—

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যখন গৌরবের শিখরে তখন ভারতের অবস্থা কেমন ছিল?

গৌরবের কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কর।

তখন দেশের অবস্থা কেমন ছিল?

লেখকের সময়ের আর আজকালকার অবস্থার সংগে তার তুলনা কর।

কার দানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়েছিল?

কোন কোন রাজা নালন্দার উন্নতিসাধন করেন?

তখনকার বড় বীর কে ছিলেন?

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়তেন?

তাঁদের ব্যয় কে নির্বাহ করতেন?

নালন্দার ঘরবাড়ি ও আবহাওয়ার বর্ণনা কর।

গৃহকাজ ঃ—

আজকাল নালন্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হ'লে তখনকার ব্যবস্থার কি কি পরিবর্তন করতে হবে—এই বিষয়ে ছাত্রেরা বাড়ি থেকে খাতার পাতায় এক পৃষ্ঠা লিখে আনবে।

বোর্ডের কাজ ঃ—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—রজনীকান্ত গুপ্ত।

শব্দার্থ

ধনাঢ্য—বড়লোক

বৃক্ষবাটিকা বাগানবাড়ি।

ষড়দর্শন—

কয়েকটি কবি ও নাট্যকারের নাম।

জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের পণ্ডিতদের নাম।

সারাংশ

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে ভারতের অবস্থা গৌববময় ছিল। সেই সময়ে বুদ্ধদেবের এক ধনাঢ্য বণিকশিষ্যের প্রদত্ত উদ্যানে নালন্দা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বহু রাজার দানে বৃদ্ধি পায়। নালন্দায় বৃহৎ অট্টালিকা সমূহ ও বৃক্ষবাটিকা ছিল। নগর থেকে দূরে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পড়াশুনো হ'ত।

দ্বিতীয় পাঠ :—নালন্দার……হইয়াছে।

শীর্ষগুলি প্রথম পাঠের অনুরূপ, কেবল পূর্বজ্ঞানের অংশে অতিরিক্ত লেখা থাকবে—প্রবন্ধটির পূর্বাংশ শ্রেণিতে পড়ানো হয়েছে।

আয়োজন :—

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল? নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষত্ব এবং প্রধান গৌরব, তোমাদের মতে, কি কি ছিল?

পাঠঘোষণা :—ছাত্রদের বইয়ের পাতা খুলতে বলে' শিক্ষক বোর্ডে প্রবন্ধ ও লেখকের নাম লিখবেন।

উপস্থাপন :—ছাত্রেরা পাঠ্যবস্তুর একেক অংশ পড়বে, শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সংগে সংগে বোর্ডের কাজ অগ্রসর হবে।

পদ্ধতি	বিষয়
(ক) নালন্দার বিদ্যালয়······অলংকৃত করিয়াছিল।	
নালন্দার বহির্দৃশ্যের সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কোন সৌন্দর্যের উল্লেখ লেখক করেছেন ?	বহিঃ সৌন্দর্য ছাড়া নালন্দার আন্ত সৌন্দর্যেরও খ্যাতি ছিল।
কোন প্রধান অধ্যাপকের নাম করা হয়েছে ?	প্রধান অধ্যাপক শীলভদ্র বৃদ্ধ ছিলেন বলে' সাধারণের নিকট সম্মানি হতেন।
তিনি কেমন লোক ছিলেন ? তিনি কত জ্ঞানী ও ধার্মিক ছিলেন ?	সমস্ত শাস্ত্র তাঁর আযত্ত ছিল এব অসাধারণ ধর্মপরায়ণতা ছিল।
(খ) চীনের প্রসিদ্ধ······করিয়া তুলিলেন।	
কোন বিদেশী ব্যক্তি নালন্দায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন ?	চীনের প্রসিদ্ধ পর্যটক হিউ-এন-স ভারতে এসে নালন্দায় নিমন্ত্রিত হ'ন
তাঁকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করা হয় ?	দুইশত শ্রমণ যথোচিতভাবে তাঁ অভ্যর্থনা করেন। বহুসংখ্যক বৌদ্ধে কেউ ছাতা ধরেন, কেউ পতাক ওড়ান এবং কেউ বা গম্ভীর স্বরে প্রশংসাগীত গান।
(গ) এইরূপে······শিষ্য হইলেন।	
এরপর হিউ-এন-সাং কি করলেন ?	এরপর হিউ-এন-সাং জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যক্ষকে অভিবাদন করেন ও নিজেকে শিষ্যশ্রেণির মধ্যে গণ করেন।
শিক্ষক বলবেন—	জ্ঞানবৃদ্ধ মানে যিনি জ্ঞানে বড়।

পদ্ধতি	বিষয়
নিজের দেশে হিউ-এন-সাঙের পদমর্যাদা কেমন ছিল ?	চীনদেশে সর্বপ্রধান তত্ত্ববিৎ বলে। পূজিত হয়েছিলেন এবং অসাধারণ জ্ঞানগরিমায় তাঁর মাথা উঁচু ছিল।
শিক্ষক বলবেন—	তত্ত্ববিৎ=তত্ত্ব জানেন যিনি।

(ঘ) বিদ্যালয়ের······লাভ করিলেন।

পদ্ধতি	বিষয়
নালন্দায় হিউ-এন-সাঙের থাকার কেমন ব্যবস্থা হ'ল ?	নালন্দায় তাঁকে একটি সুন্দর কক্ষে স্থান দেওয়া হ'ল, তাঁর দশজন অনুচর হ'ল, এবং দু'জন শ্রমণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত হ'লেন।
তাঁর ব্যয়ভার কে নিলেন ?	মহারাজ শিলাদিত্য তাঁর ব্যয়ভার নিলেন এবং এইভাবে তিনি পাঁচ
তিনি কতদিন নালন্দায় রইলেন ?	বছর নালন্দায় থাকলেন।
তিনি এই সময়ে কি বিষয়ে পড়াশুনো করলেন ?	তিনি এই সময়ে ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদের নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।
এর মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্র কোনটি ?	ত্রিপিটক বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্র।
এখন নালন্দার কি অবস্থা হয়েছে ? কি করে' হ'ল ?	এখন নালন্দার পূর্বের সৌন্দর্য নেই। কালের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীর আধিপত্যের প্রভাবে সে ভগ্নদশায় পতিত হয়েছে।

অভিযোজন ঃ—

শিক্ষক ছাত্রদের নালন্দার ধ্বংসস্তূপের ছবি দেখিয়ে কোথায় কি হ'ত আলোচনা করবেন এবং কল্পনার চোখে তখনকার জীবনযাত্রাকে ফুটিয়ে তুলবেন।

রজনীকান্ত গুহের রচনায় কি ভাবে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুণের সমাবেশ হয়েছে সে বিষয়েও ছাত্রেরা আলোচনা করবে।

গৃহকাজ :—

ইতিহাসের বই থেকে নালন্দা, শীলভদ্র ও হিউ-এন-সাঙের বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করবে।

বোর্ডের কাজ :—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—রজনী কান্ত গুহ।

শব্দার্থ	**সারাংশ**
আন্তরসৌন্দর্য=ভেতরের রূপ অন্তর থেকে আন্তর হয়েছে। জ্ঞানবৃদ্ধ—খুব জ্ঞানী।	নালন্দার প্রধান অধ্যাপক শীলভদ্র বৃদ্ধ ও বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং নালন্দায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সসম্মানে পাঁচবছর বসবাস করে' বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করেন।

(৬) বিষয়—বাংলারচনা।

বিশেষ বিষয়—প্রবন্ধরচনা—বসন্তকাল।

উদ্দেশ্য :—

—বসন্তঋতু সম্বন্ধে সরল ও সুন্দর ভাষায়, সুসম্বদ্ধরূপে প্রবন্ধ-রচনার অভ্যাস করানো।

—ভাষাব ব্যবহারনৈপুণ্য ও প্রকাশক্ষমতা বাড়ানো।

উপকরণ :—

শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও উদ্ধৃতি সংগ্রহ।

পূর্বজ্ঞান :—

ঋতু সম্বন্ধে ও বসন্তকাল সম্বন্ধে ছাত্রদের সাধারণজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। ভূগোলে ঋতু এবং বাংলায় বিভিন্ন ঋতুবিষয়ক প্রবন্ধ ও

কবিতা পড়েছে। সরল ভাষায় ধারাবাহিকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার মতো ভাষার ব্যবহারক্ষমতা আছে।

আয়োজন :—

ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানকে উদ্ভূত ও আগ্রহকে আকর্ষণ করার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে—

—বছরে ক'টি ঋতু ?

—এখন কোন ঋতু ? (বসন্তকালে এই প্রবন্ধটি লেখানো হবে।)

—কোন কোন মাসে বসন্তকাল হয় ?

—বসন্তের কোনো গান বা কবিতার উল্লেখ করতে পার কি ?

পাঠঘোষণা :—

আজ বসন্তঋতুর সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উপস্থাপন :—

শিক্ষক প্রশ্নের ছাত্রদের মনের ধারণাসমূহ সচেতনতার স্তরে এনে গুছিয়ে নেবেন। বসন্তের যে গান ও কবিতার উল্লেখ হয়েছে, ভূগোলে যা পড়েছে আর আসপাশে যা দেখতে পায় তাই দিয়ে একটা বর্ণনা গড়ে উঠবে, সংগে সংগে বোর্ডের কাজ চলবে—

পদ্ধতি	বিষয়
বসন্তকালে কিসের একটা নোতুন শব্দ শুনতে পাও ?	বসন্তে কোকিল ডাকে।
উদ্ধৃতি—	ফাগুনের নবীন আনন্দে গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে দিলি তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি, ভরি দিল বকুলের গন্ধে। (রবীন্দ্রনাথ।)

পদ্ধতি	বিষয়
কোকিলের গানের সংগে আর কিসের উল্লেখ হয়েছে ?	বকুলবীথিকায় কোকিল ডাকছে ; তার গানে আর বকুলের গন্ধে চারদিক ভরে গেছে
বকুলবীথি দেখেছ কলকাতায় ?	ছাত্রেরা দেখে থাকলে বলবে।
শিক্ষক বকুলফুলের গন্ধ শোঁকাবেন।	
এই সময়ে আর কি কি ফুল ফোটে ?	সুগন্ধ ফুল—পদ্ম, গোলাপ, যুঁই, বেল, রজনীগন্ধা।
শিক্ষকের সাহায্যে তালিকা হবে।	উজ্জ্বল ফুল—স্থলপদ্ম, কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া, পলাশ।
শিক্ষক বলবেন—	এত ফুল যেন বাতাস পথ হারিয়ে ফেলেছে—"বাতাস ছুটিছে বনময়রে ফুলের না-জানে পরিচয়রে।"
এই সময় কিসের বাতাস কোন দিক থেকে বয় ?	এই সময় দক্ষিণা বাতাস বয়— "আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা, এসগো, এসগো, আজি বসন্ত এস।"
এই বাতাসের অন্য নাম কি ? কেন ? এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি কি ?	দক্ষিণের মলয় পর্বতের ওপর দি চন্দনের গন্ধ বহন করে' নিয়ে আ এই প্রসিদ্ধি আছে, তাই একে মল বাতাসও বলে।
কথাটা কতদূর সত্য ?	সত্যি সত্যি দক্ষিণের বাতাসে চন্দনে গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু এ চন্দনের মতো আরামদায়ক বলা যায়

পদ্ধতি	বিষয়
বাংলা দেশে কোথা থেকে দক্ষিণের বাতাস আসে?	বাংলা দেশে দক্ষিণের বাতাস বংগোপসাগরের ঠাণ্ডা নিয়ে আসে বলে' এত আরামদায়ক।
বসন্তের আবহাওয়া কেমন?	বসন্তের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ—বেশি ঠাণ্ডাও না, বেশি গরমও না,—আরামদায়ক।
কলকাতায় কি রকম বোঝ?	কলকাতায় বসন্তকাল বেশ 'গরম', কিন্তু দক্ষিণের বাতাস বয় বলে বেশি কষ্ট হয় না।
বসন্তকালে কি কি পূজা হয়?	সরস্বতী পূজা, বাসন্তী পূজা আর দোল এই তিনটি উৎসব বসন্তকালে হয়।
সরস্বতীপূজার তিথির কি নাম? দোলের কি তিথি?	শ্রীপঞ্চমী, বসন্তপঞ্চমী, সরস্বতী পূজার আর দোল পূর্ণিমা দোলের তিথি।
সরস্বতীপূজায় কোন ফল খাও? গাজরা আর কি ফল পূজায় দাও?	কুল আর কাচা আম বসন্তের সব চেয়ে উপভোগ্য ফল।
বসন্তের কোনো অসুবিধার নাম করতে পার?	এই সময়ে হাম, জলবসন্ত, বসন্ত এই সব ছোঁয়াচে রোগ খুব বেশি হয়।
উদ্ধৃতি—	"কোথা হা হন্ত' চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি।"
বসন্তকালের মনের ভাব কি? কেন?	নানা ফুলে-ফুলে, নানা উৎসবে, দক্ষিণ হাওয়ায়, কোকিলের ডাকে, বসন্তে একটা আনন্দময় ভাব আসে।

পদ্ধতি	বিষয়
কয়েকটা কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়ে দাও—	"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তব অবগুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত জীবনে কোরোনা বিড়ম্বিত তারে।" "আজি দোল পূর্ণিমাতে দুলবি যদি আয়।" ইত্যাদি।

অভিযোজন ঃ—

বোর্ডের সংক্ষিপ্তসার মুছে সেখানে প্রবন্ধের খসড়া তৈরী হবে।

পদ্ধতি	বিষয়
প্রবন্ধের কি কি অংশ ? শিক্ষক বোর্ডে তিনটি শীর্ষ লিখে দিয়ে ছাত্রদের দিয়ে বিষয় বিভাগ করাবেন।	ভূমিকা, বিষয়বস্তু, উপসংহার।
ভূমিকায় কি লিখবে ?	ভূমিকা—একটি সুন্দর কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হবে।
বিষয়বস্তুতে কি কি থাকবে ?	বিষয়বস্তু—১। প্রাকৃতিক বর্ণনা। ২। ফুল, ফল। ৩। উৎসব। ৪। অসুবিধা। উপসংহার— মনের ভাব। এইসব অংশেও অল্প অল্প কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়।

গৃহকাজ ঃ—

শিক্ষক নিজের সংগৃহীত উদ্ধৃতিগুলি ছাত্রদের দিয়ে যাবেন। তারা আরো উদ্ধৃতি সংগ্রহ করবে আর প্রবন্ধটি লেখার জন্য প্রস্তুত হবে। এর পরের প্রবন্ধের ক্লাসে শিক্ষক এদের লেখাবেন।

বোর্ডের কাজ ঃ—

(উপস্থাপনের সময়ে যা হয়েছে)

বসন্তকাল

কাল—ফাল্গুন ও চৈত্রমাস।

পাখি—কোকিল

ফুল—বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা, পদ্ম, গোলাপ,—সুগন্ধ।

স্থলপদ্ম, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ—উজ্জ্বলবর্ণ।

ফল—কুল, কাঁচা আম।

আবহাওয়া—নাতিশীতোষ্ণ।

উৎসব—সরস্বতীপূজা, বাসন্তীপূজা, দোল।

রোগ—হাম, জলবসন্ত, বসন্ত।

মনের ভাব—আনন্দময়।

অষ্টম শ্রেণি

(৭) গড় বয়স--১৩৮

বিষয় বাংলা কবিতা।

বিশেষ বিষয়—সাধক হরিদাস—কবিশেখর কালিদাস রায়।

উদ্দেশ্য ঃ—

—কবিতাটির অর্থ, ভাব ও রস উপলব্ধি করানো।

—কাব্যসাহিত্যের প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করা।

—কবিতাটির উচ্চভাবে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করা।

উপকরণ :—

শ্রেণিকক্ষের সাধারণ, পাঠ্যপুস্তক, সম-উক্তি।

পূর্বজ্ঞান :—

ছাত্রেরা অনুরূপ মানের বাংলা কবিতা পড়ে অর্থ ও রস উপলব্ধি করতে পারে, কালিদাস রায়ের অন্য কবিতা পড়েছে, ইতিহাসে তানসেন ও আকবরের কথা পড়েছে।

আয়োজন :—

পাঠের পরিবেশসৃষ্টি ও ছাত্রদের আগ্রহান্বিত করার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে।

কয়েকজন আধুনিক বড় গায়কের নাম কর।

" ইতিহাসপ্রসিদ্ধ " " " "

তানসেন কে ছিলেন?

তাঁর বিষয়ে কোনো ঘটনা বা কাহিনী বলতে পারবে?

পাঠঘোষণা :—

শিক্ষক প্রথমে উপস্থাপ্য কবিতাটি আবৃত্তি অথবা পাঠ করবেন তারপর ছাত্রদের পৃষ্ঠানির্দেশ করে' বই খুলতে বলে' বোর্ডে কবিতা ও কবির নাম লিখবেন—

উপস্থাপন :—

ছাত্রদের একবার নীরব পাঠ করতে দিয়ে শিক্ষক সমগ্র কবিতাটি অবলম্বনে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন—

পদ্ধতি	বিষয়
কবিতাটির প্রথমেই কার নাম করা হয়েছে?	সাধক হরিদাসের নাম দিয়ে কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে এবং পর পর তানসেন ও সম্রাট আকবরের কথা বলা হয়েছে।
পরে আর কার কার নাম আছে?	

পদ্ধতি	বিষয়
সম্রাট কার সংগে কার তুলনা করেছেন?	কবিতায় সম্রাট আকবর তানসেনের গান ও সাধক হরিদাসের গানের তুলনা করেছেন।

এরপর ছাত্রেরা কবিতাটির কয়েক ছত্র করে' পড়বে, প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় পঠিত অংশের বিশ্লেষণ হবে ও সংগে সংগে বোর্ডের কাজ চলতে থাকবে।

পদ্ধতি	বিষয়
(ক) সাধক হরিদাস……নগরের মাঝে।	
সাধক হরিদাস কোথায় কোথায় গান করে' ফেরেন?	সাধক হরিদাস গিরি বনে, পথে পথে ও পল্লীজনপদে গান করে' ফেরেন।
কি বাজিয়ে তিনি গান করেন?	তিনি একতারা বাজিয়ে গান করেন
কারা তাঁর গান শোনে?	আর বনের পশুপাখী, তটিনী ও তটশাখী তাঁর গান শোনে।
কোথায় ও কার কাছে যাননা?	তিনি নগরের মাঝে, রাজার সভাতে ও ধনীর দুয়ারে যাননা।
তাঁর চেহারা ও বেশ কেমন?	তিনি পাগল ভিখারির সাজে সেজে থাকেন। তটিনী—ছোটনদী তটশাখী—তীরের গাছ।
জনপদ ও নগরের তফাৎ কি?	জনপদ = গ্রাম, নগর = শহর।
বাংলা দেশে কারা একতারা বাজিয়ে গান করে? শিক্ষক উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।	বাংলাদেশে বাউলরা একতারা বাজিয়ে গান করে। বাউল শব্দ বাতুল বা পাগল থেকে এসেছে।

পদ্ধতি	বিষয়
	(খ) একদা সম্রাট······হাতে।
সাধক হরিদাস তানসেনের কে ?	সাধক হরিদাস তানসেনের গুরু
সম্রাট কে ? তিনি তানসেনের কাছে কি চাইলেন ?	সম্রাট আকবর একবার তানসেনেব কাছে তাঁর গুরুর দর্শনলাভ করে' তাঁর গান শুনতে চাইলেন।
তানসেন কি ভাবে এই দর্শন পাওয়ালেন ?	এইকথা বলার পর রাজা ছদ্মবেশ ধবে তানসেনের সংগে সেখানে গেলেন
হরিদাস কি ভাবে, কি করছিলেন ?	যেখানে হরিদাস বিভোর হয়ে প্রাণ ভরে' একতারা হাতে গান গাইছেন।
সম্রাটকে কেন যেতে হ'ল ?	হরিদাস নগরে বা রাজদ্বারে যাননা
এতে সম্রাটকে কি রকম লোক বলে' মনে হচ্ছে ?	বলে' সম্রাট নিজেই গেলেন, এতে তাঁর চরিত্রের মহত্ব দেখা যাচ্ছে।
সম্রাট ছদ্মবেশে গেলেন কেন ?	পাছে রাজাকে দেখে গান বন্ধ করেন এইজন্য সম্রাট ছদ্মবেশে গেলেন।
সম্রাটকে কি বলে' উল্লেখ করা হয়েছে ?	নৃপ = রাজা।
হরিদাস কোন ভাবে বিভোর ?	হরিদাস তখন ভগবানের নামে বিভোর। বিভোর = বিহ্বল।
কেবল কবিতায় ব্যবহৃত কোন শব্দ এখানে আছে ?	দরশন = দর্শন।

পদ্ধতি	বিষয়
	(গ) কহিল……সাজে ?
সম্রাটের মতে তানসেন কি ভাবে গান করেন ?	তানসেন রাগিণী ও তানলয়ের বিশুদ্ধতা রেখে গান করেন কিন্তু আজ যা শুনলেন তার মতো করে' সম্রাটের প্রাণ আকুল করতে পারেননা।
কিন্তু হরিদাসেব গানের তুলনায় তাঁর গানে কিসের অভাব তিনি বোধ করলেন ?	
সম্রাটের এই তুলনাকে তানসেন কিভাবে অসার্থক বলে' দেখলেন ? এ প্রসংগে কিসের উদাহরণ দিলেন ?	নিজের গানের সংগে হরিদাসের গানের তুলনার অসার্থকতা দেখাবার জন্য তানসেন এক উপমা দিলেন— হরিদাসের গান গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী আর তানসেনের গান একটা বদ্ধ জল কূপের মতো
গোমুখী উৎস কি ?	বিষ্ণুরভক্তি জলের ধারার আদেশ মতো বয়ে গংগার সৃষ্টি করেছিল। সেই গংগা মহাদেবের জটা থেকে গোমুখী উৎস দিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে' তিন ধারায় প্রবাহিত হয়—স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে।
মন্দাকিনী কি ?	স্বর্গে যে ধারা গেল তার নাম মন্দাকিনী। অর্থাৎ হরিদাসের গান মূর্তিমতী ভগদ্ভক্তির মতো এবং এক স্বর্গীয় জিনিষ।

পদ্ধতি	বিষয়
কোন গায়ক কিসের বিষয় গান করেন? তাতে তফাৎ কি হয়?	তানসেন ভারতবর্ষের রাজার আদেশ মতো সভার লোকদের মাঝখানে গান করেন তাই তাঁব গানে লৌকিক দক্ষতাই দেখা যায় আর হবিদাস গান করেন বিশ্বজগতের রাজা ভগবানেব সভায়, তাই তিনি ভক্তিতে বিভোব হয়ে গান করেন আর যারা শোনে তাদেব প্রাণ আকুল হয়।
রাজাবাচক কটা পদ পেলে?	রাজা, সম্রাট, নৃপ, ভূপ, ভাবতভূপ, বিশ্বভূপাল।
কোনটি ভগবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?	বিশ্বভূপাল বলতে ভগবানকে বোঝানো হয়েছে।
সম-উক্তি লেখা একটা চার্ট টাঙানো হবে।	অসীম আকাশে পরমপুলকে পাখি গাহে যেই গান, জগতপিতার স্তবগান সে যে স্বরগের অবদান। খাঁচাব পাখি সদা বুলি বলে তুষিতে পালকমন তোষণ ভাষণে মিলিবে কেমনে পরাণের পরশন?

অভিযোজন ঃ—পাঠ্য কবিতার সংগে উদ্ধৃত কবিতাব তুলনা করা হবে। দ্বিতীয় কবিতার "জগৎপিতার স্তবগান" প্রথম কবিতায় কে গাইছেন? "তোষণ-ভাষণ" কার? প্রথম কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে' দেখাও।

"অসীম-আকাশ' কার ?

খাঁচা কার ?

খাঁচার পাখি কাকে খুসি করে ?

অন্য পাখি কাকে খুসি করে ?

ছাত্রেরা প্রথম কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তুলনাটা দেখিয়ে দেবে।

বোর্ডের কাজ :—

সাধক হরিদাস।

কবিশেখর কালিদাস রায়।

সাধক হরিদাস একতারা বাজিয়ে পাহাড়ে, বনে, গ্রামে গান করে' ফেরেন। বনের পশুপাখি, গাছপালা তাঁর গান শোনে। তাঁর বেশ পাগল ভিখারির মতো।

সম্রাট আকবর তানসেনকে অনুরোধ করে' ছদ্মবেশে, বিনীতভাবে তাঁর গান শুনতে পেলেন।

তিনি তুলনা করলেন—

তানসেনের গান—	হরিদাসের গান—
রাগিণী, তানলয়ে সমৃদ্ধ	প্রাণ আকুল করা

তানসেন বল্লেন—

হরিদাসের গান—	তানসেনের গান—
গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী,	রুদ্ধবারি কূপ
তিনি বিশ্বভূপালের সভার গায়ক।	তিনি সম্রাটের আদেশে লোকেদের সভায় গান করেন।

শব্দার্থ (অন্য বোর্ডে হবে।)

তটিনী—ছোট নদী।	গোমুখী উৎস—গংগাবতরণের স্থান
তটশাখী—তীরের গাছ।	মন্দাকিনী—স্বর্গগংগা।
জনপদ—গ্রাম।	রাজাবোধক শব্দ - রাজা, সম্রাট,
বিভোর—বিহ্বল	নৃপ, ভূপ, ভারতভূপ
দরশন—কবিপ্রয়োগ	বিশ্বভূপাল = ভগবান।

বিষয় :—ব্যাকরণ।

বিশেষ বিষয় :—দ্বন্দ্বসমাস।

উদ্দেশ্য :—

—ছাত্রদের সংগে আরোহ পদ্ধতিতে আলোচনার দ্বারা দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞা ও সূত্রাবলির নিষ্কাশন।

—বিশুদ্ধভাবে সমস্তপদের ব্যবহার বুঝতে এবং নিজের রচনায় প্রয়োগ করতে শেখানো।

—বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত করে' শব্দসম্পদ ও ভাষাপ্রয়োগে নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য বাড়ানো।

—ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত করা।

উপকরণ :—শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও বাক্যতালিকার চার্ট।

পূর্বজ্ঞান :—ছাত্রেরা ষষ্ঠশ্রেণিতে সন্ধি, সপ্তমশ্রেণিতে কারক, বিভক্তি ও বর্তমান শ্রেণিতে সমাসের প্রথম পাঠ পড়েছে। পাঠ্যপুস্তকে সমস্ত পদ পড়ে অর্থবোধ করতে তারা অভ্যস্ত।

আয়োজন :—শিক্ষক ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান আকর্ষণ করে' পাঠের ভিত্তিস্থাপন ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করবেন :—

সমাস কাকে বলে? সমস্তপদ কি? ব্যাসবাক্য কি? এই পদগুলি কি করে ভাঙবে? দুধবার্লি, পিতাপুত্র, ভালোমন্দ, হরগৌরী।

পাঠঘোষণা :—

শিক্ষক ছাত্রদের বলবেন যে আজ এই ধরণের আরো কতগুলি পদ নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করব।

উপস্থাপন :—

শিক্ষক কতকগুলি সমস্তপদের চার্ট টাঙিয়ে সেই চার্টের ওপর ছাত্রদের দিয়ে ব্যাসবাক্য রচনা করাবেন। ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ করে' সাধারণ সূত্রগুলি বোর্ডে লেখা হবে আর বিশেষ সূত্রগুলি চার্টের গায়ে তৃতীয় স্তম্ভে সংক্ষেপে লেখা হবে এবং পরে বোর্ডে বিস্তারিত লেখা হবে।

	মূলচার্ট	চার্ট—ছাত্রদের কাজ	
(ক)	শিবদুর্গা	শিব ও দুর্গা	বিশেষ্য পদ + বিশেষ্য পদ।
	রাজারানি	রাজা ও রানি	সমস্ত পদ বিশেষ্য।
	বরকনে	বর ও কনে	পারিবারিক সম্বন্ধ।
	ভাইবোন	ভাই ও বোন	
	পিতাপুত্র	পিতা ও পুত্র	
(খ)	ভয়ডর	ভয় ও ডর	বিশেষ্যপদ + বিশেষ্যপদ।
	ডাক্তারবৈদ্য	ডাক্তার ও বৈদ্য	সমস্তপদ বিশেষ্য।
	মাথামুণ্ডু	মাথা ও মুণ্ডু	সমার্থক শব্দ।
	কাগজপত্র	কাগজ ও পত্র	
	রাজাবাদশা	রাজা ও বাদশা	

মুলচার্ট	ছাত্রদের কাজ	
(গ)		
বুকপিঠ	বুক ও পিঠ	বিশেষ্যপদ + বিশেষ্যপদ।
দুধভাত	দুধ ও ভাত	সমস্ত পদ বিশেষ্য।
পথঘাট	পথ ও ঘাট	এক জিনিষের দুই অংশ।
দুধবার্লি	দুধ ও বার্লি	
কাপড়চোপড়	কাপড় ও চোপড	
(ঘ)		
রবি শশী	রবি ও শশী	বিশেষ্যপদ + বিশেষ্যপদ।
চাঁদতারা	চাঁদ ও তারা	সমস্তপদ বিশেষ্য।
আকাশপাতাল	আকাশ ও পাতাল	একসংগে দৃষ্ট প্রাকৃতিক বিষয়।
ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাত	ঝড ও বৃষ্টি ও বজ্রপাত	
নদনদী	নদ ও নদী	
(ঙ)		
লম্বাচৌড়া	লম্বা ও চৌড়া	বিশেষণপদ + বিশেষণপদ।
বেঁটেমোটা	বেঁটে ও মোটা	সমস্তপদ বিশেষণ।
ছোটখাট	ছোট ও খাট।	একসংগে প্রযুক্ত বিশেষণ।
শাদাকালো	শাদা ও কালো	
লালনীলহলদে	লাল ও নীল ও হলদে	

পদ্ধতি	বিষয়
প্রথমে সাধারণ সূত্র	
এই সমাসে কোন পদের অর্থ প্রধান?	এই সমাসে উভয় পদের অর্থ প্রধান সংযোজক অব্যয় দিয়ে এর ব্যাস-বাক্য হয়, যথা ও, এবং, আর ইত্যাদি।
এর ব্যাসবাক্যের বিশেষত্ব কি?	

পদ্ধতি	বিষয়
'ও' ছাড়া আর কি অব্যয় ব্যবহার করতে পার ?	
শিক্ষক বলবেন—	এই সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে, কারণ দুই ব্যক্তি, বস্তু বা গুণ একসংগে থাকলে সেই অবস্থাকে দ্বন্দ্ব বলা যায়।
তুলনীয়— (অন্নদার আত্মপরিচয় এরা পড়েছে।)	"কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥"
শিক্ষক এবার প্রত্যেক গুচ্ছের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।	
কি কি পদে দ্বন্দ্ব সমাস হয় ?	বিশেষ্য পদের সংগে বিশেষ্য পদের এবং কখন বিশেষণ পদের সংগে বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস হয়।
প্রত্যেক চার্টে সমস্যমান পদের পদপরিচয় লেখা হবে।	
সমস্তপদ কি হয় ?	সমস্যমান পদ যা তাই হয়, অর্থাৎ বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়।
প্রত্যেক চার্টে লেখা হবে। শিক্ষক 'গ' চার্টের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে' বলবেন	অনেক সময়ে দ্বন্দ্ব সমাসে বিভক্তি লোপ হয় না। যদিও বিভক্তিলোপই সমাসের নিয়ম তবু বুকেপিঠে, পথেঘাটে, দুধেভাতে, ইত্যাদি পদগুলি এরকমও লেখা যায়—।

পদ্ধতি	বিষয়
	সমাসে বিভক্তিলোপ না হ'লে তাকে অলুক বলে। লুক মানে লোপ। অলুক মানে যেখানে বিভক্তি লুক হয় না বা লোপ পায় না। এইরূপ দ্বন্দ্বকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলা যায়।

অভিযোজন :—

ছাত্রেরা শ্রেণিতে আলোচিত দ্বন্দ্বসমাস দিয়ে বাক্য রচনা করবে অথবা ওই সমাস ব্যবহৃত হয়েছে এমন সাহিত্যিক উদ্ধৃতি বলবে।

গৃহকাজ :—

দ্বন্দ্বসমাসের অন্যান্য উদাহরণ সংগ্রহ করে ব্যাসবাক্য রচনা ও শ্রেণিবিভাগ করে' আনবে।

বোর্ডের কাজ :

(যা উপস্থাপনের সংগে হয়েছে)

সমাস—দ্বন্দ্ব

সংযোজক অব্যয়দ্বারা যুক্ত দুই বা তদধিক বিশেষ বা বিশেষণ পদের সমাসে উভয়পদের অর্থ প্রধান হ'লে দ্বন্দ্বসমাস হয়।

সমস্তপদ বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়।

সমস্যমান পদগুলির মধ্যে বিভিন্নপ্রকার সম্বন্ধ দেখা যায়।

বিভক্তিলোপ না হ'লে অলুক দ্বন্দ্ব হয়।

নবম শ্রেণি

(৯)

ছাত্রসংখ্যা—৪০।
গড় বয়স—১৪+।
সময়—৪০ মিনিট।

বিষয়—বাংলা গদ্য
বিশেষ বিষয়—মেজদা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(সাহিত্যবিষয়ক)
দুইদিনে সমাপ্য—১। সেদিনটা··· জানিয়া কি হইবে?
২। সে রাত্রিও···শেষ পর্যন্ত।

উদ্দেশ্য :—

—আলোচ্য পাঠ্যবস্তুর অর্থ ও রসবোধ।

—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অংশবিশেষ পড়িয়ে মূল পাঠে আগ্রহান্বিত করা।

—বাংলা গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সহিত পরিচয় দ্বারা ছাত্রদের সাহিত্যানুরাগী করে তোলা ও সাহিত্যের পরিণতির বোধ জাগানো।

উপকরণ :—

শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও পাঠ্যপুস্তক।

পূর্বজ্ঞান :—

ছাত্রেরা অনুরূপমানের গদ্য পড়ে অর্থবোধ ও রসগ্রহণ করতে পারে। তারা শরৎচন্দ্রের রচনার সংগে পরিচিত এবং অনেকে শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব পড়েছে।

প্রথম পাঠ :—সেদিনটা···জানিয়া কি হইবে ?

আয়োজন :—

ছাত্রদের মন আজকের পাঠ্যাভিমুখী করার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন:—

বাংলা সাহিত্যে কার কার উপন্যাস পড়েছ ?

শরৎচন্দ্রের কি কি উপন্যাস পড়েছ ?

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়েকটি প্রধান চরিত্রের নাম কর।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের নাম কর।

কোন চরিত্র তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে ? কেন ?

পাঠঘোষণা :—

শিক্ষক পৃষ্ঠানির্দেশ করে' ছাত্রদের বই খুলিয়ে রচনা ও লেখকের নাম পড়তে বলবেন ও বোর্ডে লিখবেন—

মেজদা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বলবেন—শ্রীকান্ত উপন্যাস থেকে এই অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

উপস্থাপন :—

আজকের পাঠ্যবস্তু ছোট ছোট অংশে ভাগ করে' ছাত্রেরা সরবপাঠ করবে। প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্লেষণ এবং সংগে সংগে বোর্ডের কাজ হবে।

পদ্ধতি	বিষয়
(ক) সে দিনটা···বিদ্যাভ্যাস করিতেছি।	
উপন্যাসের কোন প্রধান চরিত্রের নাম এখানে পেলে ?	শ্রীকান্তের উক্তিতে এই অংশ বলা হচ্ছে।
যে দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেদিন তার কেমনমনে হয় এবং কেন ?	যে সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে সেটি কোনো একটি বিশেষ ঘটনার জন্য তার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

পদ্ধতি	বিষয়
শিক্ষক বলবেন—	সেই বিশেষ ঘটনাটি এই অংশের বিষয়বস্তু।
সেদিন শ্রীকান্তরা কি করছিল?	নিত্য প্রথামতো সেদিন সন্ধ্যায় তারা বৈঠকখানায় পডতে বসেছিল।
আসপাশে কে কি করছিল?	বারান্দায় পিসেমশাই দ্বারিকবাবু ক্যাম্বিসের খাটে শুয়ে তন্দ্রা উপভোগ করছিলেন, রামকমল ভট্টাচার্য আফিং খেয়ে অন্ধকারে ধূমপান করছিলেন, দেউড়ির থেকে তুলসীদাসী সুর শোনা যাচ্ছিল।
ক্যাম্বিসের খাট কি?	কাঠের ফ্রেমে ক্যাম্বিসের কাপড লাগানো খাট, সেটাকে মুড়ে রাখা যায়। একে ইংরেজীতে ক্যাম্পকট বলে।
শিক্ষক বর্ণনা করে' বুঝিয়ে দেবেন—বোর্ডে এঁকে দেখাতে পারেন।	স্ট্রেচার বা ক্যাম্বিসের চেয়ারের সংগে তুলনা করা যায়।
দেউড়ি কি?	বাডিব ফটক। বড় বড বাড়িতে ওপরে ঘরওয়ালা যে প্রবেশদ্বার থাকে তাকে দেউড়ি বলে।
তুলসীদাসী সুর কি?	বাংলায় যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, হিন্দীতে তেমনি তুলসীদাসী রামায়ণ। দেউড়িতে বসে' পেয়াদারা সুর করে' তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে।

পদ্ধতি	বিষয়
	(খ) ছোড়দা, যতীনদা···কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।
কার তত্ত্বাবধানে শ্রীকান্তরা পড়াশুনা করছে ? তার স্বভাব কেমন ? বিদ্যা কতদূর ? এখন কি করছেন ?	এই গল্পাংশের নামচরিত্র মেজদার তদারকিতে শ্রীকান্তরা পড়াশুনা করছে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনবার এণ্ট্রান্স ফেল করে' এই চতুর্থবারের জন্য তৈরী হচ্ছেন। তাই তিনি নিজে পড়তে পড়তে শ্রীকান্তদের পড়াশুনোর তদারকি করতেন।
এণ্ট্রান্স পরীক্ষা কি ? শিক্ষক বলে' দেবেন।	এণ্ট্রান্স আগেকার দিনে এখনকার স্কুল ফাইনালের মতো পরীক্ষা ছিল, তখন ছেলেরা এণ্ট্রান্স পাশ করে এফ-এ পড়তো।
কোন সময়টুকুর কথা বলা হয়েছে ? তখন যাতে কিসের বিঘ্ন না ঘটে তার চেষ্টা মেজদা করতেন ? কি ভাবে করতেন ? তার সাজ-সরঞ্জাম কোথায় থাকতো ? এগুলির উদ্দেশ্য কি ছিল ?	সন্ধ্যার এই পড়ার সময়টুকুতে ছেলেরা যাতে কথাবার্তা বলে' মেজদার পড়ার বিঘ্ন না ঘটায় এইজন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়তে বসেই কাঁচি দিয়ে কেটে বিশ-ত্রিশখানি কাগজের টিকিটের মতো করতেন। সেগুলির মধ্যে লেখা থাকতো—"থুথু ফেলা", "নাক-ঝাড়া", "তেষ্টা পাওয়া"—ইত্যাদি। এইসব সাজসরঞ্জাম মেজদার হাতের কাছেই থাকতো। এর উদ্দেশ্য ছিল ছেলেরা

পদ্ধতি	বিষয়
	যাতে কথা না বলে' টিকিট নিয়ে বাইরে যেতে পারে।
এই তদারকিতে কারা পড়ছিল? তাদের কে, কে, কোন ছুতোয় বাইরে ঘুরে আসতো?	যতীনদা, ছোড়দা আর শ্রীকান্ত নিজে একেকটা অছিলায় পড়া ফাঁকি দিয়ে বাইরে ঘুরে আসতো।
মেজদা কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন? কেউ ফাঁকি দিয়েছে কিনা তার বিচার কখন হ'ত?	মেজদা ঘড়ি ধরে' সময় মিলিয়ে রাখতেন যাতে কেউ অযথা সময় নষ্ট না করে। সপ্তাহের শেষে এইসব টিকিটে লেখা সময় ধরে' কৈফিয়ৎ তলব করা হ'ত।

(গ) এইরূপে মেজদার···জানিয়া কি হইবে?

পদ্ধতি	বিষয়
এইভাবে তারা প্রতিদিন কতক্ষণ পড়ত? তারপর কোথায় যেত? কিসের অভাবের জন্য পড়াশুনোর সংগে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকতো না?	এইভাবে প্রতিদিন রাত নটা পর্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করে' তারা বাড়ির ভিতরে যেত। পডার সময়ে মনোযোগ দেয়নি বলে' ঘরের চৌকাঠ পার হবার সংগে সংগে অধীত বিদ্যার সংগে আর কোনো সম্পর্ক থাকতো না।
ফলে পরের দিন ক্লাসে কি হত? সে জিনিষটা কি?	ফলে পরের দিন ক্লাসে পড়া বলতে পারতোনা, আর তাদের কপালে "সম্মানসৌভাগ্য" জুটতো, অর্থাৎ তারা বকুনি ও শাস্তি পেত। বিদ্রূপ করে' কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে।

পদ্ধতি	বিষয়
মেজদার চরিত্র এবং ভাগ্য সম্বন্ধে লেখক কি বলেছেন ?	লেখক বলেছেন যে মেজদার এত গুণ থাকা সত্ত্বেও নির্বোধ পরীক্ষকেরা তাঁকে চিনতে না পেরে বার বার ফেল করিয়ে দিতেন।
মেজদার গুণ কি ?	পড়াশুনোয় প্রবল অনুরাগ ও দায়িত্ব-বোধ ছিল মেজদার গুণ।
লেখক কিরূপ ভাব নিয়ে গুণ-গুলির উল্লেখ করেছেন ?	এই কথাগুলি লেখক বিদ্রূপের ছলে বলেছেন।
তোমরা মেজদার ব্যবহার থেকে তাঁর চরিত্রে কি গুণ দেখতে পেলে ?	মেজদা ক্ষমতালোভী ছিলেন এবং সর্দারি করতে ভালবাসতেন বলে' ছেলেদের খবরদারি করে' অনেক সময় নষ্ট করতেন।

অভিযোজন ঃ—

এই পাঠ্যাংশে প্রধান চরিত্র কে ?

তাঁর কয়েকটি দোষগুণের বর্ণনা কর।

তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে লেখকের ও তোমাদের মতামত কি ?

এমনি একজন লোক যদি তোমাদের পড়াশুনোর তদারকি করতো তাহলে তোমাদের মনের ভাব কি হ'ত আর পড়াশুনোই বা কতটা হ'ত ?

গৃহকাজ ঃ—

ছাত্রেরা মেজদার চরিত্রের আলোচিত লক্ষণগুলি লিখে আনবে।

বোর্ডের কাজ ঃ—

উপস্থাপনের সংগে সংগে পাশাপাশি দুই বোর্ডে লেখা হবে।

প্রথম বোর্ড মেজদা

সারাংশ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

গল্পের নায়ক শ্রীকান্ত একদিন সন্ধ্যার স্মরণীয় ঘটনার কথা বলছে। শ্রীকান্ত, যতীনদা ও ছোড়দা তিনজনে মেজদার তদারকিতে পড়াশুনো করছিল। মেজদা তিনবার এন্ট্রান্স ফেল করে' চতুর্থবারের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন এবং অত্যন্ত কড়া নিয়মে ভাইদের তত্ত্বাবধান করছিলেন।

দ্বিতীয় বোর্ড

শব্দার্থ

ক্যাম্বিসের খাট—কাঠের ফ্রেমে ক্যাম্বিসের কাপড় আঁটা খাট।

দেউড়ি—বাড়ির বাইরের বড় ফটক।

তুলসীদাসী সুর—হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণের সুর।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা—আজকালকার স্কুল ফাইনালের মতো।

দ্বিতীয়পাঠ—"সেই রাত্রিও…" থেকে শেষ।

শীর্ষগুলি প্রথম পাঠের মতো, কেবল পূর্বজ্ঞানের সংগে অতিরিক্ত যোগ করা হবে—"গল্পের প্রথম অংশ আগের ক্লাসে পড়া হয়েছে"।

আয়োজন :—

পূর্বপাঠের পুনরালোচনা ও বর্তমান পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক কতকগুলি প্রশ্ন করবেন :—

মেজদার বিদ্যানুরাগ কতটা সত্য ছিল?

এতে তাঁর বিদ্যার্জন কতটা সফল হয়েছিল?

ভাইদের শিক্ষার জন্য তিনি কিরূপ যত্ন নিতেন?

তাতে তাদের বিদ্যালয়ে পড়ার কতটা উন্নতি হ'ত?

পাঠঘোষণা :—

মেজদার বিদ্যাবুদ্ধির কথা তো পড়েছি, এবার তাঁর সাহসের কথা পড়ব। ছাত্রেরা বই খুলবে আর শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন—

মেজদা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপস্থাপন :—

ছাত্রেরা একেক অংশ পড়বে, প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্লেষণ ও সংগে সংগে বোর্ডে কাজ হবে।

পদ্ধতি	বিষয়
(ক) সে রাত্রেও…খাইয়াছিলান।	
"সেই রাত্র" কোন রাত ? সেই রাত্রে কি হচ্ছিল ? তখনকার আকাশ বাতাস কেমন ছিল ?	যে রাত্রে স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে সেই রাত্রেও অন্যান্য রাত্রের মতো পড়াশুনা হচ্ছিল। সারাদিন বর্ষণের পরও বর্ষণের রেশ রয়েছিল আর শ্রাবণের আকাশ কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন ছিল বলে' সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে না হ'তেই গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেছিল।
তোমরা এখন কিসের আলোয় পড়াশুনো কর ? ওরা কিসের আলোতে পড়ছিল ? তার উজ্জ্বলতা কেমন ? সেজ কি ?	আজকের মতো বৈদ্যুতিক আলো ছিলনা বলে' ঘরের মধ্যে চারটি প্রাণী সেজের মৃদু আলোতে পড়াশুনোয় গভীরভাবে ব্যস্ত ছিল।

পদ্ধতি	বিষয়
	সেজ = প্রদীপ রাখার দানি, অন্য নাম শামাদান। এক্ষেত্রে দানির ওপর রাখা প্রদীপ।
পড়ায় ওদের কতটা মন ছিল? তার চেয়ে কোন দিকে বেশি নজর ছিল?	আসলে কিন্তু পড়ার চেয়ে বাইরে যাওয়ার দিকেই ওদের নজর বেশি ছিল।
তারজন্য ওদের কি করতে হ'ত?	সেইজন্য মেজদার কাছে বিভিন্ন টিকিট দিয়ে আর্জি পেশ করতে হ'ত আর মেজদাও
মেজদা কি ভাবে ওদের এই কাজের হিসেব রাখতেন? কেন?	সেগুলো একটা খাতায় আটকে রাখতেন, যাতে সপ্তাহান্তে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন।
শ্রীকান্ত কিসের টিকিট দিয়েছিল? মেজদা মনোযোগ সহকারে খাতায় কি পরীক্ষা করছিলেন?	শ্রীকান্ত জল খাওয়ার টিকিট পেশ করলে মেজদা মনোযোগ সহকারে খাতায় দেখছিলেন সেই আর্জি ন্যায্য কিনা।

(খ) অকস্মাৎ আমার……এলো।

পদ্ধতি	বিষয়
মেজদা কি করছিলেন? শ্রীকান্ত কি করছিল? ঠিক সেই সময়ে কোথায় কি ঘটলো?	মেজদা যখন টিকিট মেলাতে ব্যস্ত, শ্রীকান্ত যখন বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ঠিক সেই সময়ে পিঠের কাছে "দুম" করে' একটা শব্দ শোনা গেল।
শব্দ শুনে ঘরের মধ্যে কে কি করলো?	শব্দ শুনে ছোড়দা ও যতীনদা চিৎকার করে' উঠলেন, মেজদা ভয় পেয়ে বিদ্যুদ্বেগে দুই পা সামনের দিকে

পদ্ধতি	বিষয়
	ছড়িয়ে সেজ'উল্টে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।
এরা এরকম ব্যবহার করলেন কেন?	ভয়ের চোটে এঁরা এমন কাণ্ড করলেন যে বাতি নিভে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল এবং তারমধ্যে ঠেলাঠেলি, চিৎকার, চেঁচামেচি, সব মিলে একটা কাণ্ড হ'ল।
তাতে চারদিকে কি অবস্থা হ'ল?	
এই অবস্থাকে লেখক কিসের সংগে তুলনা করেছেন? দক্ষযজ্ঞ কি? এই তুলনার সার্থকতা কি?	লেখক এই হট্টগোলকে দক্ষযজ্ঞের সংগে তুলনা করেছেন। শিবের পত্নী সতী দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষ একবার শিবকে অপমান করবার জন্য এক বিরাট যজ্ঞ করে' শিবকে নিমন্ত্রণ করেননি। সতী তা সত্ত্বেও সেই সময়ে বাপের বাড়ি গেছিলেন, কিন্তু যজ্ঞসভায় দক্ষ শিবনিন্দা করায় সতী তা সহ্য না করতে পেরে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সতীর মৃত্যুর সংবাদে শিব রাগে, দুঃখে উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডব নৃত্যে দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেছিলেন। সেই থেকে কোনো অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়াতে দক্ষযজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। শ্রীকান্তদের পড়ার ঘরে ও তার চারদিকে সেই অবস্থা হয়েছিল।

পিসেমশাই এতক্ষণ কি করছিলেন ? (একথা আগের দিন পড়া হয়েছে) এবার কি করলেন ? এই ব্যবহার কতটা শোভন হয়েছিল ? কখন তিনি বীরত্ব দেখাতে আরম্ভ করলেন ? তাঁর এই বীরত্বের পেছনে কি ছিল ?

পিসেমশাই এতক্ষণ একটা ক্যাম্বিসের খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ জেগে উঠে তার মতো বয়স্ক, অভিজ্ঞ ব্যক্তিও নিজের দুই ছেলেকে বগলের তলায় চেপে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করলেন, যেন কে বেশি চেঁচাতে পারে তার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল। দেউড়ির যে দারোয়ানেরা তুলসীদাসী সুরে গান করেছিল তারা হঠাৎ একটা চোরকে ধরে ফেল্ল। এবার পিসে-মশাই ভয়ানক বীরত্ব দেখিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম দিতে লাগলেন "আউর মারো, শালাকো মার ডালো"।

দারোয়ানেরা আগে কি করছিল ? এখন কি করলো ? কার সাহস বেশি, দারোয়ান-দের, না পিসেমশাইয়ের ? কিসে বুঝলে ?

দারোয়ানেরা যেটুকু সাহস দেখিয়ে চোর ধরেছিল পিসেমশাইয়ের সেটুকুও ছিল না, চোর ধরে ফেলেছে দেখে বীরত্বের ভড়ং করলেন।

চোর বলে কাকে ধরা হয়েছিল ? তিনি চোরের মতো পালাচ্ছিলেন কেন ? এতক্ষণ তিনি কি করছিলেন ? (আগের পাঠে পড়েছে) এই অবস্থায় তাঁর কথা কতটা বিশ্বাস্য ?

চোর বলে' যাঁকে ধরা হয়েছিল তিনি বাড়ির পুরোহিত বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য। তিনি সেই সময়ে আফিং খেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে তামাক খাচ্ছিলেন, বল্লেন একটা ভালুক দেখে ভয় পেয়ে পালাচ্ছিলেন। অবশ্য আফিঙের ঝোঁকে তাঁর ভুল দেখার

পদ্ধতি	বিষয়
ছোড়দা আর যতীনদা কি দেখেছিলেন ?	খুব সম্ভাবনা ছিল। অপরপে ছোড়দা আর যতীনদা বল্লেন তাঁর একটা নেকড়ে বাঘ দেখেছেন।

(গ) ছোড়দা ও যতীনদা……

পদ্ধতি	বিষয়
মেজদা এতক্ষণ কি করছিলেন ? এবার তিনি কি দেখেছেন বল্লেন ? ইংরেজিতে বল্লেন কেন ?	মেজদা এতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থা ছিলেন, জ্ঞান ফেরার পর বলে উঠলেন—"দি রয়াল বেংগ টাইগার !" যদিও তিনি বারবা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ফেল করেছিলে তবুও লেখক, বোধহয় বিদ্রূপ করেই বলছেন যে ইংরেজি বলা কওয়া তাঁর যথেষ্ট দখল।
রয়াল বেংগল টাইগার কি ? কোথায় পাওয়া যায় ? রয়াল কেন ?	ডোরাকাটা বড় বাঘ ভারতের অনে জায়গায়ই পাওয়া যায় ও বাংলাদে যেগুলি পাওয়া যায় তাকে বেংগ টাইগার বলে, আবার এদে রাজসিক আকৃতি ও আকারের জ 'রয়াল' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে তুলনীয় :—বাঘের রাজা দক্ষিণ রায়
জন্তুটির সম্বন্ধে কটা মত পাওয়া গেল ? সেটা তখন কোথায় ? কে তাকে প্রথম দেখলো ? অন্যরা শুনে কি ধরণের বীরত্বের পরিচয় দিল ?	বিভিন্ন মতে বলা হ'ল একটা ভালুক নেকড়ে বা রয়াল বেংগল টাইগা এসেছে। তাকে প্রথমে খুঁজে পাওয় গেল না, হঠাৎ পালোয়ান কিশোর সিং"উহ্ বয়ঠা হয়" বলেই একলাে

পদ্ধতি	বিষয়
	ঘরে চলে গেল। চক্ষের পলকে অন্য সকলেও ঘরে আশ্রয় নিল।
পিসেমশাই কি করলেন? তাঁর এত হাঁকডাক যে সাহসের পরিচয় নয় তা কিসে বোঝা যায়? আগে তিনি কি করেছিলেন?	পিসেমশাই এইবার হুকুম দিতে লাগলেন, কিন্তু ঘর থেকে এক পা এগোবার মতো সাহস তাঁর ছিল না। আগেও তিনি নিজের ছেলেদুটিকে বগলে নিয়ে পালাচ্ছিলেন, দারোয়ানরা চোর ধরেছে জানাবার পর তেজ দেখিয়ে ছিলেন।
অন্যরা সব কি করলো? কেন?	তামাসা দেখতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

(ঘ) এমনি বিপদের…

পদ্ধতি	বিষয়
এই সময়ে কে প্রবেশ করলো? তাকে দেখে সবাই কেন "বাঘ" "বাঘ" বলে, চিৎকার করতে লাগলো? বাঘের কথা শুনে অন্যদের চেয়ে তার ব্যবহারের পার্থক্য কি দেখলে?	এই সময়ে পথ দিয়ে যেতে যেতে গণ্ডগোল শুনে ইন্দ্রনাথ বাড়িতে প্রবেশ করতেই সকলে দেখে তাকে সাবধান করার জন্য "বাঘ!" "বাঘ!" বলে চেঁচাতে লাগলো। কিন্তু ইন্দ্রনাথ ভয় পেলো না এবং অন্যদের মতো পালাবার বদলে ব্যাপারটা শুনে নিল এবং লণ্ঠন নিয়ে নির্ভয়ে উঠোনে নেমে বাঘ খুঁজতে লাগলো।
এতে কি বুঝলে?	এতে বোঝা গেল যে এতগুলো লোকের মাঝে ইন্দ্রনাথই সাহসী ব্যক্তি ছিল।

পদ্ধতি	বিষয়
অন্য সকলে তখন কি করতে লাগলো ?	দারোয়ানেরা ইন্দ্রকে সাহস দিতে লাগলো। দোতলার জানলায় মেয়েরা এই দুঃসাহসী ছেলেটির মংগলের জন্য জপ করতে লাগলো আর পিসিমা তো ভয়ে কেঁদেই ফেল্লেন।
ইন্দ্রনাথ কি আবিষ্কার করলো ? বাঘ কি বল্ল ?	ইন্দ্রনাথ বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে বলে উঠলো—"দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়।" ইন্দ্রের কথা শেষ হবার সংগে সংগে যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে পরিষ্কার মানুষের গলায় কেঁদে উঠে বল্ল—"না বাবুমশাই, আমি বাঘ ভালুক নই, আমি ছিনাথ বহুরূপী।"
ছিনাথ কি ?	ওর আসল নাম শ্রীনাথ, অশিক্ষিত উচ্চারণে ছিনাথ বলা হয়েছে।
এই উচ্চারণে শ্রীকান্ত কি হ'তে পারে ?	তুলনীয়—ছিকান্ত, ছিদাম।
বহুরূপী কি ?	গ্রামাঞ্চলে কিছু লোক নানারকম সেজে বাড়ি বাড়ি তামাসা দেখাতো. এই পেশা যারা নিত তাদের বহুরূপী বলা হয়। বহুরূপী ঠিক সং নয়, যদিও সাজগোজ করে' মজা দেখায়।
ছিনাথ কেন বাঘ সেজেছিল ?	সে বহুরূপী, তাই আজ বেচারা বাঘ সেজে তামাসা দেখাতে এসেছিল।

পদ্ধতি	বিষয়
	(ঙ) ইন্দ্র হো তো···কুলাইল না।
ভয় কাটবার পর কে কিরকমে বীরত্ব প্রকাশ করতে লাগলেন? একটু আগে ভট্টাচার্য মহাশয়ের কি অবস্থা হয়েছিল?	ভয় কেটে গেলে সকলে বীরত্ব দেখাতে শুরু করলেন। ভটচাযিা-মশাই খড়ম হাতে ছুটে এলেন, যদিও একটু আগে তিনি ভালুকের ভয়ে পালাতে গিয়ে চোর বলে ধরা পড়েছিলেন।
পিসেমশাই কি করছিলেন?	যে পিসেমশাই ছেলে বগলে পালা-চ্ছিলেন তিনি ছিনাথের কান পাকড়ে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন।
এখানে শ্রীনাথের কি পরিচয় পাচ্ছ?	শ্রীনাথের বাড়ি বারাসতে, সে প্রতি বছর এই সময়ে আসে, নানান সাজ দেখিয়ে, গান গেয়ে, পয়সা রোজগার করে। এর আগের দিনও সে এ বাড়িতে এসে নারদ সেজে গান গেয়ে গেছে।
নারদ কে?	নারদ একজন শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত পুরাণ প্রসিদ্ধ মুনী।
সে তো তামাসা দেখাতে চায়, কিন্তু এখন ভয় দেখালো কেন?	ছেলেরা যে ভয় পেয়ে এমন মহামারী কাণ্ড করবে এ কথা সে ভাবতে পারেনি।
	(চ) ছিনাথ কাকুতি···অনেক কাজে লাগবে।
শ্রীনাথ এখন কিরকম ব্যবহার করলো? কিন্তু পিসেমশায়ের রাগ আর পড়ে না কেন?	শ্রীনাথ কাকুতিমিনতি করতে লাগলো, কিন্তু পিসেমশায়ের রাগ আর পড়ে না।

পদ্ধতি	বিষয়
	মানুষ যখন নিজের দুর্বলতাকে অপরের কাছে প্রকাশ করে ফেলে তখন তা ঢাকবার জন্য বাইরে অকারণ বীরত্ব প্রকাশ করে।
তাঁর ভয় পাওয়াটা বিশেষভাবে অযৌক্তিক হয়েছিল কেন?	পিসেমশাই একজন অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তি, তাঁর পক্ষে যে এত ভয় পাওয়া অশোভন হয়েছিল তা তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন।
তাঁর এই ব্যাপারটা কে ধরতে পেরেছিলেন?	পিসিমা বাড়ির পুরুষদের নিতান্ত ভীরুতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই
কি ভাবে তা প্রকাশ করেছিলেন?	তিনি বিদ্রূপ করে' তাদের 'বীরপুরুষ' বলে' সম্বোধন করে' ভালো মানুষটির ওপর শাস্তি প্রয়োগ করে' বাহাদুরী দেখাতে নিষেধ করলেন।
কি হয়নি বলে, তিনি আশ্বাস দিলেন?	তার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ সত্যিকারের বাঘভাল্লুক আসেনি।
পিসিমার কথা কতটা মানা হ'ল?	পিসিমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেও বাড়ির লোকদের দ্বারা শ্রীনাথের দোষ একেবারে মাপ করানো গেল না।
ছিনাথের কি শাস্তি হ'ল?	তার সুদীর্ঘ রঙীন কাপড়ের লেজটি কেটে নেওয়ার হুকুম দেওয়া হ'ল।
পিসিমা আবার কি বিদ্রূপ করলেন?	পিসিমা বল্লেন লেজটি বাড়ির পুরুষ

পদ্ধতি	বিষয়
	মানুষদের ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারবে।
পিসেমশাই এই বিদ্রূপের কোন উত্তর দিলেন না কেন ?	বিদ্রূপের বিষয়টা তাঁর পক্ষে এত সত্য ছিল যে পিসেমশাই তার উত্তর দিতে পারলেও না দেওয়াই ভালো মনে করলেন।

(ছ) লেখক সম্বন্ধীয় আলোচনা

তোমরা শরৎচন্দ্রের লেখা আর কি পড়েছ ?	ছাত্ররা শরৎচন্দ্রের ছোটদের জীবনী, স্কুলে পড়া কয়েকটি গল্প ও বাইরে পড়া কয়েকটি উপন্যাসের নাম করবে।
তাঁর রচনায় কাদের কাদের প্রতি বেশি সহানুভূতি দেখানো হয়েছে ?	শরৎচন্দ্রের রচনায় সর্বদা মেয়েদের এবং সমাজে যারা নিচু স্থান পেয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায়।
আর কাদের তিনি বড় করেছেন ?	তথাকথিত দুষ্টু এবং দুর্দান্ত ছেলেদের চরিত্র তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন।
এখানে উল্লেখযোগ্য মেয়ে, গরিব-লোক আর দুরন্ত ছেলে কে ?	এই গল্পে পিসিমা, ছিনাথ আর ইন্দ্রনাথকে দিয়ে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি ফুটেছে।
তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলী কি রকম ?	শরৎচন্দ্রের ভাষা সরল, ভাব উজ্জ্বল এবং প্রকাশভংগিতে হাস্যবিদ্রূপের সংগে মাধুর্য ও সহানুভূতি মিশ্রিত।

অভিযোজন :—

মেজদা গল্পটি কোন উপন্যাস থেকে নেওয়া ?

মেজদার চরিত্রে কোনো গল্পের নায়ক হওয়ার পক্ষে কি কি গুণ আছে ?

এখানে যাদের যাদের পেলে তাদের মধ্যে কাকে নায়ক হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে হয় ?

সাধাবণত উপন্যাসে সে-সব নায়ক দেখা যায় তাদের সংগে ইন্দ্রনাথের চরিত্রের পার্থক্য কি ?

শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির পাত্র বলে' যে ধরণের লোকের বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে এখানে সেই সেই ধরণের লোক কে কে ?

এই গল্প থেকে শরৎচন্দ্রের রসিকতার একটা উদাহরণ দাও।

ছাত্রেরা বোর্ড থেকে সারাংশটি আগের দিনেব সারাংশের ঠিক পরে লিখে নেবে।

গৃহকাজ :—

শ্রীকান্ত উপন্যাস পড়বে এবং শরৎচন্দ্রের জীবনী ও রচনার বিষয়ে সংক্ষেপে লিখে আনবে।

বোর্ডের কাজ :—মেজদা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শব্দার্থ	সারাংশ
রয়াল বেংগল টাইগার—যে ডোরাকাটা হলদে বাঘ বাংলাদেশের বনে, বিশেষত সুন্দর বনে, পাওয়া যায়। ছিনাথ—শ্রীনাথ।	একদিন রাত্রে নিয়মিত পড়াশুনো চলছিল। এই সময়ে শ্রীকান্তের পিঠের কাছে 'হুম' করে একটা শব্দ হ'ল। মুহূর্তের মধ্যে মেজদা বাতি উল্টে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন আর

শব্দার্থ

বহুরূপী — যারা নানারকম জীব-জন্তু ও মানুষ সেজে তামাসা দেখায়।

সারাংশ

অন্ধকারের মধ্যে ভয়ের একটা লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড হতে লাগলো।

কেউ বল্ল ভাল্লুক, কেউ বল্ল নেকড়ে-বাঘ এসেছে।

মেজদা 'বাঘ' বল্লেন। এইসময়ে ইন্দ্রনাথ এসে দেখিয়ে দিল যে শ্রীনাথ বহুরূপী বাঘ সেজে তামাসা দেখাতে এসেছে।

(১০)

বিষয়—বাংলা।

বিশেষ বিষয়—কবিতা—

মা আমার—কামিনী রায়।

অদ্যকার পাঠ—সমগ্র কবিতাটি।

উদ্দেশ্য ঃ—পাঠ্য কবিতাটির অর্থ ও রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

—কবিতাটির ভাবাদর্শে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা।

—বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট কাব্য সৃষ্টির সহিত ছাত্রদের পরিচিত করা ও সাহিত্যপাঠে তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

উপকরণ :—পাঠ্য পুস্তক, শ্রেণিব সাধারণ উপকরণ, সম-উক্তি-সংকলন।

পূর্বজ্ঞান :—বাংলা কাব্য পাঠে অর্থ, ভাব ও রসগ্রহণের ক্ষমতা ছাত্রদের আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হতিহাস ও দেশপ্রেমমূলক বহু গল্প; প্রবন্ধ, কাব্য ও কাহিনী পড়েছে।

আয়োজন ঃ— কয়েকটি অভিমুখী প্রশ্ন করে, শিক্ষক পাঠদানের কাজ আরম্ভ করবেন।

—'মা' বলে' আমরা কাকে ডাকি ?

—নিজের মা ছাড়া আর কাকে মা বলে' ডাকি ?

—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই কথাটার ভাব সামান্য কথায় বল।

—দেশের জন্য মানুষ কতটা ত্যাগ করতে পারে ? দুই-একটা উদাহরণ দাও।

পাঠঘোষণা ঃ—দেশপ্রেমের উদ্বোধক একটি কবিতা আবৃত্তি করছি শোনো। আবৃত্তির পর শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠানির্দেশ করে' কবিতা ও কবির নাম ছাত্রদের পডতে বলবেন ও বোর্ডে লিখে দেবেন এবং বলবেন—আজ আমরা এই কবিতাটি পডব।

উপস্থাপন :—

পদ্ধতি	বিষয়
ছাত্রদের নীরব পাঠের জন্য কিছু সময় দিয়ে শিক্ষক তার ফলশ্রুতির জন্য ও কবিতাটির সামগ্রিক বোধের সহায়তার জন্য কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন :—	
কবি কাকে কি বলে' ডেকেছেন ? তিনি মাকে কি দিয়েছেন ?	কবি জন্মভূমিকে 'মা' বলে' ডেকেছেন এবং তাঁর পায়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

পদ্ধতি	বিষয়
তিনি কতদিন এইভাবে থাকবেন ?	যতদিন মায়ের কলংকভার দূর না হয় ততদিন তিনি এইভাবেই জীবন কাটাবেন।
এরপর একেকটি ছাত্র একেকটি স্তবক সরবে পড়বে এবং সেটি প্রশ্নোত্তরের সহায়তায় বিশেষিত হবে। প্রয়োজন-মতো শব্দার্থ ও বিশিষ্ট প্রয়োগের আলোচনা হবে।	

প্রথম স্তবক ঃ—যেইদিন······মা আমার !

পদ্ধতি	বিষয়
কবি কোনদিন থেকে হাসি-অশ্রু বিসর্জন করেছেন ?	যেদিন থেকে কবি দেশমাতার চরণে নিজের জীবন ডালি দিয়েছেন, সেদিন থেকে তিনি হাসি অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন।
তাঁর হাসবার, কাঁদবার অবসর নেই কেন ?	তিনি দেশের কাজে এত গভীরভাবে ডুবেছেন যে হাসবার বা কাঁদবার সময় পর্যন্ত পাননা।
তিনি কি বাস্তবিকই হাসেন না বা কাঁদেন না ?	তিনি নিজের বিষয়ে ভাবেন না বলে' নিজের সুখদুঃখের কথায় হাসেন না বা কাঁদেন না।
'ডালি দিনু' এই কথায় কিসের ভাব ফুটেছে ?	কবি যে দেশমাতার পূজা করেন তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "ডালি দিনু"

পদ্ধতি	বিষয়
	এই কথায়, কারণ পূজার জন্য লোকে ডালি রচনা করে।
তুলনীয় প্রয়োগ শিক্ষক বলবেন—	"তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি।" (রবীন্দ্রনাথ)
কবি দেশমাতাকে দুঃখিনী কেন বলেছেন ? তাঁর কিসের দুঃখ ?	সে সময়ে ভারত বৃটিশের অধীন ছিল। এইজন্য ভারতমাতা দুঃখিনী, পরাধীনতার গ্লানিই মায়ের দুঃখের কারণ।
জনম আর দুখিনী পদ দুটি কিরূপ প্রয়োগ ? কেন করা হয় ?	'জনম' ও 'দুখিনী' এই দুটি পদ কবি-প্রয়োগ, ছন্দের মাত্রা রাখার ও শ্রুতিমধুরতার জন্য ব্যবহৃত হয়।
তুলনীয় ভাষাপ্রয়োগ :—	"জনম-দুখিনী সীতা"। "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।" (রবীন্দ্রনাথ।)
তুলনীয় ভাব :—	"বংগ আমার, জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ ! কেনগো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেনগো মা তোর রুক্ষ কেশ ? কেন গো মা তোর ধুলায় আসন,

পদ্ধতি	বিষয়
	কেন গো মা তোর মলিন বেশ ? সপ্ত-কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ !" (দ্বিজেন্দ্রলাল)
সংক্ষিপ্তসার :—	কবি দেশমাতার চরণে জীবন ডালি দিয়েছেন। তিনি তুচ্ছ ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ভুলে যাবেন।

দ্বিতীয় স্তবক :—অনল পুষিতে…মা আমার !"

কবি কেন নিজের হৃদয়ে আগুন পুষতে চাইছেন ? এ আগুন কিসের ? তিনি কি কেবল নিজেকেই দেশের কাজে নিযুক্ত করবেন ?	পরাধীনতার জ্বালা কবির হৃদয়ে আগুনের মতো জ্বলছে, কবি তাকে নিভতে দেবেন না, নিজেকে আর অপরকে অনুপ্রাণিত করে' দেশের নিয়োজিত করার জন্য আগুন পুষে রাখবেন।
তুলনীয় অংশ শিক্ষক উদ্ধৃত করবেন :—	"আগুন জ্বালো ! আগুন জ্বালো ! ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে দিয়ে আগুন জ্বালো !" (রবীন্দ্রনাথ) "রাবণের চিন্তাসম যদিও আমার জ্বলিছে, জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?" (কামিনী রায়)

পদ্ধতি	বিষয়
এখানে অনলকে পূজার কোন জিনিষের সংগে তুলনা করা যায় ?	কবির হৃদয়ের আগুন কেবল জ্বালা নয় যজ্ঞের হোমানলের সংগেও এর মিল আছে, এখানেও কবির দেশ-মাতার পূজার ভাব দেখা যাচ্ছে।
তুলনীয় :—	"তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিবে জাগিয়া উঠিবে একটি বিরাট হিয়া।" (রবীন্দ্রনাথ)
তিনি যে হাসি অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন সে-কথাটা এখানে কি ভাবে বলা হয়েছে ?	দেশের কাজে তিনি এত ব্যস্ত থাকবেন যে নিজের ছোটখাট সুখদুঃখের হিসাব রাখতে পারবেন না।
তুলনীয় উদ্ধৃতি :—	পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবনমন সকলি দাও, তার মতো সুখ কোথাও কি আছে ? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।" (কামিনী রায়)
দেশমাতৃকা কি ভাবে কবির কাছে কাজ চাইতে পারেন ?	দেশমাতার তো মুখ নেই যে সন্তান-দের ডেকে তাঁকে উদ্ধার করতে বলবেন, তাঁর কি 'চাই' সন্তানরাই বুঝে নেবে, সেটাই মায়ের "চাওয়া।"
কবি প্রয়োগ :--	"হিয়া"।

পদ্ধতি	বিষয়
তুলনীয় প্রয়োগ :—	'বাঙালীর হিয়া অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'
সংক্ষিপ্তসার :—	কবি নিজেকে ও অপরকে দেশের কাজে নিয়োজিত করবেন।

তৃতীয় স্তবক :—অতীতের কথা·· মা আমার !

অতীতের কথা বল্লে' বর্তমান যাবে কেন ?	অতীতের স্মৃতির দিকে বেশি মন দিলে কাজের দিকে মন কম থাকতে পারে বলে' সেরূপ হওয়ার ভয় থাকলে কবি অতীতের কথা বলবেন না।
তুলনীয় উক্তি :—	"রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা, সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।"
তবে কি তিনি অতীতগৌরবের কথা ভুলে যাবেন ?	অতীতের কথা মুখে না বল্লেও তিনি মনের মধ্যে জপ করবেন।
শিক্ষক হনূমানের ভক্তির কথা বলবেন—	বনবাস থেকে ফিরে রাম অযোধ্যার রাজা হবার পর সভাসদেরা হনূমান কেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য হবে এই কথা তুল্লে সে তার বুক চিরে দেখিয়েছিল যে মুখে সর্বক্ষণ 'রাম, রাম' না করলেও তার বুকের পাঁজ-রায় রামনাম লেখা আছে।
এখানে কোন অংশে পূজার ভাব প্রকাশ পেয়েছে ?	'হৃদয়ে জপিব তায়' এই কথায় দেশমাতৃকার পূজার ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

পদ্ধতি	বিষয়
কবি যদি গান করেন তো কি গান গাইবেন ?	কবি গাইবেন—"মরিব···মা আমার।"
শিক্ষক ছাত্রদের কয়েকটি দেশ-প্রেমমূলক গানের কথা বলতে বলবেন ?	
সংক্ষিপ্তসার :—	অতীতের কথা নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা না করে' তিনি বর্তমানকে গড়ে' তুলবেন, কিন্তু সে কথা হৃদয়ে জপ করতে থাকবেন।

চতুর্থ স্তবক :—মরিব···মা আমার।

পদ্ধতি	বিষয়
দেশেব জন্য মবাব উদাহবণ দাও।—	ছাত্রীরা উদাহরণ দেবে।
দেশেব জন্য বাঁচার উদাহবণ দাও।—	
জীবন কখন বিষাদময় মনে হয় ?	দেশের জন্য কাজ না করলে কবিব জীবন বিষাদময় বলে' বোধ হয়—মায়ের দুঃখে কবির জীবন দুঃখময় হয়েছে।
তুলনীয় উক্তি :—	কোন দেশেব দুঃখেতে মোরা সবার অধিক পাইরে দুখ ? (সত্যেন্দ্রনাথ) আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবনসাধনা, জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা (কামিনী রায়)

পদ্ধতি	বিষয়
কতদিন কবির মনে এই বিষাদ থাকবে ?	যতদিন না দেশের পরাধীনতার কলংক ঘুচবে ততদিন কবির মন বিষাদময় থাকবে।
সংক্ষিপ্তসার :—	জন্ম ১২ই অক্টোবর, ১৮৬৪।
বইয়ের শেষ অংশে কামিনী-রায়ের জীবনী ছাত্রেরা পড়বে।	মৃত্যু—২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। বরিশালের বাসণ্ডায় আদি নিবাস। পিতা চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাস, পাশ করে' বেথুন কলেজে শিক্ষিকা হ'ন। ১৮৯৪-আই-সি-এস কেদারনাথ রায়ের সংগে বিবাহ হয়। কাব্যগ্রন্থ আলো ও ছায়া, মাল্য ও নির্মাল্য, দীপ ও ধূপ, অশোকসংগীত, জীবনপথে। বর্তমান কবিতাটি আলো ও ছায়া থেকে নেওয়া।
শিক্ষক ছাত্রদের আলো ও ছায়া পড়তে বলবেন।	

অভিযোজন :—

কবি কামিনী রায়ের আর কোন কোন কবিতা পড়েছে ?	ছাত্রেরা বলবে।
তাঁর কবিতার ভাব কেমন ?	গভীরভাব পূর্ণ, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ
তাঁর কবিতার ভাষা কেমন ?	তাঁর ভাষা সহজ, সরল ও মিষ্টি।

পদ্ধতি	বিষয়
শিক্ষক ছাত্রদের হাতে সমউক্তি লিখিত ছোট ছোট কাগজের টুকরো দিয়ে মূলের সংগে মিলিয়ে দিতে বলবেন। একেক জন ছাত্র একেকটি উক্তি নিয়ে মেলাবে। অনুরূপ দেশভক্তিমূলক আরো কবিতা বল।	ছাত্রেরা উল্লেখ করবে।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনুরূপ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন আছে কিনা ছাত্রদের সে বিষয়ে মত প্রকাশ করতে বলা হবে।	ছাত্রেরা আলোচনা করবে।

বোর্ডের কাজ ঃ

(উপস্থাপনের সংগে ধাপে ধাপে যা করা হয়েছে।)

সংক্ষিপ্তসার—	কবি দেশমাতার চরণে জীবন ডালি দিয়েছেন। তিনি তুচ্ছ ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ভুলে যাবেন এবং নিজেকে ও অপরকে দেশের কাজে নিয়োজিত করবেন। অতীতের কথা নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা না করে' তিনি বর্তমানকে গড়ে তুলবেন, কিন্তু সে কথা হৃদয়ে জপ করতে থাকবেন।

পদ্ধতি	বিষয়
	যতদিন না দেশের পরাধীনতার কলংক ঘুচবে ততদিন কবির মন বিষাদময় থাকবে।

শব্দটীকা—	**কবিপ্রয়োগ।**	**ভক্তি ও পূজার ভাব।**
	দুখিনী,	ডালি দিনু,
	জনম,	অনল,
	হিয়া।	জপিব।

(১৯) **বিষয়**—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

বিশেষ বিষয়—(ক) বাংলা ভাষার উৎস ও উদ্ভব

(খ) বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন—চর্যাপদ।

(গ) মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বর্তমান পাঠ (ক)

উদ্দেশ্য :—

—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগে তার উৎস ও আদি নিদর্শনের সংগে ছাত্রদের পরিচিত করা।

—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাদের মনে গৌরব-বোধ জাগ্রত করা।

উপকরণ :—

শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ ভারতের ঐতিহাসিক মানচিত্র ও চার্ট।

পূর্বজ্ঞান :—

ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তকে মধ্যযুগের সাহিত্যের উদ্ধৃতাংশ পড়েছে, বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারের আলোচনায় স্বরপরিবর্তনের নিয়ম শিখেছে

এবং ভারতে আর্যদের আগমন ও বাংলাদেশের ইতিহাস ইতিহাসের ক্লাসে পড়েছে।

আয়োজন :—

পূর্বজ্ঞান জাগ্রত করে' পাঠে আগ্রহসৃষ্টির জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে :—

পড়ার বইয়ে পুরোনো বাংলা কবিতা কি কি পড়েছ? কয়েকটা উদাহরণ দাও।

কোনটি কার এবং কোন সময়ের রচনা?

আরো পুরোনো বাংলা কবিতা উদাহরণ দিতে পার?

সেকেলে বাংলার সংগে আধুনিক বাংলা ভাষার পার্থক্যের কয়েকটি লক্ষণ বলতে পার?

সংস্কৃত শব্দ কি করে' বাংলা হ'ল তার কয়েকটা উদাহরণ দিতে পার?

পাঠঘোষণা :—

বাংলাসাহিত্যের আরো পুরোনো সৃষ্টি আছে আবার তার থেকেও আরো পুরোনো ভাষা থেকে আমাদের ভাষার উদ্ভব হয়েছে, এইসব কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করব—এই কথা বলে' শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন—**বাংলাভাষার উৎস ও উদ্ভব**।

উপস্থাপন :—

পদ্ধতি	বিষয়
বাংলা ভাষা কোথা থেকে এসেছে? হিন্দি, গুজরাটি, মরাঠি প্রভৃতি ভাষা কোথা থেকে এসেছে?	বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষা থেকে এসেছে বলে' বলা হয়ে থাকে আর হিন্দি, গুজরাটি, মরাঠি প্রভৃতি কতকগুলি ভারতীয় ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধেও এর কথা বলা হয়।

পদ্ধতি	বিষয়
শিক্ষক বলবেন—	আমরা চলিত কথায় তাই বলি' বটে, কিন্তু আজকে আরেকটু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে বিশ্লেষণ করে' দেখব।
আর্যরা কবে ভারতে এসেছিলেন?	আর্যরা খৃঃ পূঃ ২০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত সময়ে ভারতে এসেছিলেন বলে' অনুমান করা হয়ে থাকে।
তাঁরা কি ভাষায় কথা বলতেন? কোন সাহিত্য সংগে এনেছিলেন? ছাত্রেরা ঐতিহাসিক জ্ঞান থেকে কিছু বলবে আর শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।	সেই আদি আর্যরা যে-ভাষায় কথা বলতেন আর বেদের যে অংশ তারা সংগে এনেছিলেন তা যে ভাষায় রচিত ছিল, সেই ভাষা সংস্কৃত ভাষার চেয়ে পুরনো তাই তাকে **আদি ভারতীয় আর্যভাষা** বলা হয়।

শিক্ষক চার্ট টাঙিয়ে দেবেন এবং চার্ট দেখে দেখে ছাত্রেরা তার প্রশ্নের উত্তর দেবে। তাঁদের ইতিহাসের জ্ঞানও ব্যবহৃত হবে।

আদি ভারতীয় আর্যভাষার কাল কবে থেকে নির্দেশ করতে পারি?	আর্যদের আগমনের সময়, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০০০-১৫০০, আদি ভারতীয় আর্যভাষার কাল নির্দেশ করা যায়।
আর্যরা কোথা দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিলেন?	আর্যরা ভারতের উত্তরপশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা সংগে করে' ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত এনেছিলেন এবং পরে ঐ ভাষায়

পদ্ধতি	বিষয়
আদি ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত কোন সাহিত্য এনেছিলেন ?	বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রচনা করেছিলেন।
পরে ঐ ভাষায় কি কি রচিত হয়েছিল ?	
প্রাকৃতের উদ্ভব কবে হয়েছিল ?	খৃঃ পূঃ ৮০০ থেকে ৫০০-র মধ্যে সম্ভবত **প্রাকৃত ভাষার** উদ্ভব হয়।
প্রাকৃত ভাষা কি তা শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।	সাধারণ আর্যরা সে ভাষায় স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতেন সেই ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলা হয়। এই ভাষাতেই সাহিত্য লেখা হ'তে লাগলো, যেমন বাংলাতে আগে কেবল সাধুভাষাতেই বই লেখা হ'ত এখন চলিত ভাষাতেও সাহিত্য লেখা হচ্ছে।
এবার ভারতের ঐতিহাসিক মানচিত্র টাঙান হবে। আর্যরা যেখান দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন সেখান থেকে কোথায় কোথায় গেলেন ? কোন কোন অঞ্চলে তাঁরা রাজ্যস্থাপন করলেন ? কয়েকটি রাজ্যের নাম বল। (মানচিত্রে স্থানগুলি দেখান হবে)।	আর্যরা উত্তরপশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে' উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, বিহার বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে গান্ধার, সিন্ধু-সৌবীর, কুরু-পাঞ্চাল, বিদর্ভ-কোশল, কাশী, বিদেহ, মগধ, অংগ, বংগ, কলিংগ প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করলেন।

পদ্ধতি	বিষয়
তাঁদের মুখে মুখে কতরকমের প্রাকৃত গড়ে' উঠলো ?	তাঁদের মুখে মুখে প্রথমে-উদীচী, প্রতীচী, মধ্যদেশীয়, দাক্ষিণাত্যা, প্রাচী—এই পাঁচটি অঞ্চলে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি গড়ে উঠলো ?
আর কোন রকমের প্রাকৃত হয়েছিল ? এই দুই ধর্ম কখন উদ্ভূত হয়েছিল ?	বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রর পালি আর জৈনদের জৈনপ্রাকৃত এই ধর্মের সঙ্গে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে গডে উঠেছিল।
সংস্কৃত ভাষার কথা শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।	লোকেব মুখে মুখে আদি ভারতীয় আর্যভাষা বদলে যাচ্ছে দেখে ব্যাকরণের পণ্ডিতরা তার সংস্কার করে' **সংস্কৃত ভাষা** নামে সর্বভারতীয় ভাষা বজায় রাখলেন। এতে সাহিত্য রচনা হ'তে লাগলো কিন্তু অত্যন্ত পণ্ডিতেরা ছাডা কেউ কথা বলত না।
এখন সংস্কৃতের অবস্থা কি ? প্রাকৃত কতটা ব্যবহৃত হয় ? তাই এর কি নাম ?	এখন সংস্কৃত আর প্রাকৃত কোনটাই লোকে বলে না, তাই এদের অনেকে **মৃত ভাষা** বলে'।
শিক্ষক বলবেন—	সংস্কৃত ভাষার যে বৈয়াকরণের নিয়ম সবচেয়ে বেশি মানা হয় পাণিনি —খৃঃ পূঃ ৮০০-র লোক।
প্রাকৃত,পালি ও সংস্কৃতকে ভারতীয় আর্যভাষার কোনস্তরে পাই?	মধ্যযুগের প্রথম যুগে প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত ভাষা পূর্ণতা পায়।

পদ্ধতি	বিষয়
অন্যদিকে জীবন্ত ভাষাগুলির ধারা কি ভাবে এগোলো ?	প্রাকৃত ভাষাগুলি আরো পরিবর্তিত হয়ে **অপভ্রংশ** এই রূপ নিল।
তার থেকে কি হ'ল ?	অপভ্রংশ থেকে হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মাড়োয়ারী, মরাঠী, বাংলা, আসামী ওরিয়া প্রভৃতি নব্যভারতীয় বা আধুনিক ভাষা হ'ল।
বাংলা ভাষা কোত্থেকে এসেছে ?	আদি ভারতীয় আর্যভাষার মাগধী প্রাকৃতের মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলাভাষার উদ্ভব হয়েছে।
বাংলাভাষার সংগে সংস্কৃত ভাষাব কি সম্পর্ক ?	সংস্কৃত ভাষাকে বাংলাভাষার ঠিক দিদিমা নয়, মায়ের জেঠিমা বলে' বলা যায়।
ভারতীয় আর্যভাষার কটা যুগ ? কি কি ?	ভারতীয় আর্যভাষার তিনযুগ—আদি, মধ্য ও আধুনিক বা নব্য।
শিক্ষক বলবেন—	মনে হয় অশোকের আগে বংগদেশে আর্যভাষা আসেনি।
অশোক পূর্বাঞ্চলের কোন কোন দেশ জয় করেন ?	অশোক অংগ, বংগ, কলিংগ জয করে' আর্যসভ্যতাকে পূর্বদেশে এনেছিলেন।
তাঁর সময়ের ভাষা কিসে পাওয়া যায় ?	তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন নিয়ে অনেক শিলালিপি করিয়েছিলেন তার মধ্যে ৮৪টা পাওয়া গেছে।
শিক্ষক বলবেন—	অশোক বিভিন্ন অঞ্চলের শিলালিপি বিভিন্ন ভাষায় লিখেছিলেন। পূর্বাঞ্চলের গুলি

পদ্ধতি	বিষয়
	থেকে এদিককার ভাষার সবচেয়ে সেকেলে রূপ দেখা যায়। তারপর এদিকে মাগধী অপভ্রংশের ব্যবহার চল্ল ও একটা পূর্বী রূপ থেকে বাংলা, আসামী ও ওরিয়া হ'ল'। বাংলার ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায় এদিকের হিন্দু রাজা ও জমিদারদের তাম্রপত্র ও শিলায় খোদাই দানপত্র থেকে।
তখন অন্য কিসে লেখা হ'ত? সেগুলো পাইনা কেন?	তখন হয়তো তালপাতা আর তুলট কাগজেও লেখা হ'ত কিন্তু এগুলি সহজেই পচে যায় বলে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।
	প্রথম বাংলা বই পাওয়া যায় এক হাজার খৃষ্টাব্দের।
তাহ'লে কবে থেকে কবে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল অনুমান করতে পার?	এর থেকে অনুমান করা যায় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দিথেকেআরম্ভ করে ১০০০ পর্যন্ত সালে বাংলা ভাষা গড়ে' ওঠে।

অভিযোজন ঃ—

শিক্ষক বহতা নদীর আকারে বোর্ডে একটি বহুশাখা ধারা এঁকে দেবেন ও প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের দিয়ে সেটা পূর্ণ করাবেন।

গৃহকাজ ঃ—

ছাত্রেরা বাড়িতে বসে নিজের নিজের খাতায় অনুরূপ নদীর ছবি তৈরি করবে।

চার্ট ঃ—

আদি ভারতীয় আর্যভাষা

আদিযুগ— (খৃঃ পূঃ ২০০০-১৫০০—আর্যদের ভারতে আগমন)

↓ ↓

মধ্যযুগ→ **প্রাকৃত** | **সংস্কৃত** (খৃঃ পূঃ ৪০০)

উদীচী,	প্রতীচী,	মধ্যদেশীয়,	দাক্ষিণাত্যা,	**প্রাচী,**	**পালি,**	**জৈনপ্রাকৃত**
উঃ প, অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল	উত্তরপ্রদেশ,	দক্ষিণ অঞ্চল	**পূর্বাঞ্চল**		
সিন্ধুসৌবীর	বিদর্ভ	কুরুপাঞ্চাল	মহারাষ্ট্র	কোশল, কাঞ্চী		
		সৌরশেনী		বিদেহ মগধ		
				মাগধী,		
↓	↓	↓	↓	↓		

প্রত্যেকটি প্রাকৃতের অপভ্রংশ···

আধুনিক যুগ

পাঞ্জাবী	গুজরাটি	পশ্চিমা	মারাঠী	পূর্বীহিন্দী
	মাড়োয়ারি	হিন্দী		**বাংলা মাগধী** খৃঃ ৪০০-১,০০০
				ওরিয়া আসামী।

দ্রষ্টব্য :—যে নামগুলি বড় টাইপে ছাপা হয়েছে সেগুলি ভিন্ন বর্ণে লেখা হবে।

বোর্ডের কাজ ঃ— **বাংলাভাষার উৎস ও উদ্ভব**

প্রাকৃত—যে ভাষায় প্রাকৃতজন বা প্রকৃতি (প্রজাগণ) কথা বলে।

সংস্কৃত—যে ভাষার সংস্কার করা হয়েছে। এটি এখন একমাত্র স্বাভাবিক সর্বভারতীয় ভাষা। অনেকের মতে মৃতভাষা।

বাংলা ভাষা—সংস্কৃতভাষার দৌহিত্রীস্থানীয়া কিন্তু দৌহিত্রী নয়।

বাংলাভাষার প্রথম উদাহরণ—দানপত্র, শিলা ও তাম্রলিপি।

প্রথম বাংলা বই—খৃষ্টীয় এক হাজার বছরে।

(১২) **দশম শ্রেণি**

ছাত্রসংখ্যা—৪০ **বিষয়**—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

গড় বয়স—১৫ + **বিশেষ বিষয়**—বংকিমচন্দ্রের উপন্যাস।

উদ্দেশ্য :—

— বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা এবং তাঁর রচনাপাঠে ছাত্রদের আগ্রহান্বিত করা।

— বাংলা উপন্যাসের মূলানুসন্ধানে আগ্রহান্বিত করা।

— বাংলা সাহিত্যের খণ্ড খণ্ড পরিচিতিকে একটি বিশিষ্ট ধারায় স্থাপিত করে সাহিত্যিক পরিণতির সম্পূর্ণতা ও অখণ্ডতার বোধ জাগ্রত করা।

— বাংলাসাহিত্যের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করা।

পূর্বজ্ঞান :—

—সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক পর্যন্ত পড়েছে। উনিশ শতকের কাব্য, নাটক ও গদ্য সাহিত্যের সংগে পরিচয় আছে এবং সেই

সূত্রে লেখকদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিষয়ে সাধারণ পরিচিতি হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণিতে বংকিমচন্দ্রের রচনাংশ পড়েছে, তাঁর উপন্যাসের অন্তত বালসংস্করণও কিছু কিছু পড়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছে।

উপকরণ :—

শ্রেণিকক্ষের সাধারণ. পাঠ্যপুস্তক, বংকিমচন্দ্রের প্রকাশিত লেখার ও জীবনীর চার্ট, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি।

আয়োজন :—

পূর্বজ্ঞানকে জাগ্রত করে ছাত্রদের বর্তমান পাঠে আগ্রহী করার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে—

উপন্যাস কাকে বলে?

তোমরা কি কি ভালো উপন্যাস পড়েছ?

কার কার উপন্যাস পড়েছ? কি কি?

কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম কর।

পাঠঘোষণা :—

আজকে ক্লাসে, বংকিমচন্দ্রের বিষয়ে আলোচনা করব বলে' শিক্ষক বোর্ডে শীর্ষ লিখবেন।

উপস্থাপন :—

পদ্ধতি	বিষয়
বংকিমচন্দ্রের কটা উপন্যাস পড়েছ? কি কি?	ছাত্রেরা কয়েকটি নাম বলবে
এবার বংকিমচন্দ্রের রচনাবলির তালিকা টাঙিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন, ছাত্রেরা দেখে দেখে উত্তর দেবে।	

পদ্ধতি	বিষয়
বংকিমচন্দ্র কোন সাল থেকে কোন সাল সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন ?	বংকিমচন্দ্রের দীর্ঘ সাহিত্যজীবন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
এরমধ্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে কতদিন ধরা যায় ?	এরমধ্যে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন।
তারমধ্যে কখন বেশি বা কখন কম লিখেছেন ?	এই সময়টা তিনি সমানে, ধারাবাহিক ভাবে লিখে গেছেন, কখনও ছেদ দেখা যায় নি।
কতরকমের সাহিত্যসৃষ্টি তিনি করেছেন ?	উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাহিত্যালোচনা, সমাজবিজ্ঞান, কবিতা, রসবচনা, জীবনচরিত, ধর্মালোচনা, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন।
তাঁর উপন্যাস কত রকমেব ?	উপন্যাসের মধ্যেও তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুই বকমের লিখেছেন।
তিনি কোন ভাষায় লিখেছিলেন ?	সামান্য কয়েকটি লেখা তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন এবং যদিও অসাধারণ ভালো ইংবেজী লিখতে পারতেন তবু প্রায় সমস্ত লেখাই ইংরেজিতে লিখেছিলেন।
তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তির একটি চার্ট টাঙানো হবে।	
তখনকার দিনে কিরকম লোকে ইংরেজি লিখে গর্ব করতো ?	বংকিমের সময়ে দেশে ইংরেজী শিক্ষার বেশি প্রচলন ছিল না বলে’

পদ্ধতি	বিষয়
	অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি দুই-এক ছত্র লিখেই অহংকৃত হ'তেন।
বংকিমচন্দ্রের লেখাপড়া কি রকম ছিল?	বংকিম ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ছিলেন। তখন তিনি শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কারণ তখনকাব দিনে তার চেয়ে বেশি লেখাপড়া করা যেত না।
তিনি যদি ইংরেজিতে লিখতেন তো কি হ'ত? কিন্তু তিনি খ্যাতি পেলেন না কেন?	বংকিমচন্দ্র যদি ইরেজিতে লিখবেন তো ওই অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীনদের চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতি পেতেন কিন্তু তিনি সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে ত্যাগ করে বাংলায় লিখলেন?
বাংলায় লিখলে খ্যাতি হতনা কেন?	বাংলাকে তখন সকলে অবজ্ঞা করতো।
শিক্ষক বলবেন—	স্বাধীনতালাভের এতদিন পরও আমরা বাংলাকে যথেষ্ট সম্মান দিইনি
উনি কি বীরত্ব দেখালেন?	খ্যাতির লোভ ত্যাগ করে সকলের অবজ্ঞাত বিষয়ে লিখতে লাগলেন।
তুলনীয়—	জয়লোভে, যশলোভে, রাজ্যলোভে অয়ি! বীরের সদ্গতি হ'তে ভ্রষ্ট নাহি হই।

পদ্ধতি	বিষয়
তিনি বাংলাকে কি দিলেন—	তিনি বাংলার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন, সব আশা আকাংক্ষা, শিক্ষালব্ধ ধনরত্ন সবই বাংলার জন্য দিলেন।
কিরকম উঁচুদরের চরিত্র ছিল তাঁর ?	তাঁর চরিত্র সৌন্দর্য, প্রেম ভক্তি, স্বদেশানুরাগে পূর্ণ ছিল, বুদ্ধি ছিল পরিণত ও শিক্ষিত।
বংকিমের সমসাময়িক অনেকে যা পারেননি, বংকিম তা পেরেছিলেন, তিনি তাঁর সর্বস্ব মাতৃভাষার পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের কোন কোন গুণের জন্য এটা সম্ভব হয়েছিল ?	ছাত্রেরা প্রশ্নের উত্তরে নিজ নিজ বুদ্ধিতে গুণের উল্লেখ করবে।
শিক্ষক বললেন—	সাহিত্যের সবদিকে বংকিমের আধিপত্যের উল্লেখ করে' তাঁর 'সাহিত্য-সম্রাট' খ্যাতির সমর্থন করা হবে।
এবার বংকিমচন্দ্রের জীবনীর চুম্বক টাঙিয়ে দেওয়া হবে। বংকিমচন্দ্রের বিদ্যা ও পদ-মর্যাদা কেমন ছিল ? ছাত্রেরা চার্ট দেখে তাঁর শিক্ষা ও চাকরির বিভিন্ন স্তর ও কালের উল্লেখ করবে।	তিনি ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনজন গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজন ছিলেন—তখন দেশে এরচেয়ে উচ্চ-শিক্ষিত কেউ ছিলনা। তিনি সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন—তখন এর চেয়ে উঁচু পদ ভারতীয়েরা পেতে পারতেন না।

পদ্ধতি	বিষয়
তিনি যে কাজ করেছিলেন তার জন্য তাঁকে কোথায় বাস করতে হ'ত ?	চাকরির জন্য বংকিমচন্দ্রকে সমস্ত বাংলাদেশ ভ্রমণ করতে হয়েছিল। ছাত্রেরা স্থানগুলির নাম পড়বে।
তিনি আর কোন কোন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন ?	ছাত্রেরা চার্ট দেখে বলবে। ছাত্রেরা নিজেদের পড়া উপন্যাস থেকে বলবে।
তিনি এই সব জায়গার বর্ণনা তাঁর উপন্যাসে কি ভাবে ব্যবহার করেছেন ?	
এবার ছাত্রদের সাহিত্যের ইতিহাসের পূর্ব পূর্ব পাঠের জ্ঞান অবলম্বনে সাহিত্যালোচনা হবে—	
বাংলাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস কে লিখেছিলেন ?	বংকিম বাংলা-সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক ছিলেননা, তাঁর আগে নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস হুতোমপেঁচার নক্সা—প্রভৃতি নক্সা এবং আলালের ঘরে দুলাল এই সামাজিক উপন্যাস ও বংগাধিপ পরাজয় এই ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছিল।
তবে তাঁর এত খ্যাতি কেন ?	তিনি প্রথম ঔপন্যাসিক না হ'লেও প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন।
উপন্যাসে বংকিমের মতো ওই সময়ে কাব্যসাহিত্যে কে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন ?	উপন্যাসে যেমন বংকিমচন্দ্র, কাব্যে তেমনি মধুসূদন দত্ত তখন সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন।

পদ্ধতি	বিষয়
তাহলে মধুসূদন নিজের কাব্যের বিষয়ে বলেছিলেন এখন কোন উক্তি বংকিমের বিষয়ে বলা যায় ?	মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্যের বিষয়ে যে-কথা বলেছিলেন, বংকিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়েও তা বলা যায়— "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।"

অভিযোজন :—

বংকিমের কোন উপন্যাস বা কোন উপন্যাসের অংশ কার ভালো লাগে ?

কিসের জন্য ভালো লাগে ?

বংকিমচন্দ্রের বিষয়ে যদি একটিমাত্র বাক্য বলতে বলি তো কি বলবে ?

বংকিমকে তাঁব যুগে সাহিত্যসম্রাট বলা হ'ত কেন ?

বংকিমচন্দ্রকে ঋষি বংকিম বলা হয় কেন ?

জাতীয়তাবাদের কোন মন্ত্র আর কোন চিত্র তিনি দিয়েছিলেন ?

তাঁর উপন্যাস থেকে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু উদাহরণ দাও ।

বাড়ির কাজ :—

ছাত্রেরা পরের দিনের জন্য বংকিমের প্রশস্তিমূলক একটি অনুচ্ছেদ লিখে আসবে ।

শিক্ষক চার্টগুলি ক্লাসে রেখে আসবেন—সেগুলি খাতায় টুকে নেবে ।

সাহিত্যের ইতিহাসের বই থেকে পূর্বাপর সংযোগ রেখে বংকিমচন্দ্রের বিষয় পড়বে ।

ছুটির দিনে এই উপন্যাসগুলি একে একে পড়বে—

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী।

আধুনিক সাহিত্য থেকে 'বংকিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি পড়বে।

বোর্ডের কাজ :—

সাহিত্যের ইতিহাস—বংকিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়।

বংকিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন অবিছিন্নভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

তাঁর প্রতিভা বহুদিকে বিকশিত ছিল—উপন্যাস ভিন্ন বিচিত্র বিষয়ের রচনা তিনি রেখে গেছেন। তাই তাঁকে সাহিত্যসম্রাট বলা হয়।

তিনি তাঁর কালে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ ও অত্যুচ্চ পদধারী ছিলেন।

চরিত্রগুণে ইংরেজির মোহ ছেড়ে তিনি মাতৃভাষার সেবা করেছিলেন।

বংকিমচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশের তারিখ

খৃষ্টাব্দ	উপন্যাস	অন্য রচনা
১৮৫৮	Rajmohan's wife. (ইংরেজি)	
১৮৬৪	দুর্গেশনন্দিনী।	
১৮৬৬	কপালকুণ্ডলা।	
১৮৬৯	মৃণালিনী।	
১৮৭০		বাংলার জনসাধারণের সাহিত্য। ইংরেজি প্রবন্ধ

খৃষ্টাব্দ	উপন্যাস	অন্য রচনা
১৮৭২		বংগদর্শন প্রকাশ। বাংলা প্রবন্ধ আর ইংরেজি প্রবন্ধ।
১৮৭৩	বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা।	
১৮৭৪	যুগলাঙ্গুরীয়।	
১৮৭৫	চন্দ্রশেখর, রাধারাণী।	বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর।
১৮৭৭	রজনী।	দীনবন্ধুর জীবনী।
১৮৭৮	কৃষ্ণকান্তের উইল।	কবিতা পুস্তক···ললিতামানস।
১৮৭৯		বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য।
১৮৮২	রাজসিংহ, আনন্দমঠ।	
১৮৮৩	দেবী চৌধুরাণী।	মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত।
১৮৮৫		কবি ঈশ্বরগুপ্তের জীবনী
১৮৮৬		শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র।
১৮৮৭	সীতারাম।	
১৮৮৮		ধর্মতত্ত্ব।
১৮৯২		বিবিধ প্রবন্ধ।
১৮৯৪		অবিস্মরণীয় ইংরেজি বক্তৃতা।

"তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজীতে দুই এক ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন।

"বংকিমচন্দ্র যে সেই অভিমান, সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে?···

"...তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বংগভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যতকিছু আশা-আকাংক্ষা, সৌন্দর্য, প্রেম, মহত্ব, স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন, সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বংগভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন।"

—**আধুনিক সাহিত্য** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বংকিমচন্দ্রের জীবনের ঘটনাপঞ্জী

জন্ম ১৮৩৮ নৈহাটির—কাঁঠাল পাড়া।

পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাতা—দুর্গাসুন্দরী দেবী।

শিক্ষা দেশে হাতে খড়ি, গ্রামের পাঠশালায় ও মেদিনীপুরের জিলা—স্কুলে পড়া।

১১ বছর বয়সে মোহিনীদেবীর সংগে বিবাহ।

হুগলি কলেজে অধ্যয়ন—জুনিয়ার স্কলার শিপে প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনবিভাগে অধ্যয়ন—সিনিয়র স্কলারশিপে প্রথম। ১৫ বছর থেকে ললিতা (কবিতার বই) আর পুরাকালীন গল্প লেখা, সংবাদ প্রভাকরে কবিতা ও গদ্য রচনার প্রকাশ। সংস্কৃত চর্চা।

১৮৫৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

বংকিমচন্দ্রের এণ্টান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ।

১৮৫৭ বি-এ পরীক্ষায় প্রথম।

কর্মজীবন	১৮৫৮	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ নিয়ে যশোহরে কাজ আরম্ভ।
		স্ত্রীবিয়োগ।
	১৮৬০	মহকুমার ভারপ্রাপ্ত থাকার সময়ে কাঁথির সমুদ্র-তীরে বালিয়াড়িতে কাপালিকের দর্শন।
		দ্বিতীয় বিবাহ।
	১৮৬৪	খুলনা, বারুইপুর।
	১৮৬৯	আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ।
		ছুটি নিয়ে কাশী, প্রয়াগ দিল্লী ভ্রমণ।
	১৮৭০	বহরমপুর।
	১৮৭৪	বারাসত ও মালদহ।
	১৮৮৫	ঝিনাইদহ।
	১৮৯৪	মৃত্যু।

ভ্রমসংশোধন

আদিকাল থেকে মানুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা ও ভ্রমের (Trial and error) পথে পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তার শিল্পকর্মময় সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি করে চলেছে। প্রত্যেক গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই সে বারে বারে ভুল করতে করতে সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। মানবশিশুর কাজকর্মের মধ্যেও আজও সেই পদ্ধতি সহজেই চোখে পড়ে, বার বার চেষ্টা করে' সে তার অভীপ্সিত কাজের উপায়গুলি খুঁজে নিয়ে আয়ত্ত করে।

ব্যাবহারিক জ্ঞানলাভের এই পথ স্বাভাবিক হ'লেও এই পথে শিশুকে আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ার পুনরাবিষ্কারের জন্য সম্পূর্ণ নিঃসহায়ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়না। প্রচেষ্টা ও ভ্রমের পথে অগ্রসর হওয়া সময়-সাপেক্ষ, উপরন্তু অনেক সময়েই এইভাবে ঈপ্সিত কাজ আকস্মিকভাবে হয়ে যাওয়ায় তার পদ্ধতিও ভালভাবে আয়ত্ত হয়না। এইজন্য প্রয়োজন শিক্ষকের নির্দেশের ও তদ্দ্বারা ভ্রমসংশোধনের।

মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার ক্ষমতা যাতে গড়ে' উঠতে পারে সেইজন্য শিশুকে জ্ঞানের কথাগুলি সোজাসুজি না শুনিয়ে দিয়ে খানিকটা স্বচেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করতে দিতে হয়। চুপ করে শোনাটা তার স্বভাববিরুদ্ধ, অফুরন্ত প্রাণশক্তির উত্তেজনায়, সে সমস্তক্ষণ একটা কিছু করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে বলে' চুপ করে শুনে শিখতে দিলে সে হয়ত শিক্ষার একবর্ণও আয়ত্ত করতে পারবে না, কিন্তু কাজের মধ্যে দিয়ে তথ্যটিকে লাভ করতে হ'লে উৎসাহের সংগে অগ্রসর হয়ে চলবে। এখানেই শিক্ষকের নৈপুণ্যের পরীক্ষা। পুরাতন জিনিষ পুনরাবিষ্কারের পথে তিনি ছাত্রকে অগ্রসর করবেন, কিন্তু অ্যাবশ্যক ভ্রান্ত প্রচেষ্টায়

যাতে অত্যধিক সময় নষ্ট না হয় তাই সূক্ষ্ম পথনির্দেশের দ্বারা তাদের কাজ সহজ করে' দেবেন। আবার, তিনি ভ্রম এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবেন বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রের কাজ নিরবদ্য হবে না এবং যে-সব ভ্রম সে করবে তার সংশোধনের ভার নেবেন তিনিই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখতে গিয়ে ছাত্রেরা সাধারণত যে-সব ভুল করে' থাকে সেগুলিকে প্রধান প্রধান কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন, প্রকাশভংগির ভুল, ভাষার ভুল, ছেদচিহ্নপ্রয়োগের ভুল, ব্যাকরণের ভুল এবং বানানের ভুল। প্রকাশভংগির ভুলের মধ্যে ধারাবাহিকতার খণ্ডন, অপ্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যহীন লেখা, অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ও ভাব এবং বিরতিচিহ্নের প্রয়োগের ভুল প্রধান। প্রবন্ধের পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদসমূহের সংযোগরক্ষাসম্পর্কে প্রথমোক্ত ভুলের সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে এবং রচনার পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদ রচনাশিক্ষার বিষয়েও বলা হয়েছে। দ্ব্যর্থবোধক ভাষার প্রয়োগ খুব সাধারণ ভ্রম ; এতে ভাবের প্রকাশ ব্যাহত হয় বলে শুধু বিদ্যালয়ের রচনা বা পরীক্ষার খাতায় নয়, পরবর্তী জীবনেও এই অভ্যাস মানুষের অনেক ক্ষতি করে। এইজন্য এর আমূল সংশোধন আবশ্যক। ভাব ও ভাবপ্রকাশ শব্দসম্ভারের অর্থবোধ অস্পষ্ট থাকলেই প্রধানত এই ভুল ঘটে। শিশুকাল থেকে শব্দের সংগে পরিচয় বস্তুর ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত হ'লে ও স্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত থাকলে এরূপ ভুলের সম্ভাবনা কমে যাবে, তবু মাঝে মাঝে এই ভুল ঘটলে শব্দের ধারণা বিশ্লেষণ করে' বক্তব্য বিষয়টি ক্লাসে আবার আলোচনা করিয়ে দিলে ভাবের সংগে ভাষাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ভাষার ভুলের মধ্যে চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ, গুরুচণ্ডালী দোষ, একই ব্যক্তিবিষয়ে "সে" ও "তিনি" এই উভয় পর্যায়ের সর্বনামের প্রয়োগ, কর্তা ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্যের অভাব, মিশ্র ও যৌগিক বাক্যগঠনে

ভুল, বচন ও লিংগের গোলমাল প্রভৃতি প্রধান। এরমধ্যে বচন ও লিংগের ভুল সাধারণত অনবধানতার জন্য হয়ে থাকে, তাই এর সংশোধন আলোচনার দ্বারা সহজে হয়। "সে" ও "তিনি"র গণ্ডগোল কখনো অনবধানজনিত ও কখনো আঞ্চলিক উচ্চারণজাত হয়। যথা, পূর্ববংগীয় উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দুর বিরলতার জন্য অনেকে "তিনি" লিখে "তাহার" শব্দের ব্যবহার করে। এগুলিও দেখিয়ে দিলে ছাত্রেরা সহজে অতিক্রম করতে পারে।

গুরুচণ্ডালী দোষ এবং চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ ভাষার অসম্পূর্ণ অধিকারের থেকে উদ্ভূত হয়। নোটবই মুখস্থ করে' মনে রাখতে না পারার ফলে, আবার কখন কখন বাংলা সংবাদপত্রের "খিচুড়ি" ভাষার প্রভাবেও এই দোষ ঘটে থাকে। পরের বুলি মুখস্থ না করে' নিজস্ব ভাষার পরিণতির পন্থা অবলম্বন করা গুরুচণ্ডালী দোষ এড়াবার প্রধান উপায়। রচনা ও লিখতে শেখার সম্পর্কে এই উপায়সমূহের বিশদ আলোচনা হয়েছে। চলতি ও সাধুভাষায় মিশ্রণ এড়ানো অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নয়, পরিণতবয়স্ক লেখকের মধ্যেও এই দোষ দেখা যায়। কথিত ভাষার সংগে বইয়ের ভাষার পার্থক্য এই ভুলের প্রধান কারণ। তাই নিচের শ্রেণিতে চলতিভাষায় লেখাতে আরম্ভ করে' এই ভাষাকেই ধীরে ধীরে মার্জিত করে' সাধু-ভাষায় উত্তীর্ণ করা এই ভুলের নিরসনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাহিত্যে চলতি-ভাষার বহুল ব্যবহারের ফলে বর্তমানে চলিত ও সাধু ভাষার রূপগত প্রভেদ কেবলমাত্র ক্রিয়া ও সর্বনামের পার্থক্যে পর্যবসিত হয়েছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও চলিতভাষার উত্তর গৃহীত হয়, তাই ছাত্রদের সাধুভাষায় লেখার জন্য পীড়ন করা অনাবশ্যক। নিম্নশ্রেণিতে চলিতভাষার ব্যবহারের পর অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণিতে (পঞ্চম শ্রেণির আগে নয়) উঠে শিক্ষক ছাত্রদের ইচ্ছামতো চলিত বা সাধুভাষা

অবলম্বন করতে দেবেন। দুটি বিষয়ের প্রতি তাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে'—প্রথম, ছাত্র যেন তার নির্বাচিত ভাষারূপটি অবিমিশ্রভাবে ব্যবহার করে এবং,—দ্বিতীয়, যারা চলিত ভাষায় লিখবে তারা যেন শব্দের আঞ্চলিক রূপের প্রয়োগ না করে। শিক্ষক ছাত্রদের বিশুদ্ধভাবে চলিত বা সাধুভাষা লেখার অভ্যাস রচনার ক্লাসে ও পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্নের উত্তর লেখানোর সময়ে করিয়ে দেবেন। বাংলা সাহিত্যে যখন দুইটি রীতি পাশাপাশি প্রবহমান তখন বিশুদ্ধ চলিত ও সাধুভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের জন্য আবদার সংগত নয়। অথচ এই বিষয়ের অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে পশ্চিমবংগ সরকারের প্রণীত ও প্রকাশিত "কিশলয়ে" অর্থের অপচয় হয়েছে। বহু বিরোধী সমালোচনার কয়েকটির উল্লেখ করা হ'ল—

প্রথমত—এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসাগর, বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির চিরায়ত সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি অর্বাচীন, অসাহিত্যিকদের রচনা মিশিয়ে দেওয়ার অপরিণত বয়স্ক ছাত্রদের মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা "ভাষান্তরিত" হয়েছে। ভাষান্তরকরণের অর্থে এদের ব্যবহৃত সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় পরিবর্তন কিন্তু এই পরিবর্তন অবিশুদ্ধ ও বিকৃত হয়েছে। যাঁদের এই স্থূলহস্তাবলেপ তাঁদের নাম পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। স্থায়ী সাহিত্যের ভাষার আধুনিকতা সম্পাদনের চেষ্টামাত্র অমার্জনীয় অপরাধ নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক রূপ দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য পড়ানোর রীতি ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে, কিন্তু কিশলয়কারদের অশিক্ষিতপটুত্ব ভয়াবহ।

তৃতীয়ত—এঁদের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবের গোড়াতেই গলদ। ভূমিকায় বলা হয়েছে—"শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা

গেছে একই পাঠ্যপুস্তকে চলিত ও সাধুভাষায় রচনা পাঠ করার ফলে অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থীর পক্ষে উভয় ভাষ্যরীতির মিশ্রণ না ঘটিয়ে যে-কোনো -একটিতে লেখা কঠিন হয়ে পড়ে। কথ্য ভাষারীতির সংগেই তাদের পরিচয় স্বাভাবিক বলে' 'কিশলয়-সংস্কার-কমিটির' সুপারিশক্রমে কিশলয়ে সংকলিতসবগুলি গদ্য রচনাই কথ্যভাষায় প্রকাশিত হ'ল।" "শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ" এবং "কিশলয়-সংস্কার-কমিটির" নাম দেওয়া হয়নি এবং কোন গবেষণার বলে' তাঁরা এই ব্যাপার প্রমাণ করেছেন তাও অপ্রকাশ্য। চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণই ছাত্রদের একমাত্র ভুল নয়। যতপ্রকার ভুলের কথা এই পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটিই তাদের খাতায় দেখা যায় এবং অন্যান্য ভুলের তুলনায় দুই রীতির মিশ্রণজনিত ভুল অপেক্ষা-কৃত কমই হইয়া থাকে। ভুলের কোনো শ্রেণিবিভাগ না করে', কোন পরিসংখ্যান না নিয়ে, ভুলের কারণ সম্বন্ধে গবেষণামূলক অনুসন্ধান না করে' এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কারও নেই। অপর পক্ষে বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগের তৃতীয় শ্রেণি থেকে আরম্ভ করে সংগে সাধু ও কথ্যরীতি মিলিয়ে পড়ানো হয় এবং তাতে কোনো অসুবিধা ঘটছে বলে' জানা যায়নি। তাছাড়া গদ্যপদ্য মিশ্রিত পাঠ্যপুস্তকে কেবল গদ্যাংশের পরিবর্তনে কি হবে? আশা করি পরবর্তী সংস্করণ-গুলিতে এঁরা কবিতারও ভাষান্তরকরণে উদ্যত হবেন না।

ছেদচিহ্নপ্রয়োগের ভ্রম প্রধানত দুই প্রকারের দেখা যায়। ছেদ-চিহ্নের অভাব এবং "ড্যাশ" চিহ্নের অতিরিক্ত প্রয়োগ। ছাত্রের অনুচ্ছেদ রচনার শিক্ষা যদি যথেষ্ট যত্নের সংগে হয়ে থাকে তবে ছেদ-চিহ্নের ভ্রমের সম্ভাবনা কম হবে। তাছাড়া ছেদচিহ্নপ্রয়োগের শিক্ষার একটা ক্রম আছে। নিম্নতম শ্রেণিতে দাঁড়ি আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োগ শেখাবার দরকার নেই। তারপর কমা। এগুলির অভ্যাস পাকা হয়ে গেলে পর প্রয়োজনমতো, ধীরে ধীরে অন্যান্য

প্রয়োগ শেখাতে হবে। ড্যাশকে ছেদচিহ্নরূপে গ্রহণ না করে' নির্দেশক চিহ্নরূপে গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ ক্ষেত্রে এর সামান্য প্রয়োগ থাকলেও এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাই বেশী।

ব্যাকরণের শিক্ষার দ্বারা ব্যাকরণগত ভুলের সংশোধন সম্ভব নয়। ব্যাবহারিক জ্ঞানই বিশুদ্ধ ভাষারচনার ভিত্তি। অভ্যাসের কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা (রচনার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এই ভিত্তি বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণি থেকে স্থাপিত করা যায়। তারপরও ব্যাকরণের ভুল হ'লে ব্যবহারের দ্বারা তার সংশোধন ক'রে দিতে হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা বিশুদ্ধ রূপটি গেঁথে দিতে হবে। লংঘিত সূত্রটি শ্রেণির পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হ'লে তবেই সংশোধন ও অভ্যাসের সময়ে তার প্রতি নির্দেশ করতে হবে। বানান ভুলের সম্পর্কেও যে এই নীতি অনুসরণীয় সে-কথা এর পরে বলা হয়েছে।

বানানের ভুলের মধ্যে সাধারণত প্রধান কয়েকটি প্রকার দেখা যায়।

প্রথম, ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবজাত, যেমন, উপরোক্ত, দূরাবস্থা, পৌরহিত্য, ভৌগলিক, হস্তীদন্ত, প্রতিযোগীতা, রবীন্দ্রনাথ, অংগাংগীভাব ইত্যাদি। দ্বিতীয়, উচ্চারণজনিত, যথা—প্রভিতি (প্রভৃতি), ভাতা (ভ্রাতা), সাহার্য্য (সাহায্য) ইত্যাদি। তৃতীয়, আঞ্চলিকতার প্রভাবজনিত, যথা—বাড়ি-বারি, নাউ-লাউ, ইত্যাদি (এগুলির বিষয়ে পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধির পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)। বিশুদ্ধ উচ্চারণের অভ্যাসদ্বারা এইসব বানান ভুলের সংশোধন হয়, কিন্তু আরো অনেক প্রকারের উচ্চারণজাত বানান ভুল ঘটে যার সংশোধনের উপায় এত সহজ নয়। এগুলি হ'ল বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যজনিত।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালার অনুযায়ী; কিন্তু সংস্কৃত বর্ণের

উচ্চারণ বাংলায় অনুসরণ করা হয়না। যেমন, বাংলায়, ণ-ন, শ-ষ-স, য-জ, উ-ঊ, ই-ঈ, ব-ম-য-ফলা, দ্বিত্ব প্রভৃতির উচ্চারণে পার্থক্য নেই বলে' বানান ভুল হয়। এখন সংস্কৃতের উচ্চারণে ফিরে গিয়ে এগুলির সংশোধন করার চেষ্টা বৃথা, কেননা বাংলা উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি দাঁড়িয়ে গেছে যার উদ্ভব হয়েছে ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের ধাপে ধাপে। যথা,—'শিশিসহ শিখিনী সুখিনী' এই অংশে উচ্চারণের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি তালব্য 'শ'; "এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ"—এখানে প্রথমটির উচ্চারণ তালব্য ও পরের দুটির দন্ত্য; "শ্রাবণ শর্বরীর প্রথমটি দন্ত্য ও পরেরটি তালব্য; উষ্ট্র, দংষ্ট্রা, স্পষ্ট,—সবই তালব্য। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে বাংলায় মূর্ধণ্য ষ উচ্চারিত হয়না এবং তালব্য ও দন্ত্য একা থাকলে তালব্য আর অন্যবর্ণের সংগে যুক্ত থাকলে বর্ণভেদে দন্ত্য ও তালব্যভাবে উচ্চারিত হয়। উ-কারের প্রয়োগে দেখা যায়, দুর্গ, দুর্গা, দুঃখ প্রভৃতির 'উ' এর উচ্চারণ দীর্ঘ: শুশ্রূষার উ-কারের উদাহরণ হ্রস্ব কিন্তু মুমূর্ষুর উ-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ। তারপর বাংলায় বফলা, যফলা ও বর্ণের দ্বিত্বের উচ্চারণ একরকম, যেমন নাট্য, ঠাট্টা, খট্বা—সবই "ট্ট" এর মতো উচ্চারিত হয়। আবার শ্মশান, স্বদেশ, দীপ, দ্বীপ একরকম উচ্চারিত হয়। তাছাড়া-লক্ষ্য-লক্ষ্য, লক্ষণ-লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিপর্যয় ঘটে এবং উ-ঊ, ই-ঈ-র বেলাও সেইরূপ, যেমন, —কুল-কূল, সূচী-শুচি, দিন-দীন, চির-চীর উচ্চারণ এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। যুক্তাক্ষর লিখতে না পারার জন্য বানান ভুল হয়,—যেমন অজ্ঞ-অঞ্জ, শক্র-শক্র ইত্যাদি। উচ্চারণের বর্ণবিপর্যয়ের জন্য বানান ভুলের উদাহরণ হ'ল—বাক্স-বাস্ক, রিক্সা-রিস্কা ইত্যাদি। এরূপ আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু উদ্ধৃত কয়টির মধ্যে থেকেই পাঠক লক্ষ্য করবেন যে বাংলায় সংস্কৃত শব্দের অসংস্কৃত উচ্চারণের মধ্যেও কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম আছে এগুলিকে শ্রেণিবিভক্ত করে' বাংলার

বিশিষ্ট উচ্চারণবিধি রচনা করা যায়, কিন্তু সংগে সংগে এও মনে রাখতে হবে যে ইংরেজির মতোই বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক নয় এবং এই অবৈজ্ঞানিক উচ্চারণ-বানানের মধ্যে থেকেই বিশুদ্ধির অভ্যাস করাতে হবে।

সাদৃশ্যজাত ভুল ঘটে প্রত্যয়ে বা বানানে সাদৃশ্য আছে এমন পৃথক পৃথক শব্দের মধ্যে গোলমাল হয়ে যাওয়ায়। যেমন কোন শব্দের শেষে 'স্থ' ও কোটির শেষে 'স্ত' থাকবে বুঝতে না পেরে মুখস্ত, দুর্দশাগ্রস্থ প্রভৃতি লেখা হয়, বা সমাসে অন্ ইন্‌ভাগান্ত শব্দের ঈ-কারকে 'ই' করা হয় না নয়তো বা স্ত্রীলিংগেরও 'ঈ' কার করে' দেওয়া হয়, যেমন যোগী-গণ, ছাত্রিগণ ইত্যাদি। ধূলি শব্দ বিকল্পে ধুলি হয় বলে' ভুলকেও ভূল লেখে। শব্দগঠনেও অনুরূপ ভুল হয় যথা প্রয়োজনীয় লেখা যায় বলে আবশ্যককে আবশ্যকীয় লেখা হয়। করণীয়ের সাদৃশ্যে আকর্ষক অর্থে আকর্ষণীয়ের প্রভূত প্রচলন দেখা যায়। তথাপি ইংরেজির মতো খাম-খেয়ালি ভাষায় যদি নির্বাচিত সমাজের বানানবিধির প্রচলন করা যায় তবে বাংলাতেও তা সম্ভব হওয়া উচিত। বস্তুত, বানান ভুল সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। আমাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিবেশ, যথা,— বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ, বই, প্রভৃতি বানান ভুলে পূর্ণ। বড়রা সর্বদাই বানান ভুল করেন, এমনকি শিক্ষকগণও।

আজ পর্যন্ত বানান ভুলের ব্যাপারে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হ'লনা, সাধারণ বানান ভুলের একটা তালিকা হ'লনা।

ভুলের তালিকা করার আগে ঠিকের নির্ণয় প্রয়োজনীয়, এইজন্য বানান বিধিবদ্ধ হওয়া চাই। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক গৃহীত বানানবিধি এখনও বিকল্প অবস্থায় বর্তমান, শিক্ষকসমাজে পর্যন্ত অনেকেই এর অস্তিত্বের কথা জানেন না। এ-ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর তাঁর গ্রন্থাবলিতে বানানের সংস্কার করে' গেছেন। তারপর

অনেক বছর কেটে গেছে, মুদ্রণরীতির পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা টাইপরাইটারের প্রবর্তন হচ্ছে। কাজেই বাংলা বানানের আবো সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্রনাথের মিলিয়ে এবং ছাপার প্রেস ও টাইপরাইটারের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে নোতুন বিধির প্রণয়ন পশ্চিমবংগ সরকারের কর্তব্য। কার্যিক ও শিক্ষাগত উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখে যে বিধি রচিত হবে তার মূলনীতি হওয়া উচিত—সৌকর্য, সরলতা ও সাদৃশ্য। নিচে এ-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হ'ল—প্রথম—বানান সংস্কারের সমিতিগঠনের সময়ে সদস্যরূপে বাংলাভাষার বিশেষজ্ঞদের বেছে নিতে হবে: কেবল ব্যাকরণ ও সাহিত্যে পণ্ডিত নয়, ভাষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদেরও নিতে হবে—যাঁরা সন্দেহস্থলে ভাষাপরিণতির পট-ভূমিতে বিচার করতে পারেন। তৎসম শব্দের ব্যুৎপত্তিবিচারের জন্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরও আবশ্যক হবে। সাংবাদিক ও মুদ্রণবিশেষজ্ঞ দুই-এক-জনের কমিটিতে থাকলেও ভালো। এই কমিটি তাঁদের খসড়া প্রস্তাব প্রথমে বাংলাদেশের সমস্ত বাংলা লেখক, সম্পাদক, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের কাছে পাঠাবেন এবং শেষে সমস্ত মতের বিচার করে' প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণ করবেন।

দ্বিতীয়—বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বাংলা বানানবিধিতে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী বানান গ্রহণ করা হয়েছে। এতে অনেক সময়ে বাংলাভাষার সাহিত্যিক পরিণতিকে অগ্রাহ্য করে কিছু কিছু তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দকে তৎসমের নিয়মের ছাঁদে ফেলা হয়েছে। সেই সময়কার একজন সমালোচক বিদ্রূপ করে' লিখেছিলেন যে অবস্থা দেখে তাঁর "চক্ষুর্দ্বয় হইতে চক্ষুর্জল" পড়েছিলো। এই নিয়মে মনচোর, সুকেশিনী, রজকিনী প্রভৃতি প্রয়োগসিদ্ধ পদকে অশুদ্ধ ঘোষণা করে' আর্ষ বা কবিপ্রয়োগের তাকে তুলে রাখতে হবে। আবার

এতদ্দ্বারা নীচ শব্দ তদ্ভবে পরিণত হ'লেও উচ্চারণ বদলায় না। তবে বাংলার নিচ, নিচু লিখবোনা কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে হওয়া চাই। তৎসম শব্দের বানানেও বিতর্কিত একটি উদাহরণ দিই,—যেমন ব্যাবহারিক। সরকারি শিক্ষণব্যবহারিকায় আ-কার বর্জন করা হয়েছে। তৎসম বানানে ব্যবহারিক ও ব্যাবহারিক দুইই হয়, কোনটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা ঠিক করতে হবে অর্থ দেখে। বংগীয় শব্দকোষে (পৃঃ ১৬৩৬ ও ১৬৪১) ব্যবহার সম্বন্ধীয়, বাণিজ্য বিষয়ক, ব্যবহারনির্ণয় বা লোকবিচারার্থ বিষয় অথবা অর্থী, বাদী, লোকাচারাভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যবহারযোগ্য বস্তু বোঝাতে ব্যবহারিক এবং লৌকিক বৃত্তান্তানুযায়ী, লোক প্রচলিত, আচারনিরূঢ় বিষয় বোঝাতে ব্যাবহারিক দেওয়া হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে বাংলায় 'প্রয়োগবিষয়ক' অর্থে দ্বিতীয় বানান গ্রহণযোগ্য মনে হয়, অর্থাৎ— "শিক্ষণব্যাবহারিকা"। চলন্তিকায় (পৃঃ ৫১৯) 'ব্যবহারসিদ্ধ' অর্থে বিকল্প দেওয়া হয়েছে। মনে হয় সাদৃশ্যের নীতি অনুসারে দৈনিক, প্রাত্যহিক, পারিবারিক প্রভৃতির সংগে মিল রেখে ব্যাবহারিক বানান বাঞ্ছনীয়, বিশেষত যখন 'ষ্ণিক' বা 'ঠক' এর পার্থক্যের আলোচনা বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ে আসবেনা। তৃতীয়—কেবল ছাত্রদের লেখা ও মনের রাখার নয় মুদ্রণযন্ত্রের সুবিধার জন্যও সংযুক্তবর্ণের 'ম' কে যেখানে যেখানে সম্ভব ং রূপে লেখা উচিত। যেমন, সংবৃত, বশংবদ, সংবিধান ইত্যাদি ছাড়াও ব্যাকরণসম্মতভাবে—সংবন্ধ, সংবল, সংবুদ্ধ এবং ব্যতিক্রম করে' অংগ, বংগ, কলিংগ লিখলে লিপির সরলতা সাধিত হবে।

চতুর্থ—বানানকে সরল করার জন্য বিকল্পের লোপ করা চাই। এর নির্ণায়ক নীতি হবে বাংলায় উ-ঊ, ই-ঈ, শ-স-ষ এর বর্ণানুক্রমিক উচ্চারণগত পার্থক্য নেই বলে' যতদূর সম্ভব ই, উ লেখা হবে এবং

ষ ও ণ বাঙালির উচ্চারণে আসেনা বলে' যতদূর সম্ভব তাদের বাদ দিতে হবে—যেমন গাড়ি, পাখি, ধুলো, তুলো, সুতো, জিনিস, আগুন, ধরন ইত্যাদি। তৎসম শব্দের যেখানে ব্যাকরণসম্মত বিকল্প আছে সেখানে তাকেই গ্রাহ্য করা উচিত যেমন—শ্রেণি, সূচি, কুটির। যুক্তবর্ণের সরলীকরণও সর্বত্র বাঞ্ছনীয়, যেমন ক্ষেত্র কিন্তু খেত।

পঞ্চম—বানানবিধির সম্পর্কে শুধু সিদ্ধান্ত দিলে চলবেনা, বানানের রাজ্যে অরাজকতা দূর করতে হ'লে বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ ও সরকারি শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ে নোতুন বানান বিধির অনুসরণ করতে হবে এবং বাইরের প্রকাশিত যে সব বইয়ে বানানের নোতুন পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-পর্ষৎ ও শিক্ষাবিভাগের নির্বাচিত পাঠ্য, পাঠাগারে রক্ষণীয় বা পুরস্কারের উপযোগী পুস্তকের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। এ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশক ও লেখকগণেরও সহযোগিতা করা উচিত। আইন দ্বারা সাইন বোর্ড ইত্যাদিতে এবং সাহিত্যে বানান ভুল বন্ধ করার কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নয়। আজকের ছাত্রদের বানান বিশুদ্ধি অভ্যাস হচ্ছে ভবিষ্যতে পারিবেশিক ভুলের পরিবর্তন সহজ হবে।

ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাবজনিত বানান ভুল অন্যান্য ব্যাকরণগত ভুলের মতো অভ্যাসের দ্বারা সংশোধিত করতে হয়। বিধিবদ্ধ ব্যাকরণ-পাঠ আরম্ভ হওয়ার পর যে-সব সূত্র যে যে শ্রেণিতে পড়ানো হয়েছে সেই সেই শ্রেণিতে সে-গুলির ব্যতিক্রমে যে ভুল হ'লে তার জন্য সূত্রের নির্দেশ করে সংশোধন করা বানানবিশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়; কিন্তু তৎপূর্বে নৈব নৈব চ।

উচ্চারণজনিত বানানভুলের মধ্যে কোন কোন ধরনের ভুল উচ্চারণ

শুদ্ধির দ্বারা সংশোধিত করা যায় তার আলোচনা আগে হয়েছে। অন্যগুলি করতে হবে অভ্যাসের সাহায্যে।

সাদৃশ্যজাত বানানভুলের সংশোধন করতে হবে বাস্তবিক আশ্লেষ-সৃষ্টির দ্বারা। অর্থাৎ এক ধরনের বানানের একসংগে ব্যবহার ও তুলনা করে'।

প্রকৃতপক্ষে বানানভুলের সংশোধনের চেয়ে সেগুলিকে এড়ানোই বানানবিশুদ্ধির প্রকৃষ্টতর পথ। ভুল এড়াবার প্রধান পথ বহু ব্যবহার ও বহু ব্যবহারের ভিত্তি ভুয়োলিখন, কিন্তু ভুয়োলিখনের অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি ভুল বানানের বিশুদ্ধ রূপ পাঁচ বা দশবার লেখাতে হবে, এর অর্থ এই যে সাধারণভাবে প্রচুর লেখানোর অভ্যাসদ্বারা বিশুদ্ধ বানানকে পেশিগত স্মৃতির মধ্যে মুদ্রিত করে' দেওয়া। এই স্মৃতিকে দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদেরও সাহায্য করতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি যাঁরা পড়ান তাঁরাও ছেলেদের খাতায় বানান-ভুল সংশোধন করবেন, কেবলমাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেননা। পেশীর স্মৃতি যে বানান মনে রাখার প্রধান উপায়, বড়দের দিকে লক্ষ্য করলে সেটা বোঝা যায়ঃ বানানের সংশয় হ'লে যখন পাশাপাশি দুই প্রকার লিখে যেটি দেখতে ভাল লাগলো সেটি ব্যবহার করেন, তখনই এই স্মৃতির সাহায্য নেন।

বানান ভুল এড়াবার জন্য বানান মুখস্থ করা ঠিক নয়, কেননা, আগ্রহহীন, যান্ত্রিক মুখস্থ স্থায়ী হয় না। শুদ্ধাশুদ্ধের তালিকা দিলেও লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়, কারণ তাতে শুদ্ধের সংগে অশুদ্ধ রূপটিও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। শ্রুতলিপির সাহায্যে বানান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এই অভ্যাসও বানান মুখস্থ করার দিকে চাপ দেয় বলে' অবাঞ্ছনীয়। লেখনের প্রক্রিয়া হিসেবে শ্রুতলিপির মূল্য আছে কিন্তু তা বানানশিক্ষার দিকে অধিক নয়।

বানান শেখার সবচেয়ে সহজ ও স্থায়ী উপায় হ'ল নানা খেলা ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এতে ছেলেরা বানান মুখস্থ করে কিন্তু আনন্দ ও উৎসাহের সংগে করে বলে' মুখস্থ শীঘ্র হয় এবং বেশিদিন মনে থাকে।

ছাত্রদের বানান ভুলের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পরিবেশ, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে বিশেষ বিশেষ ছাত্র বিশেষ বিশেষ প্রকারের বানান ভুল করে। সুশিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের ভুলের বিশেষত্ব লিখে রাখবেন এবং শব্দ নিয়ে খেলা বা ভ্রমসংশোধনের সময়ে যার যে ধরনের বানানের ভুল বেশি হয় তাকে সেইরূপ অভ্যাস করাবেন।

পূর্বগত অংশে ভুলের যে-সমস্ত কারণের আলোচনা হ'ল তাছাড়াও সবরকমের ভাষাগত ভুলের অন্তরালে ছাত্রের মানসিক অবস্থা, তার গৃহগত পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের আবহাওয়া কাজ করে। অসামঞ্জস্যময় মানসিক পরিণতির ফলে ভাষা ও ভাবের অসাম্য, চিন্তার দৌর্বল্য, অন্যমনস্কতা প্রভৃতি অবস্থা নানাবিধ ভ্রান্তি ঘটায়, ঘরে, সাংসারিক বা পারিবারিক অশান্তি এবং বিদ্যালয়ে কঠিন শাস্তির ভয় অথবা প্রতিষ্ঠার অভাব (এর উদাহরণ হাতের লেখার সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে) প্রভৃতি কারণেই অব্যবস্থিত, অশান্তচিত্ততার থেকে ভুলের উদ্ভব হয়। এর মধ্যে গৃহ-পরিবারগত কারণের ওপর শিক্ষকের প্রভাব কম কিন্তু তিনি মাসসিক পরিণতি ও বিদ্যালয়ের অবস্থাঘটিত সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য ভুল ঘটলে বিদ্যালয়ের চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে বাড়িতে খবর দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য, কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা করানো এখন পর্যন্ত এ-দেশের বিদ্যালয়ে সম্ভব হয়নি।

এ-ছাড়া সাধারণভাবে সব রকমের ভাষার ভুল এড়াবার জন্য

কতকগুলি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায়। তাতে ভ্রমের নিরসন না হ'লেও তার সংখ্যা কমে। রচনাবিষয়ের আলোচনার সময়ে যে-সব পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে প্রথম থেকে সেইভাবে শিক্ষা দিলে ভ্রমপ্রমাদ-বিরল বিশুদ্ধ ভাষা লেখার অভ্যাস হ'তে পারে। এইভাবে শিক্ষা দেওয়া কিছু আয়াসসাধ্য হলেও ভ্রমসংশোধনের সময়ে ভ্রমের স্বল্পতা দেখে শিক্ষক নিশ্চয় আনন্দিত হবেন।

প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থার দোষদর্শন করে' বলা যায় যে পরীক্ষার ভয়ে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ শেষ করার তাড়ায় শিক্ষকদের এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে তাঁরা তত যত্নের সংগে শিক্ষা দিতে বা আলোচনা করতে পারেন না। ছাত্রদের ছোটবেলা থেকে স্বাধীন চিন্তায় ও আলোচনায় অভ্যস্ত করিয়ে রাখলে তারা বিষয়বস্তু সহজে আত্মসাৎ করতে পারে এবং পাঠ্য বিষয়গুলি পুংখানুপুংখরূপ বিশ্লেষণ করলে বিষয়ে সম্যক অধিকার ছাত্রেরা লাভ করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্তমান মুখস্থভিত্তি পরীক্ষা ও লক্ষাধিক খাতার যান্ত্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থায় ছাত্রদের সুশিক্ষালব্ধ এই সব গুণগুলির যথাযথ স্বীকৃতি তো পায়ই না উপরন্তু অনেক সময়েই অসাফল্যে কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

যাইহোক, ভাষা শিক্ষায় ভুল এড়াবার জন্য যে-সব উপায়ের কথা বলা হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলিকে যথাক্রমে নিম্নলিখিত শ্রেণিভুক্ত করা যায়, যথা, সহানুভূতি, আনন্দ ও আগ্রহজনক পরিবেশ, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, সচেতমতা ও ব্যাকরণজ্ঞান।

ভুল এড়াবার উপায় যতই সাবধানতার সংগে অবলম্বন করা হয়ে থাকুকনা কেন, লিখবার সময়ে কিছু ভুল প্রায় ঘটেই। ভুলগুলি কেবল কালি দিয়ে কেটে না দিয়ে কি ধরনের ভুল হয়েছে তা পাশে লিখে দিতে হবে। এই বিষয়ে শিক্ষকেরা অনেক সংক্ষিপ্ত চিহ্ন ব্যবহার করে

থাকেন, এই চিহ্নগুলি কিসের জন্য তা যেন ছাত্ররা বুঝতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। খাতা ফেরৎ দেওয়ার সময়ে প্রত্যেক ছাত্রের খাতাগুলি পৃথকভাবে করে' দিলে ভাল, কিন্তু শ্রেণিতে ছাত্রসংখ্যার আধিক্যের জন্য তা যদি সম্ভব না হয় তবে সাধারণ ভুলগুলি শ্রেণিগত ভাবে বিশ্লেষণ করে' দিয়ে যাদের বিশেষ সংশোধনের প্রয়োজন তাদের আলাদা করে' ডেকে নিয়ে কথা বলা উচিত। শেষে ছাত্রদের দিয়ে ভুলগুলির সংশোধন করিয়ে নেওয়া চাই।

কোনো কোনো ছাত্র এত বেশি ভুল করে যে তাদের সব ভুল এক সংগে দেখিয়ে দিলে মনে থাকা সম্ভব নয়, উপরন্তু ভুলভীতি বা লাল-কালির ভয় জন্মে যেতে পারে। এদের ভুলগুলি শিক্ষককে একেক করে' সংশোধন করতে হয়। যার যেটি সবচেয়ে মারাত্মক ভুল সেটিকে দিয়ে আরম্ভ করে' সেটি সংশোধনের পথে এলে আরেকটি নিয়ে আস্তে আস্তে বিশুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে।

ছাত্রদের রচনার ভুল যতই কম হোকেনা-কেন খাতার সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি হ'লে শিক্ষকের পক্ষে সেগুলির যথাযথ সংশোধন কঠিন। তাই শুধু নিজের দিকে নয়, ছাত্রদের দিকে চেয়েও খাতার সংখ্যা কম করতে হবে। যে-সব বিদ্যালয়ে খুব ঘন ঘন লেখার কাজ করানো হয়ে থাকে তাদের পক্ষে একথা আরো সত্য। এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র ক্লাসের ছাত্রদের উৎকর্ষের তারতম্যানুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করে' নিয়ে একেক দিন একেক দলকে দিয়ে লেখালে সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। ছাত্রদের যদি দু'ভাগে ভাগ করে' নেওয়া যায় তবে যেদিন একদলের লিখবার পালা সেদিন অপর দলের ভ্রম সংশোধন করে' দেওয়া যায়। শ্রেণি তিনদলে বিভক্ত হ'লে ছেলেদের লেখা, ভ্রমসংশোধন ও কর্মপ্রকল্পের (Project) হিসেবে ভাগ করা যায়।

উচ্চতম শ্রেণিতে প্রত্যেকটি ছাত্রকে দিয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর না

লিখিয়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি করে' ছাত্রকে দিয়ে কয়েকটি করে' প্রশ্ন লিখিয়ে সমস্ত শ্রেণির দ্বারা আলোচনা করালে সকলেরই প্রত্যেকটি প্রশ্ন শেখা হয়ে যায়। এতে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার ভার ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে' দেওয়ার ফলে কম পরিশ্রমে কাজ অধিক অগ্রসর হয়। আজকাল অনেক শিক্ষাবিদ শ্রেণির রচনামূলক কাজগুলি ছাত্রদের দলে ভাগ করে' করার পক্ষপাতী। যথা "আমরি বাংলাভাষা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা লিখতে দেওয়া হ'ল। শ্রেণিতে চল্লিশটি ছাত্র থাকলে একেক দলে পাঁচজন করে' ছাত্র দিয়ে আটটি দল তৈরি হ'ল। একদিন শ্রেণিতে প্রবন্ধের কাঠামোটি নিয়ে আলোচনার পর প্রত্যেক দল তথ্যসংগ্রহ করবে এবং পরের অন্য একনির্দিষ্ট দিনে দলগুলি বসে' পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা রচনার অবয়ব গঠিত করবে। হাতেকলমে লেখার ভার একজনের ওপর দেওয়া থাকলেও সকলের কাজের ফলটি প্রকাশিত হবে প্রবন্ধটির মধ্যে। শিক্ষককে এই ব্যবস্থায় চল্লিশটির পরিবর্তে আটটি মোটে খাতা দেখতে হবে বলে'—সংশোধন অনেক পুংখানুপুংখভাবে করা যাবে। অবশ্য তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে দলের প্রত্যেকেই একেকটি কাজের জন্য সমানভাবে খাটছে; এরজন্য প্রত্যেক দলের কাজের তত্ত্বাবধান করার ও হিসাব নেওয়ার জন্য একেকটি সম্পাদক নির্বাচিত করে' তার হাতে কাজ আদায়ের ভার দেওয়া যায়। লেখার সময়ে শিক্ষক দেখবেন যে ক্রমানুযায়ী প্রত্যেক ছাত্র একেকবার লেখার দায়িত্ব নিচ্ছে, এতে পাঁচটি প্রবন্ধ লেখার মধ্যে প্রত্যেকেরই হাতের লেখা তিনি একবার দেখতে পাবেন। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রেরা নিজ নিজ ঐচ্ছিক বিষয়ানুসারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের রচনা লিখতে পারে।

এবার প্রকল্পমূলক কাজের একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। হয়তো

শ্রেণির লেখার কাজের বিষয় "গ্রাম্যজীবন" সম্বন্ধে প্রবন্ধরচনা : একই সময়ে বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণিতে বাগানে বা বালির পাত্রে গ্রাম তৈরির প্রকল্প দেওয়া যায় এবং মধ্যম ও উচ্চশ্রেণিতে গ্রামের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে ছবি, কবিতা, গল্প ও নানাপ্রকার তথ্যসংগ্রহ করতে বলা যায়। বলা বাহুল্য যে মধ্যে ও উচ্চশ্রেণির কাজের মধ্যে তারতম্য থাকবে। কাজের দিনে নিচের ক্লাসের ছাত্রেরা গ্রাম তৈরি করবে আর ওপরের ক্লাসের ছাত্রেরা সংগৃহীত চিত্রাদি নিয়ে চিত্রকল্প (চার্ট) তৈরি করবে এবং গ্রামের বিষয়ের সাহিত্যের উদ্ধৃতি নিয়ে স্বয়ংসঞ্চয়নের বইয়ে সংগ্রহ করবে। এই সব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ধারণা স্পষ্ট ও বিষয়বস্তুর জ্ঞান গভীর হওয়ার ফলে রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের কাজ শ্রেণিপাঠ্য বিষয়সমূহের অনুবন্ধের দ্বারাও করা যেতে পারে।

খাতাদেখার কাজ হাল্কা করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিরও উল্লেখ করা যায়। শিক্ষক মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করবেন যার উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন একটি গল্প পড়িয়ে তার চরিত্রগুলির নাম লিখতে বলা যায়। অথবা কোনো ঘটনা, স্থান বা চরিত্রের বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য করে' যে মন্তব্যটি সত্য তার পাশে চিহ্ন দিতে বলা যায়। রচনা-শিক্ষার সম্পর্কে বিশেষ্যবিশেষণাদি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিলিয়ে দেবার যে প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলিও এর অন্তর্গত। এইরূপ বস্তুভিত্তি বা নির্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী (Objective type) ধরনের প্রশ্ন অনেক রকমের হয় এবং এতে সংশোধনের সুবিধা ; অংক মেলাবার মতো সহজে শিক্ষক এর শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয় করবেন, এমন কি শিক্ষক যদি বোর্ডে ঠিক উত্তর লিখে দেন তবে ছাত্রেরা নিজেরা খাতা বদল করে' ভ্রমসংশোধন করতে পারবে। এতে ছাত্ররাও উৎসাহ পায় এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তির একটা বিশেষ দিক এরদ্বারা মার্জিত হয়ে

ওঠে। পরীক্ষাবিষয়ের আলোচনায় এই সম্পর্কে আরো বিশ্লেষণ করা হবে।

ক্লাসের আর বাড়ির কাজের আপেক্ষিক উপযোগিতা নিয়ে মতভেদ হয়। ক্লাসে বসে' কাজ করার বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের তাড়াহুড়োর মধ্যে রচনা কখনও সর্বাংগসুন্দর হ'তে পারেনা ; কিন্তু একঘণ্টায় প্রশ্নের আলোচনা করে' অপর কোনো সময়ে তার উত্তর লেখানো হ'লে এই দোষের অনেকটা ক্ষালন হয়। তাছাড়া বাড়িতে বসে' প্রচুর সময় নিয়ে লিখতে অভ্যস্ত থাকলে ছাত্রদের শুধু যে পরীক্ষার সময়েই বিপদে পড়তে হয় তা নয়, তাড়াতাড়ি কাজেরও অভ্যাস হয়না।

বাড়ির কাজের জন্য ছাত্রকে অনেকটা বিশ্বাস করতে হয়। বাড়িতে যে কাজটা হয়েছে সেটা তার স্বচেষ্টাকৃত কিনা সে বিষয়ের দায়িত্ব তারই ওপর ন্যস্ত করা থাকে। তাছাড়া, বাড়ির কাজের যদি কোনো সময় নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে তাহ'লে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ছাত্রদের মুখের কথা ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ থাকেনা। এইজন্য দায়িত্বজ্ঞান হবার বয়সের আগে বাড়ির কাজ না দেওয়া ভালো। নিচু ক্লাসে বাড়ির কাজ দেওয়ার অবাঞ্ছনীয়তার আর একটি কারণ এই যে, সারাদিন বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকার পর বাড়ির কাজ ছোট শিশুদের পক্ষে অতিরিক্ত হ'তে পারে।

বাড়ির আর ঘরের কাজের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা স্বকীয়তার প্রমাণ হ'তে পারে। দুই কাজের মান যদি মোটামুটি সমান হয় তাহ'লে বুঝতে হবে যে ঘরের কাজটি ছাত্রের নিজের আর খুব বেশি প্রভেদ থাকলে অনুমান করা যাবে যে কাজের জন্য ছাত্র কারো সাহায্য নিয়েছিল। অবশ্য বাতাবরণ ও পরিস্থিতিজাত পার্থক্যও অনেকাংশে মানের পার্থক্য আনতে পারে।

উপসংহারে বলা যায় যে বাড়ির ও ক্লাসের কাজ উভয়ের যখন উৎকর্ষাপকর্ষ দুইই রয়েছে তখন দুটি মিলিয়ে করানোই ভালো, কেবল নিচের ক্লাসে বাড়ির কাজ দেওয়া অবাঞ্ছনীয়।

কি ধরনের কাজ ক্লাসে আর কি ধরনের কাজ বাড়িতে করার বেশি উপযোগী তা মোটামুটি ভাবে নির্ণয় করা সহজ। ছাত্রদের বাড়িতে বিদ্যালয়ের দৈনিক পাঠ আর পরীক্ষার পড়া অভ্যাস করতে হয়। তাছাড়া যেগুলি সময়সাপেক্ষ অথবা চুপচাপ বসে' ভেবেচিন্তে বা পড়াশুনো করে' করতে হয় সেগুলি বাড়ির উপযোগী, যেমন হাতের লেখা। অনুলেখন, স্বয়ংসঞ্চয়ন, কবিতা বা গল্পজাতীয় মৌলিক রচনা, ইত্যাদি। আবার যে-সব কাজের তুলনামূলক বিচার হবে অথবা যার জন্য অবস্থাসাম্যের প্রয়োজন সেগুলি সব ছাত্রদের একসংগে বসিয়ে এক সময়ে করানো বাঞ্ছনীয়। অংক ইত্যাদি বিষয়ের পক্ষে যেমন অভ্যাস রাখার জন্য বাড়ির কাজ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বাংলায় তেমন নয় বলে এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা লেখার অভ্যাস অন্যান্য বিষয়সম্পর্কেও ঘটে বলে' বাড়ির কাজের পরিমাণ কিছু কম করা যেতে পারে।

খাতার সংশোধন লাল কালিতেই করা উচিত, কেননা, কালো লেখার মধ্যে লাল সহজেই চোখে পড়ে। ছাত্রদের কালো, রয়াল ব্লু, কিংবা ব্লু-ব্ল্যাক ছাড়া অন্য রঙের কালি ব্যবহার করা ভদ্রতাসংগত বলে' মনে করা হয়না। তাছাড়া বেগুনি, সবুজ প্রভৃতি কড়া রং দৃষ্টিকটুও বটে। শিক্ষক ছাত্রের কাছে যেমন পরিষ্কার কাজ আদায় করবেন, তেমনিই তাঁর সংশোধনও পরিষ্কার হওয়া চাই। সংশোধনের পদ্ধতি ও ক্রমের বিষয়ে এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

সংশোধন সহানুভূতির সংগে করতে হবে, কেননা শিক্ষকের রাগের ভয়ে ছাত্রের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়,—সে শিক্ষকের ওপর আস্থা হারাতে পারে, মনের উত্তেজনাবশত তার

ভুলের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে, এমনকি পড়াশুনোর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানোও আশ্চর্য নয়।

পক্ষপাতশূন্যতা শিক্ষকের নিতান্তপ্রয়োজনীয় গুণ। পক্ষপাত সব সময়ে স্বেচ্ছাকৃত হয়না। শিক্ষকের খাতা দেখবার সময়কার মনের ভাব অনুযায়ী নম্বরের তারতম্য ঘটতে দেখা যায়, তাই শিক্ষকের একেক দলের খাতা যতদূর সম্ভব এই সময়ে দেখা উচিত। মন বা শরীর খারাপ থাকলে, সেই সময়ে খাতা না দেখাই ভালো। অনেক সময়ে মেধাবী ছাত্রের প্রতি প্রীতিবশত শিক্ষকের নিজেরই অজ্ঞাতসারে পক্ষপাত ঘটে। এজন্য তিনি খুব সাবধান থাকবেন, এবং যতদূর সম্ভব খাতাগুলির তুলনা করে' মনে একটি মান স্থাপিত করে' সেই অনুযায়ী নম্বর দেবেন। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ছাত্রদের কাজ অনবদ্য আদর্শস্থানীয় হ'তে পারেনা, তাই যে-স্তরের কাজ তারা সত্যই করতে পারে তারই পর্যবেক্ষণদ্বারা তিনি মূল্যায়নের স্তরনির্বাচন করবেন।

নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি সাংখ্যিক না হয়ে স্তরগত হ'লেই ভালো, অর্থাৎ দশ বা পঁচিশের মধ্যে আট, সাত, পোনেরো, কুড়ি ইত্যাদি নম্বর না দিয়ে রচনাগুলিকে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' ইত্যাদি শ্রেণিভুক্ত করলে সুবিচারের সম্ভাবনা বেশি।

মূল্যায়ন

এক

ভ্রমসংশোধনের মতো পরীক্ষাও শিক্ষার সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত। বাংলা পড়ানোর বহু উদ্দেশ্য। প্রথমে শুনে ও পড়ে' বোঝা এবং বলে' ও লিখে অপরকে বোঝানো। দ্বিতীয় স্তরে মৌখিক ও লিখিত ভাষাব্যবহারের নানাপ্রকার নৈপুণ্যার্জন, যেমন, আবৃত্তি অভিনয়, বক্তৃতা, প্রবন্ধরচনা, আলোচনা, ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সাহিত্যপাঠ ও পরিচয়, ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরে বোধের বিকাশ, যেমন, রসোপলব্ধি, সাহিত্যানুভূতি ও প্রীতি, মানবতাবোধ জাতীয় ঐতিহ্যবোধ ইত্যাদি। চতুর্থ ধাপে মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির ও গবেষণার প্রচেষ্টা। সর্বোপরি নূতন নূতন দৃষ্টিলাভ ও ব্যবহারের উন্মেষ, যেমন, গুণগ্রাহিতা, চারিত্রপূজা, শ্রেষ্ঠ ও মহতের স্বীকৃতি ও অনুকৃতি।

এই উদ্দেশ্যসমূহের সিদ্ধির জন্য শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ চলে। আধুনিক শিক্ষাদর্শের শিক্ষকছাত্রের সহযোগিতামূলক কার্যকলাপের নীতির অনুসরণে শিক্ষক শ্রেণির মধ্যে এবং বাইরে উপযোগী আবহাওয়া ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, ছাত্রদের জ্ঞানকর্মে উদ্বোধিত করবেন। যে ধরণের নৈপুণ্য, বোধ, দৃষ্টি ও গুণের পরিণতি ছাত্রদের মধ্যে বিবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে' মনে করা হয়, শিক্ষকের সৃষ্ট পটভূমি ও পরিস্থিতি তার সম্পাদনের অনুকূল হ'লে তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

ছাত্রেরা গৃহীত আদর্শের দিকে কতটা অগ্রসর হ'ল পরীক্ষার দ্বারা তার পরিমাপ করা হয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে প্রচলিত দৈনিক, সাপ্তাহিক

মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক প্রভৃতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি বিদ্যালয়ের নৈমিত্তিক চিরকর্ম,—এদের মধ্যে দিয়ে দিনে দিনে শিক্ষক আবিষ্কার করবেন কোন ছাত্র কোনদিকে কতটা অগ্রসর হচ্ছে, অথবা অগ্রসর হ'তে পারছে কিনা। নৈপুণ্যসমূহ একদিনে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনা বলে' বারবার ব্যবহার দ্বারা অভিজ্ঞতা ও ভ্রমনিরসনের পথে ধীরে ধীরে, উত্তরোত্তরবর্ধিত ক্ষমতায় ছাত্রের আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের সহায়তা করা শিক্ষার আদর্শ।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রদের বারবার ভ্রমসংশোধন ও পরীক্ষার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয় তারা উদ্দেশ্যের কতদূরে বা নিকটে রয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষার সাক্ষ্যে যাদের যথেষ্ট নিকটে পৌঁছতে পারেনি বলে' মনে করা হয় তাদের আরেক বছরের জন্য একই শ্রেণিতে রেখে দেওয়া হয়, অর্থাৎ প্রোমোশন দেওয়া হয়না।

এই প্রণালিতে সংশোধন ও পরীক্ষার গলদ নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। দেশের সব স্তরের শিক্ষার মান যে-ভাবে অবনমিত হয়ে চলেছে তাতে বলতে হবে সে হয় বাঙালির ছেলেপিলেরা ক্রমশ নির্বুদ্ধি ও দুর্মতি হয়ে পড়েছে, নয়তো শিক্ষা বা পরীক্ষার পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোনো ছিদ্র আছে। জাতিগতভাবে বাঙালিরা যে যেমন শরীরে, তেমনি চরিত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে আত্মপরীক্ষাই সমাধানের পথনির্ণয়ের একমাত্র উপায়। বহুদিন আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আক্ষেপ করেছিলেন যে, যে ব্যবস্থার অধীনে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছেলেরা নিজেদের ভাগ্য গঠন করে' চলেছে, সেই ব্যবস্থার মধ্যেই বাঙালির ছেলেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদ-পসরণ ঘটছে। সে-কথা যদি আজও সত্য হয়ে থেকে থাকে তবে কারণানুসন্ধানের প্রয়োজন হয়েছে বইকি।

প্রথমত আমাদের শিক্ষকসমাজ মনোবিকাশমূলক শিক্ষাপদ্ধতির

সম্বন্ধে সচেতন নন, বরং অবদমনের পথেই তাঁরা অধিক অগ্রসর। ছাত্রবন্ধু বলে' যে-সব শিক্ষকদের খ্যাতি আছে তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেও ছাত্রের স্বাধীনচিন্তার পরিণতি অপেক্ষা তাদের মানসপটে নিজমতবাদের ছাপ রেখে যাওয়ার চেষ্টা বেশি। এইজন্য ছাত্রেরা বিদ্যালয় থেকেই হয় রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নক বা বিদ্রোহী, নয় সেইরকমের ভালো ছেলে হয়ে পড়েছে যাদের রবীন্দ্রনাথ বাঙালী বলে' চিনলেও মানুষ বলে স্বীকার করেননি।

মনুষ্যত্বের সর্বাংগীন বিকাশের জন্য আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির যে আমূল সংস্কার প্রয়োজনীয় তার প্রধান করণিক শিক্ষককে বহু বাধার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। ওইসব অবস্থার মধ্যে কেবল পাঠ্য ও পরীক্ষণ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ বর্তমান গ্রন্থের আলোচনাধীন। পাঠ্যক্রমের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে, বর্তমান আলোচ্য পরীক্ষার কথা।

প্রথমত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কথা ধরা যাক। বিদ্যালয়ে প্রত্যহ যা পড়ানো হয় তার বিষয়ে ছাত্রদের মুখে বলিয়ে এবং খাতায় লিখিয়ে শিক্ষক পরীক্ষা করেন। যে ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে বাংলা পড়ানোর বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে কেবল অর্থবোধ, ভাষাব্যবহার ও রসোপলব্ধির প্রমাণ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাও হয়না; কারণ ছাত্রকে শিক্ষক যখন পড়ান তখন তাদের স্বচেষ্টায় অর্থ ও রসের বোধ এবং জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত করার পরিবর্তে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে নিজ বক্তব্য ও অভিমত তাদের সামনে উপস্থাপিত করেন ফলত, পরীক্ষার সময়ে তারা শিক্ষকের কাছে শোনা বা নোটবই থেকে মুখস্থ করা উত্তর, বুঝে বা, না বুঝে, হুবহু খাতায় লিখে দেয়। শিক্ষক তার ভিত্তিতে ছাত্রকে পাশ বা ফেল করান। এই অন্ধশিক্ষার ফলে ছাত্রদের মান যত অবনমিত হ'তে থাকে তত ফেলের সংখ্যা বাড়িয়ে

প্রতিকারের চেষ্টা হয়, পরীক্ষা বা শিক্ষার পদ্ধতির দোষের কথা ভাবা হয়না।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিপদ আছে। ধরা যাক বিদ্যালয়ে ছাত্রকে নিজের চিন্তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে শেখানো হ'ল:—সে বহিঃপরীক্ষায় কেমন ফললাভ করবে? মধ্যশিক্ষাপর্ষতের পরীক্ষার ফল যে নির্ভরযোগ্য নয় তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। এরজন্য দায়ী পরীক্ষকদের অসাবধানতা, অলসতা ও অজ্ঞতা আর আরো দায়ী পরীক্ষাপদ্ধতির দোষ। এই শেষেরটিই এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত।

পরীক্ষা হ'ল একটা পরিমাপ বা শিক্ষার সাফল্যের মূল্যায়ন। আন্তঃ বা বহিঃপরীক্ষার কাজ হ'ল যে যে উদ্দেশ্যে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার সাফল্যের বিচার করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জীবনে আদর্শবাদ গ'ড়ে তোলা শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হলেও "তোমার জীবনের আদর্শ" এই প্রবন্ধ রচনা করতে দিলে ছাত্রের নিজের গৃহীত আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়না। সুন্দর ভাষায় মণ্ডিত ক'রে, বিশুদ্ধভাবে, গুছিয়ে বাংলাভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার অর্জন শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য। এরূপ প্রবন্ধরচনায় তার প্রমাণ হওয়া উচিত কিন্তু কার্যত যে ছেলে নিজের ভাষায় আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেছে তারচেয়ে যে মুখস্থ ক'রে নোটবইয়ের কথা হুবহু খাতায় লিখেছে সেই ছেলেটি পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই বৃত্তিকে চুরি করার মতো গর্হিত বলেছেন, কিন্তু এর প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এত প্রবল যে প্রকৃত মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নোটবই, প্রশ্নোত্তরমালা ও প্রশ্ন ব'লে দেওয়ার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

প্রবন্ধমূলক প্রশ্নোত্তরে মুখস্থবিদ্যার সম্ভাবনা ছাড়াও ভাবের প্রাধান্যের দরুন ব্যক্তিমানসের প্রভাব অতিরিক্ত বেশি। পরীক্ষকেরা স্বমতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মানের সৃষ্টি করেন ব'লে এর মূল্যায়ন কঠিন।

এমনকি এই ধরনের পরীক্ষায় একই উত্তরের দু'টি "কপি"তে একই পরীক্ষককে বিশপঁচিশের ব্যবধানে কমবেশি নম্বর দিতে দেখা গেছে আবার এক পরীক্ষক তাঁরই রচিত আদর্শ উত্তরের কপিতে ফেল নম্বর বসিয়েছিলেন।

এর প্রতিকারের জন্য বিষয়মুখী বা বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রশ্ন এত ছোট হবে যে ছাত্র এককথায় অথবা একটি চিহ্ন বা বাক্যের দ্বারা তার উত্তর দিতে পারবে; এতে বিষয়বস্তু অনুসারে মূল্যমান নির্ধারিত হবে,—শিক্ষকের মনোভাব বাধার সৃষ্টি করবেনা। এই প্রশ্ন অনেক প্রকারের হয় এবং যাতে প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে বা একাধিক উত্তর সম্ভব না হয় সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যন্ত্রগণকের ব্যবহারের সুযোগ থাকলে নির্ব্যক্তিক-ভাবে এই ধরনের পরীক্ষার ফল নির্ধারণ করা যায়। এর বিরুদ্ধে আপত্তি হ'ল যে এতে তথ্যসম্ভারের জ্ঞান পরীক্ষিত হ'লেও মতামত, অর্থ ও রসবোধ বা সাহিত্যানুভবের প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে' ব্যাকরণাদি নীরস বিষয়ে প্রযোজ্য হ'লেও সাহিত্যাংশে প্রযোজ্য নয়; কিন্তু আজকাল নিপুণ প্রশ্নকর্তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা উপরিউক্ত অনেক ফলেরই পরিমাপ সম্ভব করেছেন।

প্রবন্ধমূলক পরীক্ষার সংশোধন ও বিষয়মুখী ও প্রবন্ধজাতীয় এই দুয়ের সমন্বয়ে ছোট প্রশ্নের সন্নিবেশে পরীক্ষার সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে। প্রথমত এই প্রশ্ন এমনভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে যাতে তার অর্থ বিশেষিত ও সুগম হয়, দ্বিতীয়ত উত্তরের প্রতি অংশের জন্য কত নম্বর নির্ধারিত হয়েছে তার নির্দেশ (যথা ৩ × ৫ = ১৫) দিলে ছাত্র ও পরীক্ষক উভয়ের মূল্যমান নিরূপণের সুবিধা হবে। এই মাঝামাঝি প্রশ্নকে বিষয়নিষ্ঠ বলা যায়, কেননা, যত ছোটো ছোটো অংশে প্রশ্নোত্তর হবে ততই উত্তরকে বিষয়বস্তুর যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

এতে গুছিয়ে, প্রধান-অপ্রধান বিচার করে' বাগাড়ম্বরবর্জিত, সংক্ষিপ্ত আত্মপ্রকাশের অতিপ্রয়োজনীয় গুণেরও পরীক্ষা হয়।

শিক্ষাপরীক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি একসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করে' উপযুক্ত বিষয় পদ্ধতির অবলম্বনে শিক্ষার কাজকে অগ্রসর করে' দিতে হবে আর সেইসব উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল কিনা দেখার জন্য পরীক্ষার প্রশ্নগুলি করতে হবে। এইজন্য শিক্ষক যেমন শিক্ষার তেমনি পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি ও উত্তরের মূল্যায়ন করার সময়ে উদ্দেশ্যগুলি সামনে রাখবেন। বহিঃপরীক্ষার সময়েও যদি এইভাবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশ্নগুলি রচিত হয় তবে তার মাধ্যমে পরীক্ষার সংগে শিক্ষা-পদ্ধতিরও সংস্কার সাধিত হবে।

দুই

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের উন্নয়নমূলক বহু ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়কর্তৃক পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। মার্কিনি বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্লুম ১৯৫৭ সালে ভারত-সরকারকর্তৃক এই বিষয়ের উপদেষ্টারূপে আমন্ত্রিত হয়ে এসে দেশের শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যবেক্ষণে তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে, প্রত্যেক শ্রেণিতেই প্রায় সমস্ত কথা শিক্ষকেরা বলেন ও ছাত্রেরা কেবল শোনে। যখন তাদের কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয় তখন তা কেবল শিক্ষকের কথার পুনরাবৃত্তি করার জন্য মাত্র। এইভাবে কাব্য ও সাহিত্যের পাঠও মুখস্থবিদ্যার উপাদানে পর্যবসিত হয়। ফলে শিক্ষার পরিশ্রম অবসাদ ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরীক্ষায় পাশ করা হয় একমাত্র উদ্দেশ্য।

পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ছাত্রদের বুঝে হোক, না-বুঝে হোক, তোতাপাখির মতো বই মুখস্থ করতে হয়। দেশের সর্বত্র একই ধরনের মামুলি ছকে বাঁধা প্রশ্ন আসে। দায়সারা প্রশ্নরচনাপদ্ধতিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং কখনও পাঠ্যবিষয়ের সমগ্রজ্ঞানের পরিচয় চাওয়া হয়না। জুয়াখেলার মতো প্রশ্ননির্বাচনের ভাগ্যের ওপর পরীক্ষার ফল নির্ভর করে এবং মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভর হওয়াতে একই পরীক্ষার একই পত্রের মধ্যেও মূল্যমান স্থির থাকেনা।

পাঠ্যক্রমগুলিও বিষয়বস্তুর শীর্ষতালিকামাত্র এবং তার অন্তর্গত অংশগুলি না-বুঝেও মুখস্থ করা-করানোই হয়েছে শিক্ষার সমগ্র প্রক্রিয়া।

এই বিষচক্রটিকে ভাঙার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অনেকে বলেছিলেন শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাঁচাতে হ'লে পরীক্ষাব্যবস্থার উচ্ছেদ চাই, কিন্তু ডাঃ ব্লুম দেখলেন যে পরীক্ষার প্রভাব দেশের শিক্ষায় এমন ব্যাপক ও গভীর যে একে সহসা সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়, তাই তিনি প্রথমে শিক্ষণশিক্ষামহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে পথিকৃতের দল সৃষ্টি করতে উদ্যত হ'লেন,—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকে পরীক্ষা, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণ সংস্থা স্থাপিত হ'ল।

এরপর পুনর্গঠনপরিকল্পনার প্রথম তিনচারবছরের কাজ হ'ল ভারপ্রাপ্ত সংস্থা, পরীক্ষক, শিক্ষক প্রভৃতির মধ্যে দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনদ্বারা নূতন মনোভাবের সৃষ্টি।

পরের দশবছরের কাজ হবে দেশের বিপুলসংখ্যক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নূতন পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগে শিক্ষিত করে' নেওয়া। এই সময়ে প্রত্যেক রাজ্যে পরীক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হবে : তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবিত আদর্শসম্মত শিক্ষা ও পরীক্ষার উপাদানগুলি

আন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় সার্থকভাবে অংগীভূত করার জন্য শিক্ষকসমাজ ও মধ্যশিক্ষাপর্ষতের হাতে দেবেন।

পরীক্ষার প্রবল প্রভাবের বশবর্তী হয়ে শিক্ষকেরা নবনবপদ্ধতির প্রয়োগে আর ছাত্রদের জন্য নূতন নূতন অভিজ্ঞতা ও পটভূমির সৃষ্টিতে প্রণোদিত হবেন। আজ যেমন পরীক্ষা-ব্যবস্থার দোষত্রুটির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শচ্যুত হয়েছে, তখন তেমনি পরীক্ষার প্রয়োজনেই নূতন, সজীব শিক্ষাধারার প্রবর্তন হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কলকাতায় পশ্চিমবংগের শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রে একজন মূল্যায়নবিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হয়েছেন।

এই প্রাথমিক কাজ যে এখন থেকেই শিক্ষকসমাজে কিছু সাড়া জাগিয়েছে তার পরিচয়স্বরূপ কয়েকজন শিক্ষিকার রচিত কিছু প্রশ্ন এরপরে দেওয়া হ'ল। এঁরা আলিপুরের মহিলা-শিক্ষণশিক্ষা-মহাবিদ্যালয়ের প্রসারবিভাগের পরিচালনায় বর্তমান গ্রন্থকর্ত্রীর সহযোগিতায় কাজ করেছিলেন। সাধারণত ওপরের শ্রেণিতেই নূতন ধরনের প্রশ্নরচনায় বেশি বিভ্রান্তি দেখা দেয় বলে' উঁচুক্লাসের উদাহরণগুলিই দেওয়া হয়েছে ও প্রত্যেকটি বিষয় পাঠসংকলন থেকে গৃহীত হয়েছে। শিক্ষকদের বোধের সুবিধার্থে প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছের সংগে পাঠনার উদ্দেশ্যের কথাও দেওয়া হয়েছে। কোনো গদ্যপদ্যাংশের সম্পূর্ণ প্রশ্নাবলি দেওয়া হয়নি—আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষকেরা অনুরূপ আদর্শে পূর্ণ প্রশ্নমালা রচনা করে' নিতে পারেন।

তিন

অষ্টম শ্রেণি। বিষয় - বর্ষাসুন্দরী, মানকুমারী বসু।

উদ্দেশ্য :—১। পাঠ ও অর্থবোধ।

২। বাংলাদেশের বর্ষাকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় উপভোগ।

৩। কবি মানকুমারী বসুর কবিতার পরিচিতি।

৪। বাংলাভাষার প্রকৃতিবিষয়ক কাব্যসাহিত্যের পরিচয়লাভ।

৫। সাহিত্যোপভোগজাত সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ।

প্রশ্নমালা :— ক। প্রবন্ধমূলক (বিষয়নিষ্ঠ)

১। বর্ষাসুন্দরী কবিতার বর্ণনার অনুসারে বর্ষার একটি চিত্ররূপ দাও।

২। কবি কাকে রানি বলেছেন? রানির কি কি অলংকারের বর্ণনা করেছেন? স্নেহের মুখ কেন বলেছেন?

৩। বর্ষার আগমনে কোন কোন পশুপক্ষী কিরূপ ব্যবহার করে? পৃথিবী ও আকাশের কি অবস্থা হয়? মানুষের প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়?

৪। "ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে যেন প্রেমের তুফান চলে"—প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৃষ্টি ও প্লাবনের সংগে মানুষের মনে কি অনুরূপ ভাব জেগেছে বলে' এই ছত্রে বোঝা যায়?

খ। বিষয়মুখী

১। নিচে বাঁ-দিকের স্তম্ভের একেকটি শব্দের সামনে ডানদিকের স্তম্ভে দুটি করে' শব্দ দেওয়া হয়েছে। বর্ষাসুন্দরী কবিতার অনুসারে ডানদিকের যে শব্দটি বাঁদিকের শব্দের সংগে সম্পর্কিত সেইটির চারদিকে বৃত্ত অংকিত কর।

আননে	—	বিজলিহাসি/কেতকীছটা।
মেঘে	—	আনন্দ ভরা/গুরুগরজন।
উথলিছে	—	গংগাপদ্মা/স্নেহের মুখ।

২। বর্ষাসুন্দরী কবিতা থেকে অংশ উদ্ধৃত করে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও —

রাতদিন কি শব্দ শোনা যায় ?

রানির সাজ কেমন ?

রানির গলায় কি গহনা ?

রানির আঁচলে কিসের ছটা ?

কে নাচে ?

কে গায় ?

বসুধা কি করে ?

কারা উথলে উঠেছে ?

প্রাণে কি ধরে না ?

ধরার কি হ'ল ?

মানুষের প্রাণে কি হ'ল ?

প্রকৃতি কিসে মুখ ঢেকেছে ?

বিষয়—জীবন ও সূর্য -কাজি নজরুল ইসলাম।

উদ্দেশ্য—১। পাঠ, অর্থবোধ, রসোপলব্ধি।

২। জীবনের সংগে সূর্যের তুলনার সার্থকতাবোধ।

৩। কাজি নজরুল ইসলামের রচনার সহিত পরিচয়।

৪। কাব্যানুরাগের বৃদ্ধি।

৫। আদর্শজীবনের ধারণার উচ্চাকাংক্ষার অনুপ্রেরণ।

প্রশ্নমালা :— ক। প্রবন্ধমূলক (বিষয়নিষ্ঠ।)

১। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

—এই কবিতায় কে কাকে সম্বোধন করেছেন ?

—কি বলে' সম্বোধন করেছেন ?

—তাঁর উদয়ের সংগে প্রকৃতির কি অবস্থা হয় ?

—ঊর্ধ্বে ওঠার সংগে সংগে কি ঘটে ?

—অস্তগমনের সংগে ত্রিলোকের অবস্থা কিরূপ হয় ?

২। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর পৃথক পৃথক এক বা দুই বাক্যে দাও।

—শৈশবকালের সংগে সূর্যের কোন অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে ?

—ঊর্ধ্বলোক বলে' কোন লোকের উল্লেখ করা হয়েছে ?

—কি ভাবে সেই লোক আমাদের কাছে আসতে পারে ?

—আলোকের আগমনে কি হয় ?

—পৃথিবীর আঁধার বলে' কবি কিসের কিসের উল্লেখ করেছেন ?

—কি করে' তা দূর হয় ?

—সূর্যের প্রচণ্ড তাপে কি অবস্থা হয় ?

—তেজোদীপ্ত মানুষের দ্বারা কি দগ্ধ হ'তে পারে ?

—তাঁদের আহ্বানে কারা ছুটে আসবে ?

—কি ভাবে আদর্শ মানুষ হওয়া যায় ?

—এইরূপ শৌর্যবীর্যপূর্ণ কাজ জীবনের কোন সময়ে সম্ভব ?

—জীবনের এই কাল সূর্যের কোন অবস্থার সংগে তুলনীয় ?

—আদর্শ মানুষের জন্য মাংগলিক গাইবে কে ? কি ভাবে ?

—সূর্যাস্তের পর পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হয়?

—মহৎ লোকের মৃত্যুকে পৃথিবীবাসী কি-ভাবে গ্রহণ করবে?

—সূর্য কিরূপ লোকের সংগে তুলনীয়?

খ। বিষয়মুখী

১। নিচের প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাশে কয়েকটি করে' উত্তর দেওয়া আছে; ঠিক উত্তরগুলির ডানদিকের বন্ধনীতে √চিহ্ন দাও।

প্রঃ—কবিতাটিতে কাকে সজীব বলে' কল্পনা করা হয়েছে?

উঃ—মানুষকে ( ), সূর্যকে ( ), কবিকে ( )।

প্রঃ—কবিতাটিতে মানুষকে কিসের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে?

উঃ—বীর হ'তে ( ), প্রেমিক হ'তে ( ), দেশজয় করতে ( )।

২। বাঁ-দিকে কতগুলি অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ডানদিকে তাদের সন্নিহিত আগের বা পরের অংশগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে। বাঁদিকের বাক্যাংশের পাশের বন্ধনীগুলিতে ডানদিকের স্তম্ভের যার যার বাকি অংশের নম্বর বসাও।

তোমার জীবন এমনি হবে।	( )—	১। ত্রিজগতের দুঃখশোক।
তোমার শক্তি তপস্যাতে।	( )—	২। দেশের, জাতির, লজ্জা, গ্লানি, কলংক ও অপমান।
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে	( )—	৩। তেমনি মানুষ এই ধরার।
তোমার তেজে দগ্ধ হবে	( )—	৪। যুক্তকরে বিশ্বভুবন।
তোমার ডাকে আসবে ছুটে	( )—	৫। শৈশবে আনন্দময়।
তুমিই হবে সেই সে মানুষ	( )—	৬। আসবে কাছে ঊর্ধ্বলোক।
গাইবে তোমার মাংগলিক	( )—	৭। অধ্যবসায়, তপস্যায়।
হারিয়ে তোমার কাঁদবে শোকে	( )—	৮। যে-সব আত্ম-অবিশ্বাসী। ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়।

নবম শ্রেণী ॥ বিষয়—বাঙালির মা—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

উদ্দেশ্য :—১। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও ঐশ্বর্যের পরিচয়।

২। স্বদেশানুরাগ, স্বদেশের জননীরূপের তাৎপর্যবোধ।

৩। উপমার উপলব্ধি, সাহিত্যিক বোধ।

৪। কবিতাটির অর্থবোধ।

প্রশ্নমালা :—ক। অল্প কথায় উত্তর দিতে হবে।

১। বাংলাদেশকে জননীরূপে ধারণা করে' কবি দেশের কোন কোন অংশকে মায়ের কোন কোন অংগ বা অলংকাররূপে কল্পনা করেছেন?

২। জননীর কোন কোন অলংকারের বর্ণনা "বাঙালির মা" কবিতায় পাও?

৩। "বাঙালির মা" কবিতায় বর্ণিত বায়ু, রবি, জ্যোৎস্না, উষা ও সন্ধ্যা মায়ের কি কি কাজে নিযুক্ত? নদী কিরূপে মায়ের বৈতালিক গান করে?

৪। "বাঙালির মা" কবিতায় মায়ের পূজার বৈতালিক গান, নাচ ও বিজয়তূরী কিরূপে কল্পিত হয়েছে?

৫। "বাঙালির মায়ের" সন্তানেরা মায়ের আশীর্বাদ কিসের কিসের মধ্যে দিয়ে পায়?

৬। কমলে কামিনীর রূপ বর্ণনা কর। "বাঙালির মায়ে" বর্ণিত বাংলাদেশের সংগে এই রূপের কি সাদৃশ্য?

৭। "বাঙালির মা" কবিতায় স্বদেশের কাছে দেশবাসী কি পায়? এই দানগুলি সন্তানকে মায়ের দানের সংগে কিরূপভাবে তুলনীয়?

খ। একেক বাক্যে উত্তর দিতে হবে।

"বাঙালির মা" কবিতায়—

১। বাঙালির মা কাকে বলা হয়েছে?

২। বৃষ্টির ধারাকে অমিয় বলা হয়েছে কেন?

৩। বায়ু কিরূপে চামরের কাজ করে?

গ। বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বাঁ-দিকে কতকগুলি প্রাকৃতিক বিষয়ের আর ডানদিকে সাজসজ্জা, অংগ ও পরিচর্যার বস্তুবিষয়ের শব্দ দেওয়া হয়েছে। বাঁদিকের শব্দগুলির যেটি যেটি ডানদিকের শব্দের সংগে সম্পর্কযুক্ত তার নম্বরটি ডানদিকের উপযুক্ত শব্দের পাশে বন্ধনীতে লেখ।

ক।	হিমাদ্রি	চামর ( )
খ	মেঘ।	কাঞ্চী ( )
গ।	মিষ্ট বায়ুতে আন্দোলিত বনানী।	শ্বেতছত্র ( )
ঘ।	সুনীল অটবী।	ঝালর ( )
ঙ।	জাহ্নবী।	মুক্তবেণী ( )

২। বাঁ-দিকে "বাঙালির মা" কবিতা থেকে দুটি ছত্রের অংশ দেওয়া হয়েছে আর ডানদিকের একাধিক শব্দ দেওয়া হয়েছে: ক, খ, এই দুই ছত্রের প্রত্যেকের পাদপূরণের জন্য যে শব্দটি প্রয়োজনীয় তার চারদিকে একটি করে' বৃত্ত এঁকে দাও।

ক। কাঞ্চীসম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়া—ব্রহ্মপুত্র। দামোদর। জাহ্নবী।

খ। বৈতালিক দুটি জলসখা— অজয়-ভৈরব। ব্রহ্মপুত্র-দামোদর। কাঁসাই-আত্রাই।

৩। নিচের অসমাপ্ত বাক্যগুলি কবিতার চরণ অনুসরণে পূর্ণ কর :—

"কুঞ্জ দেয়—

"রবি দেয—

"উষা দিযে যায়—

"চরে তব শ্যাম গোঠে—

৪। মায়েব কাছ থেকে সন্তান যা পায় বাঁদিকে লেখা আছে। ডানদিকেব দুই স্তম্ভে শীর্ষ অনুসারে যথাক্রমে স্বদেশেব কাছে আমবা অনুরূপ কি পাই আব কি ভাবে পাই লিখে দাও :—

মা দেন	স্বদেশেব কাছে পাই	কি ভাবে পাই
—ক্ষুধাব সময়ে খাদ্য।		
—পিপাসাব সময়ে জল।		
—জীবনধাবণেব উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য।		
—স্নেহ দিয়ে জীবন গঠন।		

৫। "বাঙালির মা" কবিতাব যে-যে অংশে নিম্নলিখিত ভাবগুলি পাওয়া যায় সেই সেই অংশ উদ্ধৃত কব।

—স্বদেশ স্বর্গ হতেও বড।

—স্বদেশ ভগবানেব নমস্য।

—বাংলাদেশের রূপের সংগে পদ্মাসনা দেবীরূপে সাদৃশ্য আছে।

৬। বাঁ-দিকে কতকগুলি বর্ণের নাম দেওয়া হয়েছে। "বাঙালির মা" কবিতার অনুসারে সেগুলি স্বদেশ ও মার সম্পর্কে কি কি বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা

যথাক্রমে, শীর্ষানুসারে ডানদিকের স্তম্ভদুটিতে লিখে দাও—

বর্ণ	স্বদেশ	মা
হিরণ		
হরিৎ		
বাতুল		
শ্বেত		
সুনীল		

বিষয়—"হাট"—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

উদ্দেশ্য :—কবিতাটির অর্থ ও ভাববোধ

জীবনের সংগে হাটের তুলনামূলক আলোচনা।

কবিতাটির দার্শনিক ভাবধারার আলোচনা।

কবির জীবনাদর্শের সামান্য পরিচয়।

আধুনিক কাব্যসাহিত্যের ধারার সহিত সংযোগসাধন।

সাহিত্যোপভোগের দ্বারা সাহিত্যপ্রীতির উদ্রেক।

প্রশ্ন :— ক। বিষয়নিষ্ঠ

১। হাট কাকে বলে? সেখানে কি কি হয়? যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হাট কবিতায় চিত্রিত গ্রাম্য হাটের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। যতীন্দ্রনাথের হাট কবিতায় হাটের যাওয়া-আসা ও বিকি-কিনির সংগে মানবজীবনের কি কি সাদৃশ্য আছে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। "হাট" কবিতার কয়েকটি সমান উক্তি উদ্ধৃত করে তার পাশে পাশে তুলনীয় অংশগুলি লিখে দাও :

খ। বিষয়মুখী

১। নিচে "হাট" কবিতার কতকগুলি যুগ্মপদের এক অংশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি পূর্ণ কর।

বেচা—	চেনা—
মাল— —	ক্রেতা—
দর— —	দিবস—

২। "হাট" কবিতা থেকে অংশ উদ্ধৃত করে' নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

যে যার সব কোথায় যায় ?

হাটে যখন আঁধার হয় তখন গ্রামে কি হয় ?

জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে কি বাজে ?

কার ডাকে নির্জন হাটে রাত্রি নামে ?

দিবসে কার ভিড়ের কোলাহল হয় ?

কেউ ভরে' নেয় আর কেউ কি করে ?

প্রভাতের ফল কিরূপ ব্যবহার সহ্য করে ?

সে কিসের ব্যথা বহন করে ?

হাটের খেলা কিসের খেলার মতো ?

৩। বাঁ-দিকের স্তম্ভে হাট কবিতার কতকগুলি উদ্ধৃতাংশ দেওয়া হয়েছে, ডানদিকের স্তম্ভে শেষাংশগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো আছে। বাঁদিকের যে অংশ ডানদিকের যে অংশের সংগে যুক্ত তার নম্বরটি ডানদিকের সেই অংশের পাশের বন্ধনীতে বসাও।

ক। দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি ( )—পার্শ্বে পাকুড় শাখে।

খ। বকের পাখায় আলোক লুকায় ( )—কেউ গেল খালি ফিরে।

গ। নদার বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস ( )—ছুটে এপারের ক্রেতা।
ঘ। নির্জন হাটে রাত্রি নামিল ( )—চিরকাল একই খেলা।
ঙ। দিবসেতে সেথা কত কোলাহল ( )—মাঝে একখানি হাট।
চ। হাসাহাসি করে' কেউ নিল ভরে' ( )—নিত্য নাটের খেলা।
ছ। ওপারের লোক নামালে পশরা ( )—পরখের ছল।
জ। শত হাতে সহি ( )—চেনা-অচেনার ভিড়ে।
ঝ। দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী ( )—একক কারের ডাকে।
ঞ। উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে ( )—ছাড়িয়া পূবের মাঠ।

বিষয়—কাশীরাম দাস—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

উদ্দেশ্য :—১। পাঠ এবং ভাব ও অর্থবোধ।

২। মধুসূদনের কাব্য ও কাব্যরীতির পরিচয়লাভ।

৩। সনেটের কাব্যরূপদর্শন।

৪। বাংলাসাহিত্যে মধুসূদন ও কাশীরামদাসের অবদানের উপলব্ধি।

৫। বাংলার শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের পরিচয়লাভ।

৬। সাহিত্যোপভোগজাত সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ।

প্রশ্নমালা— ক। বিষয়নিষ্ঠ

১। নিচের প্রত্যেকটি প্রশ্নের ধারাবাহিক উত্তর দিয়ে দেড়পৃষ্ঠার মধ্যে একটি রচনা লেখ।

(ক) জাহ্নবী যেমন শিবের জটায় ছিলেন, তেমনি ব্যাসের মহাভারত কোথায় ছিল?

(খ) সেই অবস্থায় কিসের তৃষ্ণায় আকুল হয়ে বাবা কি করত?

(গ) কে, কি ভাবে গংগাকে মর্ত্যে আনেন? তাঁর কাজের সংগে কাশীরামদাসের কাজের কি-ভাবে তুলনা করা যায়?

(ঘ) গংগার মর্ত্যে আগমনের ফল আর মহাভারতের বাংলায় অনুবাদের ফলের কি কি মিল ?

২। ভগীরথকে কোন তিনটি কাজের জন্য নরকুলধন বলা হয়েছে ? একেকটি বাক্যরচনা করে' একেকটি কাজের কথা বল। সেগুলির সংগে তুলনীয় কোন কোন কাজের জন্য কাশীরাম দাস পুণ্যবান ? একেকটি বাক্যে একেকটি কাজের কথা বুঝিয়ে দাও।

৩। "মহাভারতের কথা অমৃতসমান"—কেন ? কাব্যরসের দিক দিয়ে, আধ্যাত্মিক মুক্তির দিক দিয়ে, ভাষার উন্নতির দিক দিয়ে ?—প্রত্যেকটি বিষয়ে দুইটি করে' বাক্য রচনা কর।

খ। বিষয়মুখী

১। নিচের প্রত্যেকটি প্রশ্নের দুটি করে' উত্তর দেওয়া হয়েছে, যেটি ঠিক তার চারদিকে বৃত্ত এঁকে দাও।

—চন্দ্রচূড় জটাজালে আবদ্ধ ছিলেন কে ?

—জাহ্নবী/ভারতরস।

—কে কঠোরভাবে গংগার পূজা করেছিলেন ?

—দ্বৈপায়ন/ভগীরথ।

—কাশীরামদাস কি করেছিলেন ?

—গংগাকে মর্ত্যে এনেছিলেন।

—বংগে ভারতরসের স্রোত এনেছিলেন

গংগাকে মর্ত্যে আনার কি ফল হ'ল ?

—ত্রিভুবন পবিত্র হ'ল।

—গৌড়ের তৃষ্ণা মিটলো।

—ভারতরসের স্রোতে কি হ'ল ?

—সগরবংশের মুক্তি হ'ল।

—গৌড়ের তৃষ্ণা মিটলো।

—কবীশদলে কে পুণ্যবান ?

—কাশীরামদাস/ভগীরথ।

২। নিচে কাশীরামদাস কবিতাটি মাঝে মাঝে ফাঁক রেখে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ঠিক পদ বসিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর।

—জটাজালে আছিলা যেমতি
— ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি—হৃদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল—কবিত .র্দন।
কঠোরে গংগায় পূজি—ব্রতী
(সুধন্য—ভবে, নরকুলধন !)
—বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে এ—ভুবন,
সেইরূপে—পথ খননি স্ববলে
—রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে—র তৃষ্ণা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু—ভূমি।
—র কথা অমৃতসমান
তে—! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান।

বিষয়—আত্মবিলাপ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

উদ্দেশ্য :—১। পাঠ ও অর্থবোধ।

২। মধুসূদনের কাব্যের সহিত পরিচয়।

৩। কবিজীবনের নৈরাশ্যবোধের উপলব্ধি।

৪। লিরিক কবিতার ব্যক্তিগত সুর ও সংগীতধর্মিতার উপলব্ধি।

৫। উপমা ও চিত্রায়ণের অনুভব।

৬। কাব্যপ্রীতির উন্মেষ।

প্রশ্নমালা :— ক। প্রবন্ধমূলক

১। আত্মবিলাপ কবিতায় কবি মধুসূদন দত্ত জীবনের কোন কোন বিষয়ের বঞ্চনার কথা বলেছেন? (দশপংক্তির মধ্যে আলোচনা কর।)

২। কবিজীবনের ব্যর্থতার সংগে কিসের তুলনা ব্যবহার করা হয়েছে?

৩। আত্মবিলাপ কবিতার মূলভাব কি? এই ভাব কবিতার কোন কোন অংশে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ধ্বনিত হয়েছে তা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়ে দাও।

খ। বিষয়মুখী

নিচের প্রত্যেকটি বাক্যের উদ্দেশ্যের দুটি করে' বিধেয় দেওয়া হয়েছে, যেটি ঠিক মনে কর তার চারপাশে বৃত্ত এঁকে দাও।

১। কালসিন্ধু পানে ধাবিত জীবনকে ফেরানো—সম্ভব/অসম্ভব।

নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য ঝলমল —করে/করেনা।

৩। অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্য পতিত —হয়/হয়না।

৬। ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় —আলো/আঁধার

৫। প্রেমের নিগড় —মুক্তির উপায় স্বরূপ/কালফাঁসের ন্যায়।

৬। যশোলোভে কবি লাভ করলেন — আরাম/অনাহার-অনিদ্রা।

বিষয়—জন্মভূমি—যতীন্দ্র মোহন বাগচী

উদ্দেশ্য :—১। পাঠ ও অর্থবোধ।

২। বাংলাদেশের গ্রামের চিত্র উপভোগ।

৩। চিত্রধর্মী কবিতার রসোপলব্ধি।

৪। বর্তমান কবিতাটির বিশেষত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা।

৫। সাহিত্যোপভোগের দ্বারা সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ।

প্রশ্নমালা :— ক। বিষয়নিষ্ঠ

১। কবির গ্রামের শেষপ্রান্তে ও পূবদিকে কি কি আছে? রাখাল বালকেরা কোথায় জটলা করে?

২। কবির জন্মভূমির পথ কিরূপ? পথে চলতে গেলে কি কি অসুবিধা ভোগ করতে হয়?

৩। কবির জন্মভূমি গ্রামে কতরকমের পাখি আছে? তারা কোথায় উড়ে বেড়ায়?

৪। কবির জন্মভূমিতে জলের উৎস কি? সমস্ত বছর জল পাওয়ার পক্ষে কি কি বাধা আছে?

৫। কবির গ্রামে কি কি নেই, তবু কি কি আছে?

৬। নিজের গ্রামের কাছে এলে কবির কিরূপ ভাব হয়? কেন হয়?

খ। বিষয়মুখী

১। নিচে বাঁদিকে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, ডানদিকে প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেওয়া হয়েছে। ঠিক উত্তরগুলির পাশের বন্ধনীতে √ চিহ্ন দিয়ে দাও।

ক। কবির জন্মভূমি তাঁর হৃদয় হরণ করেছে কেন?
— পথের পাশে ঘুঁটে-ছাইয়ের গাদা আছে বলে' ( )।
— বাপের স্নেহ, মায়ের আদর আছে বলে' ( )।

খ। কবির জন্মভূমিতে কি কি আছে? — পদ্মদিঘি ( )।
রাজার প্রাসাদ ( )।
ডোবা ( )।
জ্বর ( )।
পাঠশালা ( )।
দারিদ্র্য ( )।

গ। এককথায় প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দাও।
"স্বর্গশোভা তবু সেথায়"—কোথায়?
"সেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি"—কার?

বিষয়—সাগর সংগমে নবকুমার—বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উদ্দেশ্য :—১। পাঠ, অর্থবোধ ও আলোচনা।
২। তৎকালীন দেশ ও সমাজের অবস্থার চিত্রদর্শন।
৩। বংকিমচন্দ্রের সাহিত্যের পরিচয় লাভ।

৪। উপভোগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি।

প্রশ্নমালা— ক। বিষয়নিষ্ঠ

(একেকটি অনুচ্ছেদ রচনা করে' একেকটি প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দাও।)

১। নবকুমার এখন থেকে কতদিন পূর্বে গংগাসাগরে গেছিলেন? সেই সময়ে যাত্রিবাহী নৌকাগুলি দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াত করত কেন? নবকুমারের নৌকা কিরূপে দলছ ড়া হয়েছিল?

২। বৃদ্ধ যাত্রীটি বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? নবকুমার কেন মনে করেন যে বৃদ্ধের আসা উচিত হয়নি? বৃদ্ধ নিজের পক্ষে কি যুক্তি দেখিয়েছিলেন? নবকুমার কিরূপে সেই যুক্তি খণ্ডন করলেন। তিনি নিজেই বা কেন গংগাসাগরে গেছিলেন?

৩। নাবিকদের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে কে নৌকার বাইরে এসেছিলেন? তিনি বাইরে এসে কি দেখলেন? তিনি বাইরের অবস্থার সম্বন্ধে সবিশেষ কাকে বল্লেন? তাব ফল কি হ'ল? তিনি নাবিকদের কি করতে বল্লেন? নৌকার আরোহীরা সেই সময়ে কি করছিলেন?

৪। "রোদ উঠেছে…ডাংগা!"—এই উক্তি কারা, কখন, করেছিল? রোদ উঠলে তারা কি দেখলো? তাদের কি ধারণা হ'ল?

৫। নদীতীরে পাকাদি সমাপন করার প্রস্তাব কারা, কেন, করেছিল? পাকের উদ্যোগ করতে গিয়ে কি অসুবিধা ঘটেছিল? এই অসুবিধা দূর করার ভার কার ওপর দেওয়া হয়েছিল?

৬। নবকুমারের কাষ্ঠ সংগ্রহ করে' ফিরতে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি? বিলম্ব দেখে নৌকারোহীদের কি ধারণা হয়েছিল? তারা কাষ্ঠ সংগ্রহকারীকে ফেলেই দেশের দিকে যাত্রা করেছিল কেন? তুমি কি তাদের এই কাজকে সমর্থন কর? লেখক এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন তুমি কি তার সংগে একমত? নিজের মতটি একটি বাক্যে বুঝিয়ে দাও।

গ। বিষয়মুখী

১। নিচে বাঁদিকে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, আর ডানদিকে প্রত্যেক প্রশ্নের দুটি করে' উত্তর দেওয়া হয়েছে। যে প্রশ্নের যে উত্তর ঠিক তার পাশের বন্ধনীতে √ চিহ্ন দাও।

ক। "মাঝি আর কতদূর যেতে পারিব?" কে এই প্রশ্ন করেছিল?
- নবীন ( )।
- প্রবীণ ( )।

খ। "খাবার সময় বুঝা যাবে।" একথা কে বলেছিল?
- নাবিক ( )।
- নবকুমার ( )।

২। একটি মাত্র শব্দ বা বাক্য লিখে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

—"কেনারায় পড়⋯পড়!"—এই উক্তি কে করেছিলেন?

—কখন করেছিলেন?

—"সে কেবল কাঁদিলনা!" —কে কাঁদিলনা? — কেন?

—"একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল—'রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ওই দেখ ডাংগা!'" —কারা?

দশম শ্রেণী ॥ বিষয়—আমরা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উদ্দেশ্য :—১। পাঠ, মর্মগ্রহণ ও সৌন্দর্যোপলব্ধি।

২। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ ও উল্লেখের উপভোগ।

৩। বাংলাদেশ তথা বাঙালিজাতির প্রাচীন গৌরববোধ।

৪। বাঙালিজাতির বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি দ্বারা বর্তমানকে অনুপ্রাণিত করা।

৫। কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত পরিচয়।

৬। কাব্যপাঠে আগ্রহসৃষ্টি।

৭। কাব্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের অনুবন্ধসাধন।

প্রশ্নমালা :— ক। প্রবন্ধমূলক (বিষয়নিষ্ঠ।)

১। গংগার বেণী কোথায় মুক্ত হয়েছে? কে কাকে মুক্তি বিতরণ করছে? বাংলাদেশের তিনটি তীর্থের নামোল্লেখ করে' তাদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখ।

২। কোন কোন গুণের জন্য বাংলাদেশকে "তীর্থ বরদ" এবং "বাঞ্ছিতভূমি" বলা হয়েছে দুই অনুচ্ছেদে বুঝিয়ে দাও।

৩। "আমরা কবিতায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কল্পিত নারীমূর্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটির অবলম্বনে একটি করে' অনুচ্ছেদ লেখ।

৪। এই কবিতায় কল্পিত বাংলাদেশের মূর্তির সংগে তার ভৌগোলিক বিশেষত্বের যোগসূত্র বুঝিয়ে দাও।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে একেকটি ছোট ছোট অনুচ্ছেদ রচনা করে' বাঙালির শৌর্যের ইতিহাস বর্ণনা কর।
—বাঘের সংগে যুদ্ধ।

—নাগের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
—চতুরংগ সেনার সংগে যুদ্ধ।
—বিজয়সিংহের পরিচয়।
—মগ ও মোগলের মহড়া।

৬। নিচের বিষয়গুলিতে "আমরা" কবিতায় বাঙালির সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে তা দুই দুই ছত্রে লিখে দাও। ধর্ম ও ঐক্য। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। বিজ্ঞান। ঐতিহাসিক গৌরব। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

৭। কপিলমুনি, দীপংকর, জয়দেব, বীটপাল ও ধীমান কে ছিলেন দুই দুই ছত্রে লিখে দাও।

৮। "তপের প্রভাবে বাঙালি সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শবসাধনার বাড়া।"
বাঙালি সাধকটি কে? তিনি কি ভাবে জড়ের সাড়া পেয়েছেন? এটি নবীন সাধনা কেন? শবসাধনার সংগে এর সাদৃশ্য কি?

৯। "আমরা" কবিতায় বাংলাদেশের অতীতের গৌরবের সম্বন্ধে যে-সমস্ত উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমানে তার পুনরুজ্জীবন কি-ভাবে ও কতখানি সম্ভব এবং তুমি তাতে কি অংশ গ্রহণ করতে পার তা এক পৃষ্ঠার মধ্যে গুছিয়ে লেখ।

১০। বাঙালির দেব-ঋণ কি? তার থেকে মুক্তি কি করে' সম্ভব?

খ। বিষয়মুখী

১। বন্ধনীর মধ্যে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন করে' নিচের শূন্যস্থান পূর্ণ কর।
(জয়দেব, বীটপাল, কপিল, ধীমান, দীপংকর, অতীশ)

ক। জ্ঞানের নিধান, আদি বিদ্বান,—সাংখ্যকার,

খ। বাঙালি—লংঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,

গ। জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি—,

ঘ। বাংলার রবি—কবি কান্ত কোমল পদে

২। বাঁ দিকের স্তম্ভের কবিতার উদ্ধৃতি পড়ে' ডানদিকের স্তম্ভে "আমরা" কবিতা থেকে তার অনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত করে দ ও।

ক। ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর,
নদীজপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

খ। হেথা একদিন বিরামবিহীন

একটি বিরাট হিয়া।

৩। কবিতার থেকে ছত্র উদ্ধৃত করে' নিচের প্রশ্ন গুলির উত্তর দাও।

ক। বাঙালি কার সংগে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে ?

খ। নাগকে নিয়ে আমরা কি করি ?

গ। বিজয়সিংহ কোথায় নিজ পরিচয় রেখেছেন ?

ঘ। আমরা মগ ও মোগলের আক্রমণ কি ভাবে প্রতিহত করেছি ?

ঙ। কার হুকুম দিল্লীনাথকে হটতে হয়েছিল ?

৪। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আমরা" কবিতা কেন ভাল লাগে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কারণ নিচে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে

যে যে গুলি তোমার কাছে সত্য তার পাশের বন্ধনীতে √ চিহ্ন দাও।

ক। কবি বাংলাদেশের রূপের খুব সুন্দর একটি চিত্র দিয়েছেন। ( )

খ। কবিতাটি পড়ে' বাংলাদেশকে ভারতের সবশ্রেষ্ঠ দেশ বলে মনে হয়। ( )

গ। বাঙালির প্রাচীন গৌরব আমাদের হৃদয়ে গৌরববোধ আনে। ( )

ঘ। কবিতাটি পাঠে আমাদের পূর্বের পরাধীনতার জন্য গ্লানি জন্মায়। ( )

ঙ। কবিতাটির ছন্দোমাধুর্য অনুপম। ( )

চ। কবিতাটি পড়ে' আমাদের বিদেশি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা জন্মায়। ( )

ছ। কবিতাটি পড়ে' ইতিহাস, ভূগোল ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। ( )

জ। কবিতাটি পড়ে বুঝতে পারি বাঙালি কারো সাহায্য বিনাই উন্নতি করেছিল। ( )

বিষয়—প্রতিভা—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

উদ্দেশ্য :—১। পাঠ, অর্থবোধ, ধারণাগ্রহণ।

২। বিমূর্ত ভাববোধের অভ্যাস।

৩। মাতৃভাষার মাধ্যমে চিন্তা ও যুক্তিমূলক আলোচনার অভ্যাস।

৪। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনার সহিত পরিচয়।

৫। বাংলার তথ্যমূলক প্রবন্ধসাহিত্যের সহিত পরিচয়।

৬। বাংলাসাহিত্যের গম্ভীর দিকের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর চিন্তাজগতে অগ্রসর হওয়া।

প্রশ্নমালা :— ক। প্রবন্ধমূলক (বিষয়নিষ্ঠ)

১। নিম্নলিখিত সূত্রানুসারে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

ক। ভূমণ্ডলে যে-সকল লোক প্রাধান্য লাভ করেন তাঁদের কয়দলে ভাগ করা যায় একটি বাক্যে লেখ।

খ। একেক বাক্যের মধ্যে একেকটি দলের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

গ। কার্যক্ষম লোক বা দক্ষ ব্যক্তি কি কি করতে পারেন দুটি বাক্যে লেখ।

ঘ। প্রতিভাবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কি একটি বাক্যে বুঝিয়ে দাও।

৩। নিচের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর একেক বাক্যে দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

ক। কারা ভগবানের পালনী শক্তি পেয়েছেন ?

খ। কারা বিধাতার সৃষ্টিশক্তি পেয়েছেন ?

গ। পালনী শক্তির দ্বারা কি করা সম্ভব ?

ঘ। সৃজনী শক্তির দ্বারা কি করা সম্ভব ?

খ। বিষয়মুখী

১। বন্ধনীর মধ্যে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দের নির্বাচন করে' নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

(পণ্ডিত, জ্ঞানী, কার্যক্ষম, প্রতিভাশালী, বিজ্ঞানবিদ, দক্ষ, পারদর্শী, কবি, দার্শনিক ।)

ক। কারা অন্যনির্মিত কল দেখে অনুরূপ গড়তে পারেন ?

খ। কারা অন্যাবিষ্কৃত তত্ত্ব স্মরণ রাখতে পারেন ?

গ। কারা অন্যোদ্ভাবিত ভাবে অলংকৃত হ'তে পারেন ?

ঘ। কারা পুরাতন জ্ঞান ও কর্মপ্রণালিতে সুপরিপক্ক ?

ঙ। কারা অন্যনির্দিষ্ট কর্মে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাতে পারেন ?

চ। কারা ভেঙেচুরে, নূতন করে' গড়তে পারেন ?

ছ। কারা অভিনব প্রকার সৃষ্টি বা আবিষ্কার করতে পারেন ?

২। নিচে প্রতিভার কতকগুলি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, তার-মধ্যে যেটি বা যেগুলি প্রযোজ্য তার পাশের বন্ধনীতে √ চিহ্ন দাও।

প্রতিভা—শিক্ষানিরপেক্ষ ( )। দেবদত্ত শক্তি ( )। স্বাভাবিক শক্তি ( )। যত্নমাত্র ( )। মনোযোগ বা অভ্যাসমাত্র ( )।

৩। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

দেবদত্ত শক্তি, স্বাভাবিক শক্তি, যত্ন, অভ্যাস বা মনোযোগ প্রতিভার—মাত্র। ইহারা কোনোটিই—নয়, তবে প্রতিভার বিকাশে—করে।

কে বারবার অনুষ্টুপ লিখে সে সহজে— —পারিবে কিন্তু— হইতে পারিবেনা।

শ্রেণিতে পাঠদানের সময়ে শিক্ষক উপস্থাপন বা অভিযোজনের আলোচনায় মূল্যায়নের প্রশ্নগুলি মুখে মুখে ব্যবহার করতে পারেন।

চার

আগের আলোচনা ও উদাহরণে কাগজকলমে পরীক্ষার কথাই বলা হয়েছে। এরদ্বারা অধীত বিষয়ের তথ্যের দিক প্রত্যক্ষভাবে ও রচনা, বিচার বিশ্লেষণাদি নৈপুণ্য ও বোধ ও দৃষ্টিকোণের দিক অপ্রত্যক্ষভাবে পরিমাপ করা যায়। এই ধরনের পরীক্ষায় ছাত্রদের স্তর থেকে স্তরান্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার এবং সর্বশেষে বিদ্যালয়পরবর্তী জীবনে প্রবেশের যোগ্যতার বিচার ও স্তরবিভাগ করা হয়; কিন্তু এতেই শিক্ষার সমগ্র ফলশ্রুতি হয়না।

প্রথমত ছাত্রের প্রকাশিত মতামত তার চরিত্রকে প্রভাবিত করে' কর্মক্ষেত্রের আচরণে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, অর্থাৎ যে ছাত্র কাগজকলমের পরীক্ষায় বিচারমূলক প্রশ্নের উত্তরে সততা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণের সমাদর করলো সে বাস্তবিকই নিজের জীবনে সদ্ভাবে, সকলের সংগে মিলেমিশে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারছে কিনা তার পরীক্ষা হ'লনা এবং যদি সে তা না পারে তবে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শুধু পড়াশুনোর উৎকর্ষাপকর্ষের বিচারই যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, উৎসাহ, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের পরিচয়গ্রহণও শিক্ষকের কর্তব্য। একটি শ্রেণিতে হয়তো পাঁচটি মেধাবী আর পাঁচটি নির্বুদ্ধি ছেলে আছে, কিন্তু অধিকাংশ ছেলে হ'ল সাধারণ: এরাই সমাজের মেরুদণ্ড, আমাদের হয় বিঘ্নকারী, নয় সিদ্ধিদাতা গণদেবতা। এরা হয়তো বছরের পর বছর তিরিশ-চল্লিশ, বড়জোর পঞ্চাশ নম্বর পেয়ে চলেছে; এর ব্যতিক্রম নেই বলেই এই পরিস্থিতি মরুভূমির মতো নীরস ও নিরাগ্রহজনক। ছাত্রসমাজের শিক্ষায় বিতৃষ্ণা তথা উচ্ছৃংখলতা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণ এই। বাঞ্ছিত নয়, অবাঞ্ছিতও নয়, এরূপ সহস্র সহস্র যারা "আছে মাঝখানে" তারা যে নিতান্ত অবহেলার হাত

এড়াবার জন্যও অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত হ'তে পারে এটা একটা মনো-বৈজ্ঞানিক সত্য। আজকের শিক্ষাবিদেরা এদের মূল্যদানের উপায় খুঁজছেন।

এরা বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা চমৎকৃত করতে না পারলেও বিনয়জাত পাত্রতায় ভূষিত হ'তে পারে। চারিত্রিক গুণাগুণের সুবিচারকৃত মূল্য এদের প্রাপ্য এবং নিজেদের ক্ষমতাসীমার মধ্যে উন্নতি সাধন করতে পারলে এরা প্রশংসনীয়। যে ছেলেটি প্রত্যেকবার শতকরা আশি-নব্বই নম্বর পাচ্ছে আর যে চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জোরে তিরিশ থেকে চল্লিশের ঘরে উত্তীর্ণ হ'ল তারা দু'জনেই সমান আদরণীয়। সাধারণ ছাত্রদের জীবনমরুতে উদ্যানরচনা করতে হ'লে এই সব নানা-প্রকার মূল্যমানের ব্যবহার আবশ্যক এবং তদনুসারে প্রত্যেক ছাত্রকে নিজের উন্নতির মানরেখা আঁকতে দিলে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়বে।

আবার যারা কিছুতেই অগ্রসর হ'তে পারছেনা, তারাও পরিত্যাজ্য নয়। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা, পরিবেশপর্যবেক্ষণের দ্বারা কারণনির্ণয় করে' এদের সমস্যার সমাধানের উপায়নির্ণয় করতে হবে।

বিদ্যালয় যদি এ-সমস্তের দায়িত্ব নিতে পারে তবেই সে প্রকৃত শিক্ষালয় হয়ে উঠবে, নয়তো আচার্য বিনোবা ভাবের উক্তির মতো এখানে বিদ্যার লয় হয়েই চলবে।

আজকাল ছেলেদের আগ্রহ, উৎসাহ, নির্ভরযোগ্যতা, উদ্যোগিতা, সহযোগিতা, সততা প্রভৃতি গুণের মূল্যায়নের জন্য সমুচিত তথ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজের বিরাট আপত্তির নানা প্রদর্শিত কারণের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষণ ও সুযোগের অভাবের কথাই প্রধান। এই প্রতিবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। রাজা-উজির মারার মতো সহজে মুখের কথায় আমরা সর্বদাই ছাত্রদের

পরিমাপ করে' থাকি, অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপ্রথার প্রয়োগে অবলীলাক্রমে পাশফেল করিয়ে থাকি, এরজন্য যখন কোনোদিন বিবেকদংশন অনুভব করিনি তবে আজকে কাজ বাড়লো দেখে এরূপ প্রতিবাদের অধিকার আমাদের নেই।

একটু সহানুভূতিপূর্ণ ভাব নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে শিক্ষকেরা প্রায় প্রত্যেক ছাত্রের বিষয়েই আগ্রহজনক তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। পারিপার্শ্বিক ও উপকরণের উন্নতির অপেক্ষা না রেখেই শিক্ষকেরা দরদের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিচার করবেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আগ্রহ ও আচরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং সংঘ (House System) বা গৃহকোণের (Homeroom) মধ্য দিয়ে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ হচ্ছে। তাছাড়া কর্মের ভিত্তিতে স্বয়ংসাধনার মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের নিজের দায়িত্বে পড়াশুনোর পদ্ধতির প্রচলন করলে শিক্ষকদের প্রত্যেক ছাত্রকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সমিতি স্থাপনের দ্বারা নানা উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, ছাত্রেরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কাজ করে বলে' শিক্ষকেরা তাদের আগ্রহ, স্বভাব, নৈপুণ্য প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সমিতিতে ছাত্রীরা আমোদের মধ্যে দিয়ে রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে। তৃতীয়ত, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক সহযোগিতাও তৎপরতার বৃদ্ধি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতির দ্বারা মানসোৎকর্ষ সাধিত হয়। সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান,—তারা বিশুদ্ধ আনন্দের উপায় ও উপকরণ লাভ করে।

পঞ্চম/ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম/একাদশ পর্যন্ত শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন সমিতি গঠিত করা উচিত। একেক

সমিতিতে ছাত্রসংখ্যা ত্রিশের বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাত্রসংখ্যা অধিক হ'লে সমিতিগুলিকে উচ্চ ও নিম্নবিভাগে ভাগ করা যায়।

প্রত্যেক সমিতির ভার একজন শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং ছাত্রদের মধ্যে থেকে সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচিত হবে। প্রত্যেক সমিতির নিয়মিত কার্যবিবরণী রাখা হবে এবং প্রত্যেক সভ্যের একটি করে প্রশ্নোত্তর ও স্বয়ংসঞ্চয়নের খাতা থাকবে।

প্রতিমাসে সামান্য চাঁদাসংগ্রহ করে' ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা হবে। উপরন্তু দানগ্রহণ, প্রদর্শনীর সময় ছাত্রদের হাতের কাজ বিক্রয় ও বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রবেশমূল্য ধার্য করেও অর্থসংগ্রহ করা যায়। সপ্তাহের কোনোদিন বিদ্যালয়ের ঘণ্টার পরে অথবা শনিবার টিফিনের পরে সমিতির কার্যকলাপের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা যায়।

সাহিত্যসমিতির সভ্যেরা তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের উৎসাহ ও সহযোগিতায় মৌলিক গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি রচনায় উদ্যোগী হবে, সেগুলি সংগ্রহ করে' হাতের লেখা পত্রিকা ও দেয়ালপত্রীতে প্রকাশ করবে এবং শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে বিদ্যালয়পত্রিকার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

বিতর্ক, আবৃত্তি ও অভিনয়কে সাহিত্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ধরা হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টিতে বা কোন সাহিত্যিকের নামে প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ বা জীবিত সাহিত্যিকসন্দর্শনও সাহিত্য সমিতির করণীয়। স্বাধীন সাহিত্য পাঠ ও আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া, বেতারে বা সভাসমিতিতে সাহিত্যবক্তৃতা শোনা বা আলোচনায় যোগ দেওয়া, সাহিত্যিকদের বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে' আনা প্রভৃতি সাহিত্যসমিতির কর্তব্যের অন্তর্গত। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নানা উৎসব, পূজা ও দিবসপালনের সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক কার্যকলাপের ভার সাহিত্য সমিতির হাতে দেওয়া যায়।

শিক্ষার নূতন আদর্শ বিষয়ায়ত্তি ও জ্ঞানার্জনের চেয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপক বলে' ফলশ্রুতির ক্ষেত্রে পরীক্ষার পরিবর্তে অথবা পাশাপাশি সামগ্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থার সমর্থন করা হচ্ছে। এর মধ্যে পরীক্ষণ, সমীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ আছে আর আছে সমস্ত গুণ ও জ্ঞানকর্মের কোটি-বিচার। এই মূল্যায়নের একদিকে ফলশ্রুতি আর অন্যদিকে সমস্যার সমাধানমুখী অনুসন্ধান,—এই দুইদিক পরস্পরের অনুপূরক। ফল-শ্রুতির দ্বারা সাফল্য ও অসাফল্যের নির্দেশ করে', তল্লব্ধ অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে সাফল্যের অধিকতর উন্নতি ও অসাফল্যের প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক হয়।

—সমাপ্ত—